দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ।

কলিকাতাস্থ রাজকীয় হিন্দুবিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার
অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষক ও
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
বিশেষ সভ্য
শ্রীশরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী
প্রণীত।

(তৃতীয় সংস্করণ।)

PUBLISHED BY
B. BANERJEE & CO.
25, Cornwallis Street, Calcutta.
1911.

 [Price Re 1-4 as.



PRINTED BY J. N. BOSE.
COLLEGE SQUARE, CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন।

পাঠাবস্থায় বারাণসী অবস্থান কালে ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশবাসী বিদ্যার্থীর সহিত পরিচয় হয়। সেই সময় হইতে দেশ-ভ্রমণেচ্ছা হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। ঘটনা-ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের নানাস্থান পর্য্যটন করি। যদি ও দক্ষিণাপথে শেষে গমন করিয়াছিলাম, তথাপি আমার কতিপয় কৃতবিদ্য বন্ধুর অনুরোধে "দক্ষিণাপথ ভ্রমণ" নাম দিয়া দক্ষিণাপথের ভ্রমণ বৃত্তান্তই অগ্রে প্রকাশ করিলাম। যদি পাঠকগণের নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে পরে "উত্তরাপথ ভ্রমণ" নামে আর্য্যাবর্ত্তের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

এই পুস্তকে পরিদৃষ্ট জনপদ-সমূহের প্রাচীন নাম ও তৎ তৎ প্রদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, প্রাকৃতিক দৃশ্য, বর্ত্তমান অধিবাসীদের আচার ব্যবহার সভ্যতার বিষয় যথাশক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ভ্রমণাবসরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, অবিকল তাহাই বর্ণনা করা গিয়াছে। উহার কোন্ অংশ পাঠকগণের রুচিকর হইবে, কোন্ অংশ হইবে না, তাহা বলিতে পারি না। পরিশেষে, কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থ প্রণয়ন-কালে বম্বে-নগরীর নির্ণয়সাগর ও বেঙ্কটাচলেশ যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত বেদ, পুরাণ, কাব্য ও বিশ্বকোষ অভিধান হইতে স্থানে স্থানে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

উপসংহারে বক্তব্য নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় সত্বরতা নিবন্ধন যদি কোন ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া থাকে, পাঠকগণ নিজগুণে উহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

নবদ্বীপ
২৩শে আশ্বিন, শকাব্দ ১৮১৯

নিবেদক.
শ্রীশরচ্চন্দ্রশর্ম্মা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রথম যখন "দক্ষিণাপথভ্রমণ" প্রকাশ করি, আশা করি নাই যে ইহা সাহিত্যসেবি-সমাজে এতদূর সমাদৃত হইবে। সৌভাগ্যের বিষয়, পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যেই উহা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া যায়। কৃপালু পাঠকগণের আগ্রহাতিশয় দর্শনে ইহা পুনরায় প্রকাশিত করিলাম। বর্ত্তমান সংস্কারণে গ্রন্থের কলেবর প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অধিকন্তু এবার বহুব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক পরিদৃষ্ট কতিপয় প্রধান দৃশ্যের চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছি। দ্বিতীয় সংস্করণে যেরূপ ব্যয়-বাহুল্য হইয়াছে। তদনুরূপ মূল্য বৃদ্ধি করা হইল না, সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ পাঁচসিকা মূল্যই রহিল। আশা করি, পাঠকবর্গ এবারেও আমার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় করুণা বিতরণে কুণ্ঠিত হইবেন না। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ পাঠ করিয়া অনেকে আমাকে উৎসাহিত করেন। তন্মধ্যে সংস্কৃত-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ৺নীলমণিন্যায়ালঙ্কার এম্ এ, বেঙ্গল-গভর্মেণ্টের ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালা-অনুবাদক ৺চন্দ্রনাথবসু এম্ এ, বেঙ্গলগবর্ণমেণ্টের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ রায়বাহাদুর পণ্ডিতশ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ, মহোদয়গণ পরিদৃষ্ট জনপদবাসীদের আচার ব্যবহার ও সভ্যতার বিষয় অধিক পরিমাণে বর্ণন করিতে উপদেশ প্রদান করেন। আমি তাঁহাদের যুক্তিযুক্ত পরামর্শ অনুসারে এবার মধ্যভারতবর্ষ ও দক্ষিণাপথের অধিবাসী নানাজাতির কৌতুকাবহ আচার ব্যবহারের বিষয় অধিক পরিমাণে লিপিবদ্ধ করিলাম।

গতবার নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এত সত্বর এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল যে, "নোটবহি" পর্য্যন্ত দেখিবার অবসর হয় নাই। তজ্জন্য পর্য্যটন কালের শকাব্দ এবং তারিখ ও দুই একটি ঘটনার বর্ণনে ভুল হইয়াছিল। এবার যথাশক্তি উহা সংশোধন

করিলাম। পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, দেশীয় রাজ্যাদির বর্ণন স্থলে হণ্টার সাহেবের সঙ্কলিত "ইম্পিরিয়েল-গেজেট" ও বঙ্গে গেজেটিয়ার্ হইতে কোন কোন স্থানে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি এবং মহারাষ্ট্রীয়-ব্রাহ্মণ-জাতির ইতিবৃত্ত লেখার সময় হালিসহর-নিবাসী পরমশ্রদ্ধাস্পদ ৺দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণ" শীর্ষক প্রবন্ধের মত স্থানে স্থানে গ্রহণ করিয়াছি। আর এক জনের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নিতান্ত আবশ্যক। তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রসিদ্ধলেখক শ্রীযুক্ত সখারামগণেশ. দেউস্কর। দেউস্কর মহাশয়ের,পূর্ব্বপুরুষগণ মহারাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী এবং তিনি স্বয়ং মরাঠি সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন, সুতরাং এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়া মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে আমি যখন যে প্রশ্ন করিয়াছি, তিনি তৎক্ষণাৎ উহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে দুর্লভ গ্রন্থাদি প্রদান করিয়া আমার সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার কৃত উপকার অনেক দিন আমার স্মৃতি-পথে অঙ্কিত থাকিবে। এই গ্রন্থে কয়েকটি চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহার ফটো বঙ্গের প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার্ রাজা দীনদয়ালের বিপণি হইতে আনীত হইয়াছে। আর ইণ্ডিয়ান্ আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতি উহার ব্লক্ প্রস্তুত ও মুদ্রণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহার চিত্রকলায় নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রকারিতা সন্দর্শনে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।

অনেকে "দক্ষিণাপথভ্রমণের" প্রথম সংস্করণ পাঠ করিয়া বিজ্ঞাপিত উত্তরাপথভ্রমণের জন্য আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই সকল বাঙ্গালা-সাহিত্যানুরাগী মহাত্মাদিগকে জানাইতেছি যে, যাঁহাদের অন্য উপায়ে জীবিকা সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যচর্চ্চা করিতে হয়, তাঁহাদের সময় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। নিয়মিতরূপে অধ্যাপনা ও "শঙ্করাচার্য্যচরিত" নামক একখানি জীবনচরিত গ্রন্থ প্রণয়ন এবং অন্যান্য প্রবন্ধ রচনায়

ব্যস্ত থাকায় এ পর্য্যন্ত উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। আমার "নোট বহিতে" সমস্তই সংগৃহীত আছে, কিছু সময় পাইলেই আমি উক্ত পুস্তক প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব। এবার ও যথেষ্ট সময়ের অভাবে ভাল রূপ দেখিতে না পারায় দুই একটি ভুল রহিয়া গেল, পাঠকগণ দয়া করিয়া উহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

রাজকীয় হিন্দু বিদ্যালয়,
কলিকাতা।
২৫শে আষাঢ়, শকাব্দ ১৮২৬

নিবেদক
শ্রীশরচ্চন্দ্রশর্ম্মা।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার কর্তৃপক্ষগণের কৃপায় দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ ১৯১২—১৩খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইণ্টারমিডিয়েট্‌ পরীক্ষার্থিগণের পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় উহার তৃতীয় সংস্করণ করা হইল। এবারে ও এই পুস্তকে কোন কোন অনাবশ্যক অংশ পরিত্যক্ত ও কোন কোন প্রয়োজনীয় অংশ পরিগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকখানি যথাসম্ভব ভ্রমপ্রমাদশূন্য করিতে চেষ্টার ত্রুটী করি নাই, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সুধীমণ্ডলীর বিচারসাপেক্ষ। মেশিনপ্রেসে সত্বর মুদ্রিত হওয়ায় এবারেও কোন কোন অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে, অতএব দুই একটি স্থানে অশুদ্ধ রহিয়া গেল, পাঠকগণ দয়া করিয়া উহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

রাজকীয় হিন্দুবিদ্যালয়,
কলিকাতা।
২২শে বৈশাখ, শকাব্দ ১৮৩৩।

নিবেদক
শ্রীশরচ্চন্দ্রশর্ম্মা

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা হইতে যাত্রা, ভাগীরথী-সেতুর দৃশ্য, দক্ষিণ-কোশল—রায়পুর, হৈহয় বংশ, ভুঞ্জিয়া-জাতি। ১—১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নাগপুর নগর, গোণ্ডজাতি, রামগিরিতে নির্ব্বাসিত যক্ষ, ভোঁস্লে-রাজবংশ, মহাকবি ভবভূতির জন্মভূমি পদ্মপুর, অমরাবতী। ১২—২৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

খাণ্ডব-বন, ভোঁশোয়াল জংসন, খাণ্ডোয়ানগরী, বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা, নর্ম্মদা নদী, ফতেয়াবাদ জংসন। ২৫—৩৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অবন্তিদেশ, মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নের জীবনচরিত। ৩৮—৭১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উজ্জয়িনীর দৃশ্য, শিপ্রানদী, মহাকালের মন্দির, হর্ষদ্বীপে কালীমূর্ত্তি, কালিয়-দীঘী, অঙ্কপাত-তীর্থ, ভর্ত্তৃগুহা, গুজরাটী ব্রাহ্মণ ও গুজরাটী বণিক্ জাতির বিবরণ, উজ্জয়িনী ত্যাগ। ৭২—৯৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মৎস্যদেশ—ইন্দোর, হোলকার-রাজবংশ, অহল্যাবাই, দয়ানন্দ-সরস্বতী, রতলাম নগর, আনন্দ জংসন। ৯৯—১৩১

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুর্জ্জর-রাজ্য—বড়োদা, গায়কবাড়-বংশের ইতিহাস, সংস্কৃত-চতুষ্পাঠী, লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ, শাস্ত্রি-গৃহে অন্নাশনে ভোজ, বড়োদা ত্যাগ, ভৃগুক্ষেত্র, সুরাষ্ট্রনগরী, নৌসরী, পারসীক জাতির ইতিবৃত্ত। ১৩২—১৮৬

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বোম্বাইনগরী, সমুদ্রতীর, পুণা অভিমুখে যাত্রা। ১৮৭—১৯৩

নবম পরিচ্ছেদ।

মহারাষ্ট্র রাজ্য, শিবাজীর বংশধর, পুণানগরী, বেদশাস্ত্রোত্তেজক-সভা, পার্ব্বতী শৈল, রমাবাইসরস্বতী, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জাতির ইতিহাস ও সভ্যতা, পুণা ত্যাগ। ১৯৪—২৪৬

দশম পরিচ্ছেদ।

বোম্বাই নগরে প্রত্যাগমন, শৈলপথের দৃশ্য, মহালক্ষ্মী ও আরব সাগর, ভিক্টোরিয়া-কৌতুকাগার, বালুকেশ্বর-পর্ব্বত, পুষ্পোদ্যান, গবর্ণরের প্রাসাদ, পারসীকগণের প্রেতভবন, এপোলো-বন্দর, রাজাবাই-স্তম্ভ, বুড়ীবন্দর-ষ্টেশন, বোম্বাই ত্যাগ, নাসিকনগর ও পঞ্চবটীকানন, কলিকাতা প্রত্যাগমন। ২৪৭—৭৬



পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১৮১৫ শকাব্দ (১) বিগতপ্রায়, বঙ্গের পল্লী এবং নগরে তখন বসন্ত-শোভা দেদীপ্যমান। মলয়ানিল কুসুম-গন্ধ বিতরণে নিযুক্ত। রসাল-কানন কোকিলের কুহুরবে সদা মুখরিত। এই সুখময় ঋতুতেও কলিকাতাবাসী নিশ্চিন্ত নহে, ব্যাধি বিশেষের দ্রুত সঞ্চারে সকলেরই চিত্ত নিতান্ত বিচলিত। তজ্জন্য এবার নিয়মিত সময়ের কিছু পূর্ব্বেই স্কুল্-কলেজের গ্রীষ্মের বন্ধ হইল। ছাত্র শিক্ষক সকলেই স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। এই সুদীর্ঘ অবকাশে আমি কিছু দূর ভ্রমণের সঙ্কল্প করিলাম।

২৬শে চৈত্র রবিবার (৮ই এপ্রেল) সন্ধ্যার পর কলেজ্-ষ্ট্রীটের বাসা হইতে যাত্রা করিলাম। হাওড়ার পুলের উপর হইতে ভাগীরথী-বক্ষের সেই চিরপরিচিত শোভাও কত নূতন বোধ হইতে লাগিল। পুলের উভয় পার্শ্বস্থ আলোকমালা সুরশৈবলিনীর কণ্ঠহারের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। নৌকাগুলি পাইল্ তুলিয়া শ্বেতপক্ষ-কপোতীর ন্যায় দ্রুত বেগে ধাবিত হইতেছে। মহানগরীর মনোহর প্রতিবিম্ব তরঙ্গিণীর স্বচ্ছ-সলিলে যেন উর্ম্মিমালার সহিত ক্রীড়া করিতেছে। এই সকল্ শোভা দেখিতে দেখিতে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। কি ভীষণ

(১) ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

জনতা! ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য। অতিকষ্টে একখানি টিকিট ক্রয় করিয়া ট্রেণে উঠিলাম। যখন গাড়ী ছাড়িল তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া



হাওড়া হইতে কলিকাতা নগরীর দৃশ্য।

গিয়াছে। বৃহৎকায় অজগরের ন্যায় বাষ্পশকট ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে ধাবিত হইল। অনেক দিন সহরবাসের পর চন্দ্রালোকে রেল-পথের উভয় পার্শ্বস্থ তরুলতা-সমাকীর্ণ পল্লীর অস্পষ্ট সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ে কতই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। যখন ইতিহাস

প্রসিদ্ধ বর্দ্ধমানে ট্রেণ থামিল; তখন রাত্রি অনেক। সঙ্গী আরোহিগণ সীতা-ভোগের আশায় গাড়ীর বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, এই অবসরে আমি শয্যা প্রস্তুত করিয়া লইলাম। রাত্রি দুইটার সময় আসান্‌সোলে গাড়ী পৌঁছিল। আমি ইষ্টইণ্ডিয়া-কোম্পানির রেলপথ পরিত্যাগ করিয়া বেঙ্গল-নাগপুরের গাড়ী ধরিবার জন্য ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। পূর্ব্বে জানিতাম না যে নামিয়া ট্রেণ্ পাওয়া যাইবে না, শেষে শুনিতে পাইলাম, পরদিন দুইটার পূর্ব্বে আর নাগপুরের ট্রেণ নাই। অগত্যা ষ্টেশনেই কম্বলশয্যায় রাত্রির অবশিষ্ট ভাগ যাপন করিতে হইল।

পরদিন ২৭শে চৈত্র সোমবার প্রাতঃকালে একটি মুদীর দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আসান্‌সোল কলিকাতা হইতে ১৩২ মাইল। স্থানটি কয়লাখনির জন্য বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আসান্‌সোলের বর্ত্তমান সমৃদ্ধি ছিল না। কয়লাখনির কার্য্যের অনুরোধে কতকগুলি ইউরেসিয়ান্, বাঙ্গালী এবং হিন্দুস্থানী এখানে বাস করিতেন। একটি মধ্য ইংরাজি স্কুল্ ও কয়েকখানি দোকান মাত্র ছিল। অত্যন্ত জলকষ্ট, অতিদূরে প্রান্তরমধ্যস্থ জলাশয়ে গিয়া স্নান সন্ধ্যা শেষ করিলাম। আহারান্তে বিশ্রামের পর ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখি বসিবার তিলমাত্র স্থান নাই, মক্কাযাত্রীতে ষ্টেশন পরিপূর্ণ।

যথাসময়ে গাড়ী প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকে এক প্রকার হাতাহাতি করিয়া গাড়িতে উঠিতে লাগিল। আমার ন্যায় শান্তপ্রকৃতি চতুষ্পাঠীর ছাত্রের পক্ষে ঐরূপ শকটারোহণ নিতান্ত ভয়াবহ। আমি ব্যাকুলভাবে স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় বিধাতা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই যেন কয়েকটি বাঙ্গালী একটি গাড়ী হইতে আমাকে ডাকিয়া লইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সকল অসুবিধা দূর

হইল।• স্বদেশী ও স্বজাতির মধ্যে স্থান পাইয়া আমি পরম আনন্দিত হইলাম। স্বদেশে যে ভাবই থাকুক না কেন, বিদেশে সমস্ত বাঙ্গালী যেন এক মাতার সন্তান। আমি ভ্রমণকালে অনেক স্থলে উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবারকার ভ্রমণেও এই তাহার প্রথম নিদর্শন। আমার মস্তকে টিকী ও পায়ে চটীজুতা দেখিয়াই শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ সংস্কৃত-ভাষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। ক্রমে আমরা কালিদাস ভবভূতি মাঘ ভারবি শ্রীহর্ষ বাণভট্ট দণ্ডী প্রভৃতির আলোচনায় পরম সুখে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই পুরুলিয়া ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিল। তখনও চতুর্দ্দিকে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ষ্টেশন হইতে সহরে যাইবার রাজপথটি রক্তবর্ণ ধূলায় আকীর্ণ। নির্জীব অশ্বগুলি শকটা লইয়া অতিকষ্টে সেই ধূলার সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চলিতেছে। আমাদের একটী সঙ্গী এখানে অবতরণ করিলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইতে লাগিল, উভয় দিকের নদ নদী প্রান্তর এবং শস্যক্ষেত্রের শোভাও যেন আমাদের চোখে অধিকতর মাধুর্য্যময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

অনেক ক্ষণের পর, শালবনসমাকীর্ণ একটি ষ্টেশনে গিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। ইহার নাম চক্রধরপুর। চক্রধরপুর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ষ্টেশন। ইহার চতুর্দ্দিকেই অরণ্যানী। এই স্থানটি শালকাষ্ঠের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। আমার সঙ্গিগণ সকলেই এখানে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা নামিয়াই ষ্টেশন-মাষ্টারকে বলিয়া কতকগুলি নাগপুরী ভদ্রলোককে আমার গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। আমার সম্ভাবিত উপদ্রবের আশঙ্কা দূর হইল। আমি বাঙ্গালী ভ্রাতাদের বিদায় দিয়া অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় অদৃষ্টপূর্ব্ব জনপদের গ্রাম প্রান্তর অরণ্যানী ও শৈলমালা সকল দেখিতে দেখিতে চলিলাম। নাগপুরী বন্ধুরা হাস্য কৌতুকে সময় কাটাইতে লাগিলেন, তাঁহাদের ভাষায়

অধিকার না থাকায় আমি সেই সকল আমোদের অংশভাগী হইতে পারিলাম না।

সন্ধ্যা সমাগত হইল। অস্তগামী সূর্য্যের লোহিতকিরণে বৃক্ষপত্র রঞ্জিত। সান্ধ্য সমীরণের শীতল স্পর্শে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বোধ হইল যেন গম্ভীরাকৃতি পর্ব্বতমালা আকাশের প্রান্ত-অবলোকনের জন্য মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। রেলপথের উভয় পার্শ্ব কোথায়ও শালবনে কোথায়ও বা বংশকাননে সমাচ্ছন্ন। অনতিদূরে পর্ণশালার প্রাঙ্গণে কৌতূহলী বালকবালিকারা বাষ্পশকটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছে। পাহাড়ের গায়ে হাট বসিয়াছে। পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় সাঁওতালগণ কলরব করিতে করিতে হাট হইতে গৃহে ফিরিতেছে। ক্রমে ক্রমে আকাশে একটি একটি নক্ষত্র দেখা দিতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যে চন্দ্রকিরণে সমস্ত আরণ্যভূভাগ আলোকিত হইয়া উঠিল। রেলপথের উভয় পার্শ্বে সুদীর্ঘ অরণ্যানী, ক্বচিৎ পার্ব্বত্যজাতির বিরল বসতি, তথাপি দূর হইতে পাখীর কলরবের সহিত মনুষ্যকণ্ঠের অস্ফুট স্বর যেন কাণে বাজিতে লাগিল। উহার কারণ কি. এই অরণ্য-মধ্যে মানবকণ্ঠের স্বর কোথা হইতে আসিল ? অথবা ইহা পূর্ব্বশ্রুত শব্দের অনুস্মৃতি মাত্র।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ী ঝাড়সুগদা জংসনে পৌঁছিল। এ ষ্টেসনটিও অপেক্ষাকৃত বড়। এখান হইতে একটি শাখা-রেলপথ সম্বলপুর গিয়াছে। গভীর নিশীথিনী, যাত্রিগণ নিদ্রামগ্ন, কোথাও কোন শব্দ নাই। কেবল বাষ্পশকট আপন মনে সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া অস্পষ্ট ধ্বনি করিতে করিতে গন্তব্য স্থান অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। আমি বহুক্ষণ বসিয়া ছিলাম, আর পারিলাম না, অজ্ঞাতসারে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। প্রত্যুষে আরোহীদের কলরবে নিদ্রাভঙ্গ হইল, ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে উঠিয়া

দেখি, গাড়ী সুদীর্ঘ প্রান্তর মধ্যে একটি বড় ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছে। এই ষ্টেশনের নাম বিলাসপুর। বিলাসপুরে খাদ্য পাওয়া যায় এবং এখানে বহুক্ষণ গাড়ী থামে। অন্যান্য আরোহীরা আহার্য্য সংগ্রহে ব্যস্ত হইল। আমি নামিয়া কলের জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া লইলাম। রেলপথের উত্তর ভাগে অনতিদূরে বিলাসপুর সহরের সুন্দর বাঙলোগুলি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। মহানদীর প্রবাহ হইতে বহির্গত প্রবাহান্তরের ন্যায়, বাষ্পশকটের নিকট হইতে একটি জনস্রোত প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী রাজপথ বাহিয়া সহর অভিমুখে চলিল। বিলাসপুর বেঙ্গল নাগপুর-রেলপথের একটি জংসন। এখান হইতে কাট্নি-রেল-শাখা নির্গত হইয়াছে। এই রেলশাখা কাট্নি জংসনে গিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে।

অনতিবিলম্বে ট্রেন্ ছাড়িল। পূর্ব্বাহ্ণ দশটার সময় আমরা রায়পুরে গিয়া পৌঁছিলাম। রায়পুর সহরটি নিতান্ত দ্রষ্টব্য-হীন নহে, তজ্জন্য এখানে অবতরণ করিলাম (১)। রায়পুর বিলাসপুর ও সম্বলপুর এই তিনটি জেলা লইয়া মধ্যপ্রদেশের রায়পুর বিভাগ গঠিত। রায়পুর উক্ত বিভাগের হেড্‌কোয়াটার্ এবং ডেপুটি

---

(১) এখানকার বাঙ্গালীদের মধ্যে রায় ভূতনাথ দে বাহাদুর M. A., B. L. মহোদয় পরমধর্ম্মপরায়ণ। ইনি বহুভাষাবিৎ মিঃ হরিনাথ দে M. A. মহোদয়ের পিতা। আগন্তুক বাঙ্গালীগণ এখানে আসিলে সকলেই প্রায় তাঁহারই আতিথ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। আমিও তাঁহারই বাসায় সাদরে গৃহীত হইলাম। দে বাহাদুর একাধারে কর্ম্মী ও জ্ঞানী। সাধারণের হিতকর কার্য্যেও তাঁহার উৎসাহের অন্ত নাই। তিনি রায়পুর মিউনিসিপালিটির ভাইস্‌চেয়ারম্যান্ এবং তাঁহারই উদ্যোগে ডোঙ্গরগড়ের রাজার অর্থ সাহায্যে এখানে জলের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জ্ঞানের অনুশীলনেও তাঁহার গভীর আস্থা; কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রামান্তে ভগবদ্গীতা ও উপনিষদাদির আলোচনা করিয়া থাকেন

কমিসনারের শাসনাধীন। ডেপুটিকমিসনার্ ও কামঠি সেনাদলের অধিনায়ক এখানে বাস করেন। রায়পুরে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোর্ট আছে। এই নগর বিন্ধ্য-পর্ব্বতমালার উপত্যকা-প্রদেশে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিক্ পর্ব্বত-শৃঙ্গ এবং সুদীর্ঘ অরণ্যানীতে পরিব্যাপ্ত। নগরের রাজপথগুলির উভয় পার্শ্ব লাল গোল্‌ড্‌মোহর ফুলও মনোহর সৌধমালায় পরিশোভিত। দূর হইতে দেখিলে সহরটি একটি চিত্রিত ছবি বলিয়া বোধ হয়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে রায়পুর প্রাচীন পূর্ব্বকোশলের অন্তর্গত। এই দেশের রাজনন্দিনী কৌশল্যাই অযোধ্যার রাজা দশরথের প্রধানা মহিষী ছিলেন। পূর্ব্বে এই দেশে পরাক্রান্ত রাক্ষসজাতি বাস করিত। গোণ্ডজাতির সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়া তাহারা ক্রমে পলায়ন করে। কেহ কেহ বলেন;—গোণ্ডদের সহিত ভুঞ্জিয়া জাতির যুদ্ধকেই পৌরাণিক আখ্যায়িকায় গোণ্ড এবং রাক্ষসের সংগ্রাম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ভুঞ্জিয়াগণ বহুকাল এদেশে আধিপত্য করিয়াছিল। অদ্যাপি মহানদীর তীরবর্ত্তী ভগ্নদুর্গ সকল তাহাদের রণকৌশলের সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান আছে।

তাহার পর, এই দেশ রত্নপুরের হৈহয় বংশীয় রাজগণের (১) অধিকারে আইসে। তখন ইহার নাম হয় ছত্রিশগড়। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ছত্রিশগড় রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পৌরাণিক হৈহয়-বংশীয় শূরদেব পূর্ব্বাংশ ও ব্রহ্মদেব পশ্চিমাংশ লাভ করেন। এই ব্রহ্মদেব কর্ত্তৃক প্রথম রায়পুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর, রায়পুরের উপর দিয়া বহু রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন চলিয়া গিয়াছে। ১৭৪১

(১) হৈহয় চন্দ্রবংশীয় রাজা। ইঁহার নামান্তর কার্ত্তবীর্য্য। মাহিষ্মতীতে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি রাক্ষসরাজ রাবণের দর্প চূর্ণ করেন। (বাল্মীকি রামায়ণ পাঠ করুন।)

খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা রায়পুর রাজধানী আক্রমণ করে। পেশওয়ার্ অন্যতম সেনাপতি নাগপুরের প্রথম রঘুজী ভোঁশ্লা ইহার অধিকার লাভ করেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত হৈহয়-বংশীয় বিম্বাজীর পত্নী (বিধবা) আনন্দীবাই স্বামীর রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিঠলদেবের সময়ে অত্যন্ত অরাজকতা হয়। ১৮ ৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ প্রথম রায়পুর রাজ্যে প্রবেশ করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল্-এগ্নিউরের হস্তে প্রথম রায়পুরের শাসনভার অর্পিত হয়। ইংরেজ-আগমনের পর হইতেই এই নগর জনপূর্ণ হইতে থাকে, এখন ইহা বিলক্ষণ্ সমৃদ্ধিশালী।

রায়পুরে প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক নিদর্শন বিদ্যমান। তন্মধ্যে বর্ত্তমান নগরের দক্ষিণপশ্চিমে হৈহয়-বংশীয় ব্রহ্মদেব-প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বিস্তৃত নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই বোধ হয় রায়পুরের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কীর্ত্তি। ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ভুবনেশ্বর সিংহ রায়পুর দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এখনও উহার চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। দুর্গের পূর্ব্বভাগে ৪০০ বৎসরের প্রচীন একটি সুবৃহৎ জলাশয় আছে। এই সাগরতুল্য জলাশয়ের পরিমাণ একবর্গ মাইল। উহার প্রচলিত নাম বুড়াপুখুর। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রায়পুর-রাজ বিম্বাজী একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উহাও বেশ দৃষ্টিরম্য। ঐ দেবভবন রামচন্দ্রজীর মন্দির নামে খ্যাত। আর একটি বৃহৎ জলাশয় দেখা যায়। ঐ জলাশয়কে সাধারণে কোদণ্ডসিংহের পুষ্করিণী বলে। ঐ জলাশয়টি ও প্রাচীন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তৈলিক-জাতীয় শোভারামসিংহ একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করেন। উহার নাম অম্বাপুষ্করিণী। অম্বাপুষ্করিণীর চারি তীর প্রস্তর-সোপানে গ্রথিত। দুর্গের দক্ষিণদিকে মহারাষ্ট্রীয় রাজস্ব-সংগ্রাহক দাঁলীর খনিত একটি সরোবর আছে। উহারও বিস্তার অর্দ্ধমাইলের

ন্যূন নহে। নগরের মধ্যস্থলেই কৃপালগির মহান্তের কঙ্কালী দীর্ঘিকা। ঐ দীর্ঘিকার ঠিক মধ্যস্থলে মধ্যবিন্দুর ন্যায় মহাদেবের একটি মন্দির বিরাজমান। ঐ স্থানটি দর্শকের অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ।

ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে লিখিতে হইলে এদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অগ্রেই ভুঞ্জিয়া ও গোণ্ডদের নাম করিতে হয়। তাহার পরই কানবার-গণ। ইহারাও একটি আদিম পরাক্রান্ত জাতি। এক-সময় কানবারেরা ভূঞ্জিয়াদিগকে তাড়াইয়া রায়পুর রাজ্যের অনেক স্থল অধিকার করিয়াছিল। ভূঞ্জিয়ারা বহুকাল হইতে হৈহয়বংশীয় রাজাদের সৈনিক ও দূতের কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় অধিকতর সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। দরিদ্র রাজপুতেরা সময়ে সময়ে রাজগোণ্ড ও ভুঞ্জিয়াদের সহিত কন্যা-আদান-প্রদান করায় উভয় জাতিই গৌড়-ক্ষত্রিয় বা মিশ্রক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভুঞ্জিয়ারা এখনও 'ঝগড়াখণ্ড' নামক তরবারির পূজা করে। এতদ্ভিন্ন এই প্রদেশের শবর খন্দ কোল প্রভৃতি আদিম অধিবাসিগণ অনার্য্যজাতি হইলেও ক্রমশঃ হিন্দু-সম্পর্কে হিন্দু সভ্যতা লাভ করিতেছে।

এ প্রদেশে উচ্চবর্ণের বাস অধিক নাই। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে রাজা কল্যাণসাহী কয়েক ঘর কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ আনাইয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাষ্ট্র-অভ্যুদয়ের সময়ে অনেক মরাঠী ব্রাহ্মণ আসিয়া এদেশে বাস করিয়াছেন। ভারতবর্ষের উচ্চবর্ণের স্বভাবই এই যে, যেখানে যে শ্রেণীর সংখ্যা অধিক, তাঁহারাই সেখানে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইতে চেষ্টা করেন এবং যাহারা সংখ্যায় অল্প তাহাদিগকে একরূপ গণনার মধ্যেই আনিতে চাহেন না। এখানেও ঐ পদ্ধতি। সংখ্যাধিক মরাঠা ব্রাহ্মণেরা মুষ্টিমেয় কনৌজিয়াদিগকে হেয় জ্ঞান করেন। কিন্তু এই রূপ নীতি ও ধর্ম্মবিগর্হিত ব্যবহার ভারতীয় উচ্চবর্ণের উন্নতির অন্তরায় ও একতার প্রতিবন্ধক। মরাঠী ব্রাহ্মণেরা

এখানকার দীর্ঘকালের অধিবাসী হইলেও, অভিনব-উপনিবেশী বাঙ্গালীরাই অপেক্ষাকৃত উন্নত। বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা ও সভ্যতায় ইঁহারাই রায়পুরের অলঙ্কার। উৎকলের সন্নিহিত বলিয়া এখানে উড়িষ্যারও নানাশ্রেণীর লোক বাস করে। কিন্তু তাহারা তত উন্নত নহে।

রায়পুরের লোকেরা স্বজাতীয়ের সহিত কথোপকথন কালে আপন আপন মাতৃভাষা ব্যবহার করেন। সুতরাং এখানে মরাঠী বাঙ্গালা উড়িয়া হিন্দী সমস্তই প্রচলিত। সভা সমিতি ও বিচারালয়ে শিক্ষিত লোকদের সর্ব্বভেদবিনাশিনী ইংরাজি-ভাষারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এদেশের লোকদেরও একটা ভাষা আছে, কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কেহ তাহার অনুসন্ধান করে না। এখানকার পর্ব্বতে গৈরিক মৃত্তিকাও লৌহের খনি আছে। অরণ্যে শাল ও মহুয়া বৃক্ষ বিস্তর। লাক্ষা এবং তূলাও কম জন্মে না। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধান্য গোধূম সর্ষপই প্রচুর। এখানে দুগ্ধ ও ঘৃত বেশ সুলভ। স্থানীয় স্বাস্থ্য অতি উত্তম। কাহারও কোন ব্যাধি নাই, সকলেই বলিষ্ঠ ও শ্রমসহিষ্ণু।

রায়পুরের দ্রষ্টব্যগুলি একরূপ সন্দর্শন করা শেষ হইল। আমি দুই দিন পরে ৩০শে চৈত্র বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন-কৃত্য শেষ করিয়া দশটার সময় পুনরায় রায়পুর ষ্টেশনে বাষ্পশকটে আরোহণ করিলাম। রায়পুর একটি জংসন। এখান হইতে একটি শাখা-রেলপথ ধামতারি পর্য্যন্ত গিয়াছে। নগর অতিক্রম করিলেই কুমারী নামক ষ্টেসনের পার্শ্বে কুমারী নাম্নী একটি পার্ব্বত্যনদী আমাদের নয়নপথে পতিত হইল। ঐ বিমলসলিলা স্রোতস্বিনী মধ্যাহ্ন-সূর্য্যকিরণ-সম্পর্কে রজত-ধারার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। বিভিন্ন পথগামী স্রোতোদ্বয়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের অধিত্যকায় পাষাণময় মন্দিরে নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি

বিরাজিত। স্থানটি বড়ই মনোহর, দেখিলেই মনে এক প্রকার বিমল শান্তির উদয় হয়।

তাহার পর, ভীষণ অরণ্যপথ দিয়া গাড়ী চলিল। উভয়দিকের পার্ব্বত্যভূমি কেবল শালবন বংশকানন ও বিবিধ কণ্টকতরুতে সমাচ্ছন্ন। প্রায় লোকালয় দৃষ্টিগোচর হয় না। মধ্যে মধ্যে নিবিড় বনের মধ্যে পর্ব্বতের উপর আমগাছে হরিদ্রাবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আম ঝুলি-তেছে। ষ্টেসনগুলির দূরত্ব অত্যন্ত অধিক। অপরাহ্নে তমসার-রোড্ ষ্টেসনে গাড়ী থামিল। ভীল ও সাঁওতাল-বধূরা সান্তারিয়া ফল (১) বিক্রয়ের জন্য আসিতেছিল কিন্তু রেলপুলিস্ প্রথমে তাহাদিগকে গাড়ীর নিকটে যাইতে দিল না, আটকাইয়া রাখিল। ট্রেন্ ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে তাহারা মুক্তি পাইয়া যাহা বিক্রয় করিল তাহাও দুর্ব্বৃত্তেরা কাড়িয়া লইল। সেই দরিদ্র বন্যরমণীদের কাতর ক্রন্দনে আরোহীদের অনেকের হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হইল। কিন্তু তখন কোনই উপায় ছিলনা।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেখা গেল, রেলপথ একটি উন্নত পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া গিয়াছে। যখন তিমিরাবৃত পর্ব্বতরন্ধ্রে (tunnel) শকটমালা প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন বোধ হইল যেন পিপীলিকা-শ্রেণী বল্মীকবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে। পর্ব্বতরন্ধ্র-প্রবিষ্ট আরোহিগণ ঘন ঘন ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে আমরা সেই সূচিভেদ্য তিমির-রাশির মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ, শুভ্র পীত লোহিত নানাবর্ণের মেঘে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। সান্ধ্যবায়ু মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। গ্রীষ্মের সেই রমণীয় অপরাহ্নে বাষ্পশকট শ্রান্ত পশুযূথের ন্যায় নাগপুর সহরের জনাকীর্ণ ষ্টেসন মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা যখন ট্রেন্ হইতে অবতরণ করিলাম, তখন প্রায় সাড়েছয়টা।

(১) এক প্রকার সুমিষ্ট কমলা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নাগপুর বড় সহর। এখানে অসংখ্য একা, ঘোড়ার গাড়ী বগী ফেটিং প্রভৃতি আরোহীর প্রতীক্ষা করিয়া আছে। একখানি একা ডাকিয়া অনতিবিলম্বে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম (১)। পরদিন ১৮১৬ শকাব্দের ১লা বৈশাখ, পূর্ব্বাহ্ণে নূতন 'টাউনহল্' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি সভার অধিবেশন হয়। যাঁহার বাসায় ছিলাম, তাঁহার সহিত সভার কার্য্য দেখিতে গেলাম। নাগপুরের চিফ্‌কমিসনার্ সভাপতি। বহু শিক্ষিত লোকের সমাগম হইয়াছিল। অনেককে স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। এত অধিক জনতা হইয়াছিল যে একটি কথাও কর্ণগোচর হইল না। সভাভঙ্গের সময় যুবকগণের পদাঘাতে অধিকাংশ কাষ্ঠাসন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইল।

আসার সময় হিল্‌সপ্-কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত সদাশিব জয়রাম M.A. মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইল। অধ্যাপক-প্রবর বিশেষ যত্ন করিয়া লইয়া গেলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত নাগপুরের পুরাতত্ত্ব ও সংস্কৃত-সাহিত্য-সংক্রান্ত কথোপকথন হইল। পণ্ডিতবরের মাতৃভাষা মরাঠী ও আমার মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সুতরাং আমরা উভয়েই আমাদের পূর্ব্বপিতামহদের অনুসৃত দেবভাষা অবলম্বন করিলাম। পণ্ডিত সদাশিবজয়রাম একজন উন্নতস্বভাব কৃতবিদ্য ব্যক্তি। আমি তাঁহার সহিত আলাপে পরম আনন্দ লাভ করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উক্ত পণ্ডিতবরের বাটীতে মরিস্-কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত কেশবগোপাল তামনূকর M. A. মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইল। পণ্ডিত তামনূকরও শিষ্টতাপূর্ণ

(১) যাঁহার বাসায় অবতরণ করিলাম, ইনি নাগপুরের ডাক্তার তারানারায়ণ রায় M. B.

আলাপে আমাকে পরম আপ্যায়িত করিলেন। বলা বাহুল্য নাগপুর সন্দর্শন করাই আমার এখানে অবতরণের উদ্দেশ্য। আমি দুই দিনে নাগপুরে যাহা যাহা সন্দর্শন করিয়াছিলাম ক্রমে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করিতেছি। নাগপুর ভাণ্ডারা গোণ্ডা বর্দ্ধা এবং বালাঘাট এই পাঁচটি জেলা লইয়া মধ্যপ্রদেশের নাগপুর বিভাগ গঠিত। নাগপুর এই বিভাগের হেড্-কোয়াটার্ এবং একটি উচ্চশ্রেণীর সহর। সহরটি নাগনদীর তীরে অবস্থিত। মধ্যপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা চিফ্ কমিসনার্ এবং বিভাগীয় ডেপুটি কমিসনার্ ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ নাগপুরে বাস করেন। এখানে রাজকীয় সৈন্যাবাস, চিফ্ কমিসনারের বিস্তৃত কার্য্যালয় এবং দেওয়ানি ফৌজদারি আদালত আছে।

এই নগরের নাগপুর নাম কেন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন লিখিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। কেহ বলেন,—"নাগনদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাগপুর নাম হইয়াছে" কিন্তু ঐ মতটি তত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সকলেই জানেন বৈদিক যুগের পূর্ব্বে অনার্য্য ও নাগ-জাতিতেই ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত ছিল। নাগেরা অপেক্ষাকৃত সভ্য ছিল। তাহারা অনার্য্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে আগমনের পূরেও নাগদিগের রাজ্য শাসনের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় (১)। আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যবসতি বিস্তারের পরও বহুকাল দক্ষিণাপথে নাগদের আধিপত্য

(১) মহর্ষি জরৎকারু নাগরাজভগিনী জরৎকারুকে বিবাহ করেন। (মহাভারত আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তিকপর্ব্ব ১৪শ ১৫শ অধ্যায়) অপিচ তক্ষককর্ত্তৃক পরীক্ষিতের দংশন ও ঋষিপুত্র শৃঙ্গীর অভিযোগে তক্ষশিলার নাগরাজকর্ত্তৃক চন্দ্রবংশীয় পরীক্ষিতের ধর্ষণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আস্তিকপর্ব্ব ৪৯।৫০ অধ্যায়। এতদ্ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যমুনাহ্রদে কালিয়দমন ব্যাপার ও মথুরায় কালিয়নামক নাগরাজের পরাজয় মাত্র। (ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পাঠ করুন।)

অক্ষুণ্ণ ছিল। অবশেষে তাহাদের কিয়দংশ ক্ষত্রজাতির সহিত মিলিত হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট নানাবিধ শূদ্রজাতিতে পরিণত হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও এক নাগরাজ নর্ম্মদার উত্তরতীর হইতে বেণ্বানদীর (২) তট পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগে রাজত্ব করিতেন (৩)। সম্ভবতঃ ঐ সকল নাগজাতির নামানুসারেই এই নগরের নাগপুর নাম হইয়াছে। নাগপুর অপ্রাচীন নহে। মহাকবি কালিদাসের সময়েও এখানে কোন প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি রাজত্ব করিতেন (৪)। তাহার পর, নাগদের অন্যতম শাখা গৌলীজাতিকর্ত্তৃক এই প্রদেশ শাসিত হয়। প্রদেশীয় সঙ্গীতে গৌলীগণের অনেক বীরত্ব কাহিনী বর্ণিত আছে। তাহার পরই এই জনপদ গোণ্ড-জাতির হস্তগত হয়। প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে গোণ্ড জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

গোণ্ডজাতির আদিম বাসভূমি গোণ্ডবন বা গোণ্ডোয়ানা। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলেন ;—"তেলেগুভাষার কোণ্ড শব্দ হইতে গোণ্ড শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কোণ্ড শব্দের অর্থ পর্ব্বত। পূর্ব্বে ইহারা পর্ব্বতে বাস করিত বলিয়া গোণ্ড নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে"। গোণ্ডজাতির অনেক শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে রাজগোণ্ড বা রাজগোঁড়গণই শ্রেষ্ঠ। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণে ইহাদের পৌরহিত্য করে এবং ইহারা বিবাহাদি কার্য্যে ক্ষত্রিয় আচারের অনুসরণ করিয়া থাকে। গোণ্ডবনের অন্তর্গত গড় ও মণ্ডলে গোঁড়রাজগণের দুইটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। গড়রাজ্যের গোঁড়জাতীয় রাজা দলপৎশা মহোবানগরের চন্দেল-বংশীয় রাজপুত রাজার কন্যা দুর্গাবতীর রূপগুণের সংবাদে মুগ্ধ হইয়া মহোবারাজের নিকট দুর্গাবতীকে প্রার্থনা করেন। রাজা নিজের অপেক্ষা হীনজাতীয়

(২) বেণ্বানদী নাগপুরের অনতিদূরে প্রবাহিত হইতেছে।

(৩) কালিকাপুরাণ ও ললিতবিস্তরে নাগরাজ সুদর্শনের বৃত্তান্ত আছে।

(৪) অথোরগাখ্যস্য পুরস্য নাথম। (রঘুবংশম)

গোঁড়রাজের হস্তে ঐরূপ রূপবতী কন্যা অর্পণে অসম্মত হন। দলপৎশা বিরত না হইয়া আপন সৈন্য সামন্ত সহ চন্দেলরাজপুতদের রাজধানী আক্রমণ করেন এবং রাজাকে পরাস্ত করিয়া দুর্গাবতীকে হরণ করিয়া লইয়া আইসেন। রাজকুমারী দুর্গাবতীর সহিত দলপৎশার বিবাহের পর এক বৎসরের মধ্যে একটি পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রের নাম বীরনারায়ণ। পুত্রের বয়স যখন তিন বৎসর সেই সময়ে দলপৎশার মৃত্যু হয়। দিল্লীর সম্রাট্ আকবরের মাণিকপুরস্থ প্রতিনিধি আসফর্খা গড়রাজ্য আক্রমণ করিলে বিধবা রাণী দুর্গাবতী সংগ্রামক্ষেত্রে অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে রাণী ও তাঁহার পুত্রের প্রাণ-বিয়োগ ঘটে। বীরনারায়ণের পুত্র রাজা হৃদয়েশ্বর গড়রাজধানীতে মতিমহল নামে একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পত্নী রাণী সুন্দরীর প্রতিষ্ঠিত পঞ্চরত্ন নামক বিষ্ণুমন্দিরও অদ্যাপি দর্শকের চিত্ত বিমোহিত করিয়া থাকে।

গোঁড়দের অন্যান্য শ্রেণীগুলি তত সভ্য নহে। উহাদের কেহ কৃষক কেহ মৃগয়াজীবী, কেহ বা গবাদির আহার্য্য তৃণাদি সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। এক সম্প্রদায় চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কেহ বাদ্যকর কেহ বা পশুপালক। কেহ পথে পথে গান গাহিয়া বেড়ায়। উহাদের কন্যারা নর্ত্তকীর কার্য্য করিয়া থাকে। মাদিয়াল গোঁড়েরাই উহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অসভ্য। তাহারা এখনও বস্ত্র পরিধান করিতে শিখে নাই। বস্ত্রের পরিবর্ত্তে কতকগুলি লতা-পত্রদ্বারা দেহ আচ্ছাদন করে। উহারা মানুষ দেখিলেই অরণ্যমধ্যে পলায়ন করে। রাজার করসংগ্রাহকেরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া ঢাক বাজাইয়া লুক্কায়িত হয়। মাদিয়াল গোঁড়েরা মৃগ-চর্ম্ম চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি কর-স্বরূপ সেই স্থানে রাখিয়া প্রস্থান করে। গোঁড়েরা শূকর উৎসর্গ করিয়া বুড়াদেবের পূজা করে। উহাদের বিশ্বাস

ঘণ্টারাম প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা এবং দণ্ডেশ্বরী নাম্নী তাঁহাদের ভগিনীই জীবের রোগমৃত্যুর কারণ।

নাগপুর মুসলমানের হস্তগত হইবার পূর্ব্বে জটবানামক এক গোঁড়রাজ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। ইনিই ভীমগড়নামক পার্ব্বত্য দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাগপুর প্রদেশ এক মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীন থাকে। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পর ইহা মহারাষ্ট্র-যোদ্ধসম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা রঘুজী ভোঁশ্লের অধিকারে আইসে। ভোঁশ্লেবংশীয়গণ কিঞ্চিদূন এক শতাব্দী এই রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা বৃটীশসাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছে। এখনও রাজ্যাধিকার-বঞ্চিত ভোঁশ্লেবংশীয় রাজার দুই পুত্র বিদ্যমান আছেন। ইঁহারা ইংরেজগবর্মেণ্ট হইতে মাসিক কয়েক সহস্র মুদ্রা ও কয়েকখানি গ্রামের রাজস্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নাগপুরে ভ্রমণকারীর দেখিবার অনেক আছে। তন্মধ্যে এই নগরের ঈশানকোণে তিন ক্রোশ দূরে কালিদাস-বর্ণিত মেঘদূতের সেই রামগিরি অবস্থিত। পার্ব্বত্যজাতিরা পাহাড়কে টেক্ বলে। তজ্জন্য রামগিরি ঐ দেশীয় লোকের নিকট "রামটেক্" নামে পরিচিত। কথিত আছে ;--এক যক্ষ ধনাধিপ কুবেরের অনুচর ছিল। উহার বাসভবন কুবেরের রাজধানী অলকানগরীর প্রান্তভাগে। যক্ষ তরুণ-বয়স্ক, সে মধ্যে মধ্যে প্রভুর অজ্ঞাতসারে গৃহে গিয়া তাহার প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিত। একদা গৃহে গেলে তাহার প্রণয়িনী সে রাত্রি থাকিতে অনুরোধ করিল। প্রভুর কার্য্যে অবহেলা করিলে প্রভু ক্রুদ্ধ হইবেন—ইহা জানান সত্ত্বেও সে তাহাকে বিদায় দিল না। শরৎকাল, জ্যোৎস্নাস্নাত রজনী, বিমল আকাশে নক্ষত্ররাজি বিরাজ-মান। যক্ষভবনের বাহিরের প্রাঙ্গণে উদ্যান, উদ্যান মধ্যে ক্রীড়া সরোবর। সরোবরের মৃদু তরঙ্গে সুধাংশুর প্রতিবিম্ব শতধা হইয়া

ক্রীড়া করিতেছে। বিকসিত কুসুম-সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। ভ্রমরেরা মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া সংগীতে মত্ত হইয়াছে। ঐ রমণীয় সময়ে যক্ষ তাহার প্রিয়তমার হস্তাবলম্বন করিয়া কিছুক্ষণ পুষ্পবীথিকার মধ্যে পরিভ্রমণ করিল। তাহার পর, তাহারা সরোবরতীরস্থ শুভ্র প্রস্তরাসনে বসিয়া কথোপকথন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। নিশাবসান হইল, ঊষার লোহিত আলোকে পূর্ব্বদিক্ রঞ্জিত হইল কিন্তু যক্ষদম্পতি তখনও নিদ্রিত। এদিকে কুবের প্রত্যূষে শিবপূজার্থ মন্দিরে গিয়া দেখেন পূজোপকরণ প্রস্তুত হয় নাই। তিনি বিস্মিতভাবে ভৃত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে যক্ষ কম্পিতকলেবরে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কুবের ধ্যানস্থ হইলেন, কিছুই তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। তাহার পর, বজ্র-কঠোর স্বরে যক্ষকে বলিলেন ;—যক্ষ ! তুমি যে প্রিয়তমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমার কার্য্যে অবহেলা করিয়াছ, অদ্য হইতে তাহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া এক বৎসর কাল রামগিরি পর্ব্বতে গিয়া বাস কর।" যক্ষের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, সে কুবেরের চরণে পতিত হইয়া অনেক অনুনয় করিল কিন্তু তাঁহার ক্রোধের উপশম হইল না। অগত্যা যক্ষ বিচ্ছেদবিহ্বলা প্রণয়িনীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রামগিরিতে প্রস্থান করিল। কার্ত্তিক হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কোন রূপে যাপন করিল। তাহার পর, আষাঢ়ের প্রথম দিবসে আকাশে নূতন মেঘের উদয় দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহার গৃহ যে দিকে, সেই দিকে মেঘকে যাইতে দেখিয়া প্রিয়তমার নিকট স্বীয় সন্দেশ লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিল। এই সেই রামগিরি; ইহাই মেঘদূত-কাব্যের নায়কের লীলাস্থলী। এখানে আসিলে কালিদাসের কবিতাকে যেন মূর্ত্তিমতী দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও এই পর্ব্বতোপরি বিমল সরোবর ও ছায়াপ্রধান তরুরাজি দর্শকের

চিত্ত হরণ করে। রামটেক-পাহার সমতল ভূমি হইতে ১৪০০ ফিট্ উচ্চ। এখনও উহার অধিত্যকায় প্রাচীন দুর্গ ও পুরাতন দেবমন্দির সকল বিরাজমান রহিয়াছে।

নাগপুরের মহারাজবাগ ও তুলসীবাগ নামক দুইটী উদ্যানের দৃশ্য ও অতিমনোহর। নানাবিধ কুসুমময়ী লতিকা এবং অসংখ্য পুষ্পফলের বৃক্ষরাজি শ্রেণীবদ্ধভাবে বিরাজিত। উহার মধ্যবর্ত্তী জলাশয়ে কাক-চক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ জল থৈ থৈ করিতেছে। গ্রীষ্মকালের পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে এই সকল উপবনে ভ্রমণ করিতে আসিলে কোকিল পাপিয়া প্রভৃতি বনবিহঙ্গের মধুর কাকলীতে মন বিমুগ্ধ হয়। নগর মধ্যে অম্বাঝারি জমাতলাও এবং তেলিঙ্গখেরি নামে তিনটি বৃহৎ জলাশয় বিদ্যমান। এই সকক জলাশয়ের জলও বিলক্ষণ বিমল। ঘাটগুলি পাষাণময় সোপানাবলীতে পরিশোভিত এবং হাস্যময়ী পুরসুন্দরীদের পরস্পর বিদ্রূপালাপে সদা মুখরিত। সুযোগ বুঝিয়া দিগম্বর সন্ন্যাসিগণ জলাশয়তীর আশ্রয় করিয়াছেন। সম্মুখে ত্রিশূল প্রোথিত এবং দারুণ গ্রীষ্মেও অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত। ঔষধার্থিনী রমণীদের আনীত ফলমূল এবং দুগ্ধেই প্রায় ঐ সকল সন্ন্যাসীর জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পণ্ডিত সদাশিবজয়রাম ভোঁস্লেবংশীয় রাজকুমারগণের গৃহশিক্ষক। ২রা বৈশাখ তাঁহার সহিত ভোঁস্লে-রাজভবন দেখিতে গেলাম। যে স্থানে উক্ত রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান, ঐ স্থানটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ। রাজভবনে বহু প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান। গৃহগুলি কৃষ্ণবর্ণ পাষাণে বিনির্ম্মিত এবং বহুবিধ কারুকার্য্যে মণ্ডিত। অঙ্গণ-মধ্যে স্থানে স্থানে বকুলবীথিকা, কোন স্থান বা অন্যবিধ পুষ্পিত তরুতে পরিশোভিত। গৃহগুলির শিল্পনৈপুণ্য চিত্তাকর্ষক হইলেও উহাদের আকার যেন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক, এক সময়ে এই

ভোঁস্লেরাজভবন প্রতাপ ও বীরত্বের আশ্রয়-স্থল ছিল। এখন সেই বীরত্ব স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত, শোভা সমৃদ্ধিও বিনষ্ট প্রায়। সূর্য্যের অস্তগমনে কমল-বনের ন্যায় ঐ রাজভবন এখন শ্রীহীন। রঘুজী ভোঁস্লের অধস্তনবংশীয় দুই রাজকুমার আছেন। জ্যেষ্ঠকুমার নীলগিরিতে গ্রীষ্ম যাপন করিতেছেন। পণ্ডিত সদাশিব জয়রাম, কনিষ্ঠ কুমার লক্ষ্মণরাও ভোঁস্লের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। রাজকুমার বিলক্ষণ বিনীত এবং শান্ত। বয়স সপ্তদশ কি অষ্টাদশ বৎসরের অধিক নহে। আমার সহিত হিন্দী ও ইংরাজীতে দুই চারিটি কথা বলিলেন। এই বংশ মহারট্ঠ বা মারাঠাজাতি-সম্ভূত। নাগপুরে ইঁহারা এখন মরাঠা-ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত। বড়োদার গায়কবার বংশের সহিত ভোঁস্লে-বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়া থাকে। বড়োদার মহারাজের সেনাপতি আনন্দরাও গায়কবারের কন্যার সহিত কুমার লক্ষ্মণরাও ভোঁস্লে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।

নাগপুর নগরটি সমতল ভূমিতে অবস্থিত নহে। পার্ব্বত্য প্রদেশ বলিয়া কোথায়ও উচ্চস্থান, কোথায় নিম্নস্থান, কোথাও চাপুপ্রদেশ। মধ্যে মধ্যে তেঁতুল অশ্বথ আম্র প্রভৃতি নানা উন্নত বৃক্ষরাজি বিরাজিত। রাজপথগুলি প্রস্তরময়। উহার উভয় পার্শ্বে অট্টালিকা ও খোলার ঘরগুলি দেখিতে মন্দ নহে। প্রাচীন তরু ও উদ্যানরাজি-সমাকীর্ণ নগরের দৃশ্যটি মনোহর। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন কোন কোন অট্টালিকা তরুলতার অন্তরালে লুকাইয়া আছে. কোন কোনটিবা আপন শুভ্র অঙ্গ দেখাইবার জন্য হাসিমুখে উঁকি মারিতেছে। চতুর্দ্দিকে শস্যক্ষেত্র ও পর্ব্বত-শ্রেণী স্বজনবর্গের ন্যায় এই প্রাচীন নগরকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

৪ঠা বৈশাখ অপরাহ্ণ ৬টার সময় নাগপুর-ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। তখন ষ্টেসন নানাদেশীয় নানা ভাষাভাষী লোকের

কলরবে পরিপূর্ণ। নিদাঘের সেই রমণীয় অপরাহ্ণে ষ্টেসনের দৃশ্যটি বেশ মনোজ্ঞ বোধ হইল। বাঙ্গলোগুলি অতি সুন্দর, মধ্যে মধ্যে পুষ্পবীথিকা। কোন কোন বাঙ্গলো কুসুমিত লতাবিতানে আপাদ-মস্তক সমাচ্ছন্ন হইয়া চিত্রিত দেহে বিরাজ করিতেছে। দুই চারিটি ইংরাজ ও পারসীক আপন আপন সঙ্গিনী সহ প্লাটফরমে পা-চালি করিয়া বেড়াইতেছেন। দেশীয় লোকের ব্যস্ততা এবং ছুটাছুটি সর্ব্বত্রই সমান। আমি একখানি টিকিট করিয়া সদ্যঃ পরিচিত কয়েকটি আরোহীর সহিত গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। এখান হইতে জি, আই, পি, রেলপথের আরম্ভ। যখন ট্রেন্ ছাড়িল তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। এই বার আমরা বিদর্ভ অভিমুখে চলিলাম। ঐ সময় মহাভারতের সেই প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা স্মৃতিপথে উদিত হইল। এইরূপ স্থানে উপনীত হইয়াই রাজ্যচ্যুত নিষধরাজ নল বনে অনশন-ক্লিষ্টা প্রিয়তমা দময়ন্তীর বিষণ্ণ মুখ সন্দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাকে পিতৃভবন বিদর্ভ রাজধানীতে গমনের জন্য অনুরোধ করিয়া-ছিলেন। নল বলিয়াছিলেন ঃ—'প্রিয়ে! এই সকল পথ অবন্তী এবং ঋক্ষবান্ পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। এই বিদর্ভে যাইবার পথ, ঐ পথটি দক্ষিণকোশলের দিকে গিয়াছে। ইহার পর (অর্থাৎ বিদর্ভ অতিক্রম করিলেই) দক্ষিণদিকে দক্ষিণাপথ বিদ্যমান।" (১) প্রকৃত পক্ষে ও নাগপুরের পশ্চিমেই বিদর্ভ (বর্ত্তমান বেরার্) পূর্ব্বদিকে প্রাক্‌কোশল (বর্ত্তমান ছত্রিশগড়) এবং বিদর্ভ

(১) এতে গচ্ছন্তি বহবঃ পন্থানো দক্ষিণাপথম্।
অবন্তীমৃক্ষবন্তঞ্চ সমতিক্রম্য পর্ব্বতম্ ॥
এষ পন্থা বিদর্ভাণামসৌ গচ্ছতি কোশলান্।
অতঃপরঞ্চ দেশোঽয়ং দক্ষিণে দক্ষিণাপথঃ ॥
(মহাভারত—বনপর্ব্ব।)

অতিক্রম করিলেই দক্ষিণাপথের আরম্ভ। আমার সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ পণ্ডিত সদাশিবজয়রামের পরিচিত সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ষ্টেশনেই তাঁহাদের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল। ঐ সকল মরাঠী ভদ্রলোকের সহিত নিয়ত কাব্যকথার আলোচনা চলিতে লাগিল। পণ্ডিত কেশবগোপাল তামন্‌কর আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন—"আপনার গন্তব্য পথের পার্শ্বেই মহাকবি ভবভূতির বাসস্থলী পড়িবে, ইচ্ছা হইলে নামিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু সায়ংকালের গাড়ীতে গেলে গভীর রাত্রিতে ঐ স্থানে উপস্থিত হইতে হয়। অরণ্যবহুল স্থানে ঐরূপ সময়ে অবতরণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।" আমি দূর পথের যাত্রী, সুতরাং আমার পক্ষে অন্য ট্রেণে যাওয়া সুবিধা-জনক নহে, কাজেই সায়ংকালে যাত্রা করিতে হইল কিন্তু সেই মানোন্নত মহাকবি যে নগরে অবস্থিতি করিয়া লেখনী পরিচালনা করিতেন, সেই গৌরবময় স্থানের শেষ চিহ্ন তরুলতাগুলি দেখিবার জন্য ও মন অত্যন্ত উৎসুক হইয়া রহিল। চান্দুর (Chandur) ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইলেই মরাঠী বন্ধুগণ বলিলেন,—"ঐ দেখুন ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে চন্দ্রপুর নামক একটী পল্লী দৃষ্টিগোচর হইতেছে। উহারই নিকটে বিদর্ভের সুপ্রসিদ্ধ পদ্মপুর নগর বিদ্যমান ছিল। অদ্যাপি ঐ নগরের শেষ চিহ্ন বৃহৎ বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ ও প্রস্তররাশি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পদ্মপুরেই মহাকবি ভবভূতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (১)।" আমি তাঁহাদের কথা

(১) অস্তি দক্ষিণাপথে বিদর্ভেষু পদ্মপুরং নাম নগরম্। তত্র কেচিত্তৈত্তিরীয়িণঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিনঃ উড়ুম্বরা ব্রহ্ম-বাদিনঃ প্রতিবসন্তি। তদামুষ্যায়ণস্য তত্র ভবতো বাজপেয়যাজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমঃ সুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্ত্তে র্নীলকণ্ঠস্য আত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠপদ-

শুনিয়া অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত রেলপথের বামভাগে প্রদর্শিত পল্লীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। তখন রাত্রি অনেক। প্রাচীন তরুরাজির অস্পষ্ট ছায়া ব্যতীত আর কিছুই নয়নগোচর হইল না। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে (১) যখন মহাকবি ভবভূতির আবির্ভাবে পদ্মপুর অলঙ্কৃত হইয়াছিল এবং বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে যখন ভগবান্ কালপ্রিয়-নাথের যাত্রা মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইত, তখন ঐ নগরীর কতই সমৃদ্ধি ছিল, এখন নগর বিনষ্ট, উৎসব বিলুপ্ত, কাল যাহা অনায়াসে বিনাশ করিতে অক্ষম, মহাকবির সেই নাম ও কীর্ত্তিমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। যতদিন জগতে জ্ঞানের অনুশীলন বিদ্যমান থাকিবে ততদিন উহার ক্ষয় নাই।

চান্দুরের পর তিনটি ষ্টেসন অতিক্রম করিলেই আমরা সুপ্রসিদ্ধ অমরাবতী প্রাপ্ত হইলাম। অমরাবতী নগরী বেরার্ (বিদর্ভ) প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী। পুরাকালে এই স্থানে একটি প্রধান বৌদ্ধবিহার ছিল। অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে বাস করিতেন। তাহার পর, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকলের রাজা সূর্য্যদেব এই স্থানে বর্ত্তমান অমরাবতী নগরী স্থাপন করেন। অমরাবতীতে হিন্দু ও বৌদ্ধকীর্ত্তি বিস্তর। এখানকার ভবানীর মন্দির এক অপূর্ব্ব দর্শনীয় পদার্থ। সাধারণে ঐ কারুকার্য্য-বিশোভিত মন্দিরকে অম্বার মন্দির বলিয়া থাকে। অম্বার মন্দির ব্যতীতও এখানে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বহু দেবালয় ও মঠের নষ্টাবশেষ বিদ্যমান আছে। অধুনা

লাঞ্ছনো ভবভূতির্নাম জাতূকর্ণীপুত্রঃ কবির্মিত্রধেয়মস্মাকমিত্যত্রভবন্তো বিদাঙ্কুর্ব্বন্তু।

(বীরচরিতম্।)

(১) প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন—মহাকবি ভবভূতি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

অমরাবতী স্থতার কলের জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইউরোপীয় ও দেশীয় অনেক বণিক্ বাণিজ্য উপলক্ষে এখানে বাস করেন।

কিছুক্ষণ পরে বাষ্পযান অমরাবতী ষ্টেসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। বাষ্পশকটে সমস্ত নিশা যাপন করিয়া প্রত্যূষে আমরা ভোঁশোয়াল নামক ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ভোঁশোয়াল জি, আই, পি, রেলপথের একটি জংসন। এখান হইতে একটি রেলপথ নাসিক বা পঞ্চবটীতীর্থের নিকট দিয়া বরাবর বম্বে গিয়াছে, অপর রেলপথটি খাণ্ডোয়া-জংসনে গিয়া জব্বলপুর হইতে সমাগত একটি রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। আমরা খাণ্ডোয়ায় যাইব, সুতরাং এখানে অবতরণ করিলাম। অবশিষ্ট আরোহী লইয়া উক্ত বাষ্পশকট বম্বে অভিমুখে ধাবিত হইল। ভোঁশোয়াল ষ্টেসনটি ঈষৎ লাল-আভাযুক্ত বালুকাময় প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত। ষ্টেসনে শ্রেণীবদ্ধ কয়েকটি জলের কল আছে, তাহাতেই যাত্রীদের স্নানাদি নির্ব্বাহিত হয়। অদূরে একটি দীর্ঘিকা, উহার জল অতিশয় নির্ম্মল। তীরে আম্রকানন। আমরা প্রাতঃকালে স্নানের পর হইতেই ঐ কাননের ছায়াশীতল তরুমূল আশ্রয় করিয়াছিলাম। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই আতপ-সন্তপ্ত যাত্রিগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া ঐ আম্রকাননে সমবেত হইতে লাগিল। ঐ বাগানে যাত্রীদের জন্য মিষ্টান্নের এবং ফলের দোকান আছে। বেলা দশটা বাজিল, গাড়ীর সময় নিকটবর্ত্তী, সুতরাং ষ্টেসনে চলিলাম। ঐ সময় ষ্টেসনের এক নূতন মূর্ত্তি দেখিলাম। ষ্টেসন লোকে লোকারণ্য। পত্রহীন তরুশাখায় হিন্দুস্থানী মহিলাদের লাল নীল হরিদ্রাবর্ণের কাপড় উৎসব-গৃহের পতাকার ন্যায় উড়িতেছে। আরোহী ও আরোহিণীগণ নানাবিধ বিচিত্র পরিচ্ছদে বিভূষিত। শিশুর রোদন ও মধ্যে মধ্যে ফেরিওয়ালার চীৎকারে ষ্টেসন কোলাহলময়। একটি

বৃক্ষতলে দাক্ষিণাত্য বিদ্যার্থিগণ ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে ব্যাপৃত ছিলেন. এতক্ষণ তাঁহাদের চৈতন্য ছিল না। যেই টিকিটের ঘণ্টা বাজিল. অমনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ব্যগ্রভাবে টিকী দোলাইতে দোলাইতে টিকিট-ঘরের সম্মুখে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দশটা বাজিলেই গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা অবিলম্বে আরোহণ করিলাম। ক্রমশঃ সূর্য্য গগনের সুদূর প্রদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার কিরণজালও নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। চারিদিকে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তাহার পর, আমরা যে পথ দিয়া যাইতে লাগিলাম, উহা একান্ত দুর্গম অরণ্যময়। উহার পার্শ্বে কিংবা দূরে কোথায়ও কোন লোকালয় দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল পাহাড় ও নিবিড় বন। ষ্টেসন সকল অত্যন্ত দূরে দূরে। ষ্টেসনের কর্ম্মচারিগণকে প্রাণ হাতে করিয়া শ্বাপদ-প্রতিবেশিগণের সহবাসে কাল যাপন করিতে হয়। এই দীর্ঘ অরণ্যানীই পুরাকালে খাণ্ডব বন নামে কথিত হইত। বেদে খাণ্ডব বনের উল্লেখ আছে (১)। মহাভারতে এই বন সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। তাহার মর্ম্ম এই ;—পুরাকালে ভারতবর্ষে শ্বেতকি নামে এক যাগশীল রাজা বাস করিতেন। তাঁহার যজ্ঞের বিরাম ছিল না, প্রত্যহই তিনি যজ্ঞে প্রবৃত্ত থাকিতেন। ঐ রাজার যজ্ঞে নিযুক্ত ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞধূমে অন্ধপ্রায় হইয়া সেই নিত্য-যজ্ঞকারী রাজাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু রাজার যজ্ঞের প্রতি আস্থা কমিল না. তিনি আবার অন্য ঋত্বিক্ ডাকিয়া শতবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ

(১) যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক পাঠ করুন।

আরম্ভ করিলেন। পরবর্ত্তী ঋত্বিক্‌গণও রাজার যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি নিরুপায় হইয়া পূর্ব্ব ঋত্বিক্‌গণের শরণাপন্ন হইলেন এবং নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কে অত যজ্ঞের ধূম সহ্য করিতে পারে? সুতরাং ঋত্বিক্‌গণ কোন প্রকারেই সম্মত হইলেন না, তবে রাজাকে বলিয়া দিলেন:— "আপনি মহাদেবকে প্রসন্ন করুন, তিনিই আপনার যজ্ঞের ঋত্বিক্ হইবেন।" রাজা তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে কৈলাস পর্ব্বতে উপনীত হইয়া বহুকাল তপস্যা করিলেন। মহাদেব প্রসন্ন হইলে রাজা তাঁহার নিকট নিজের প্রার্থনা জানাইলেন। মহাদেব বলিলেন:— "আমি স্বয়ং তোমার যাজন করিতে পারিব না, আমার অংশসম্ভূত দুর্ব্বাসা মুনি তোমার যজ্ঞের ঋত্বিক্ হইবেন।" রাজা যজ্ঞের আয়োজন করিয়া পুনরায় মহাদেবের নিকট গমন করিলে, মহাদেব দুর্ব্বাসাকে ডাকিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে আদেশ করিলেন। দুর্ব্বাসা পূর্ব্বনিযুক্ত ঋত্বিক্‌গণের সহিত শতবর্ষ ব্যাপী যজ্ঞ শেষ করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে দীর্ঘকাল প্রত্যহ হব্য ভোজনে অগ্নির উদর পীড়া উপস্থিত হইল। তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় তেজ রহিল না। অগ্নি বিপদে পড়িয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা অগ্নির অবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন—"বৎস অগ্নি! তুমি ভীত হইও না, শ্বেতকি রাজার শতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে প্রত্যহ ঘৃত ভোজন করায় তোমার অগ্নিমান্দ্য ঘটিয়াছে। তুমি যাও, পূর্ব্বে দেবরাজের আদেশে দৈত্যগণের বাসভূমি যে খাণ্ডব-বন দগ্ধ করিয়াছিলে, এখন সেখানে বহু প্রাণীর বসতি হইয়াছে। তুমি পুনরায় সেই স্থান দগ্ধ কর। তত্রত্য বনৌষধী ভোজনে তোমার অজীর্ণ দূর হইবে।" অগ্নি বিধাতার আদেশে বন দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে প্রাণিগণের মধ্যে একটা

মহা-সংক্ষোভ উপস্থিত হইল; সকলেই অগ্নি নির্ব্বাপণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার পর, হস্তিগণ শুণ্ডদ্বারা এবং নাগগণ ফণাদ্বারা জল সংগ্রহ করিয়া অগ্নি নিবাইয়া দিল। অগ্নি নিরস্ত হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের আদেশে কৃষ্ণের সহিত বনে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। অগ্নি মনে মনে একটা কল্পনা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের অতিথি হইলেন। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন;— "আপনার কি অভিলাষ, যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ অন্ন প্রস্তুত করা যাউক।" অতিথি বলিলেন "আমি অগ্নি, এ সকল অন্নে আমার প্রয়োজন নাই। আমি খাণ্ডব-বন ভোজন করিব। অতএব যাহাতে কেহ বিঘ্ন উপস্থিত করিতে না পারে, আপনারা তাহাই করুন।" অর্জ্জুন অগ্নির প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন "আপনি গিয়া নিরুদ্বেগে খাণ্ডব-বন ভক্ষণ করুন, স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্র আগমন করিলেও আপনার ভোজনের কোন বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারিবেন না।" অগ্নি আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলেন না, তৎক্ষণাৎ খাণ্ডব-বনে প্রবেশ করিলেন, বন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, প্রাণিগণ চীৎকার করিতে করিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। কেহ বন হইতে বাহির হইতে পারিল না, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অগ্নির সহায়রূপে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। বনের প্রাণিগণের ঐরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া দেবরাজ কুপিত হইলেন। তাহার পর, অর্জ্জুন ও দেবরাজে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। দেবরাজ অর্জ্জুনের বিক্রমে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। এ দিকে অগ্নি একপক্ষ কাল ব্যাপিয়া বিশাল খাণ্ডব-বন উদরসাৎ করিলেন। কেবল নাগজাতীয় অশ্বসেন ময়দানব এবং শার্ঙ্গকদের চারিজন ব্যতীত সকলেই ভস্মসাৎ হইল।

কালিকাপুরাণের মতে এই বনটি পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণের বিহার স্থান ছিল। চন্দ্রবংশীয় সুদর্শন নামক কোন নরপতি দেবরাজের

আজ্ঞা লইয়া এই অরণ্য পরিষ্কৃত করেন এবং এখানে খাণ্ডবী নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করেন। ঐ পুরী নানা গুণে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। উহার দৈর্ঘ্য চারিশত ক্রোশ ও বিস্তার দ্বাদশ শত ক্রোশ ছিল। সুদর্শনের বলবিক্রমে অনেক রাজ্যের রাজাকেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সুদর্শন কাশিরাজ বিজয়ের সহিত বন্ধুতা করিয়া তাঁহাকে প্রধান অমাত্য-পদে বরণ করেন। কিছু দিন পরে সুদর্শন প্রজাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। উহার ফলে প্রজারা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। প্রধান মন্ত্রী বিজয় সুযোগ পাইয়া আপন প্রভুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে সুদর্শনের পরাজয় হইল। অমাত্য বিজয় খাণ্ডবী পুরী লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র বিজয়ের নিকট আসিয়া জানাইলেন—"এইস্থানে পূর্ব্বে একটি বন ছিল, সেই বনে দেব ও গন্ধর্ব্বগণ মহাসুখে বিহার করিতেন। রাজা সুদর্শন তাঁহাদের সেই সুখে বাধা দিয়া এই স্থানে খাণ্ডবী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দেবগণের ইচ্ছা এই স্থানটি পুনরায় উপবনে পরিণত হয়।" বিজয় তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং দেবরাজের আদেশে ঐ স্থানে একটি উপবন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। প্রজাগণ বিজয়ের অনুমতি ক্রমে তাঁহার কাশিরাজ্যে গিয়া বাস করিতে লাগিল। খাণ্ডবী পুরী ধ্বংস করিয়া এই বন নির্ম্মাণ করা হয়, তজ্জন্য ইহা খাণ্ডব বন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

কালিকাপুরাণের বৃত্তান্ত ও ললিতবিস্তরের বৌদ্ধরাজ সুদর্শনের উপাখ্যান পাঠে মনে হয়, পুরাণোক্ত সুদর্শন ও ললিতবিস্তরে বর্ণিত সুদর্শন অভিন্ন ব্যক্তি। প্রকৃত পক্ষে বৈদিক কালে এই স্থান ঘোর অরণ্যময় ছিল। তাহার পর, নাগজাতিকর্তৃক অধিকৃত হয়। মহাভারতের সময়ে অর্জ্জুনের সাহায্যে যখন এই বন দগ্ধ হয়, তখনও দগ্ধাবশিষ্ট অশ্বসেন প্রভৃতি নাগগণ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ

হইয়াছিল। হয়ত তাহাদেরই বংশে পরাক্রান্ত রাজা সুদর্শনের জন্ম হইয়াছিল। সুদর্শন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। কারণ, ললিতবিস্তরে রাজা সুদর্শন বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগ-প্রযুক্তই হউক অথবা অন্যবিধ কারণেই হউক প্রধান মন্ত্রী বিজয় প্রজাবর্গকে উত্তেজিত করিয়া তাহাদের সাহায্যে খাণ্ডবী পুরীর অধীশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করেন এবং প্রজাগণকে লইয়া গিয়া স্বকীয় কাশিরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুরাকালে মধ্য-ভারতবর্ষ হইতে বহু লোক যে কাশি-প্রদেশে গিয়া বাস করিয়াছিল তদ্বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। তাহার পর হইতেই জনশূন্য খাণ্ডবী পুরী খাণ্ডব বনে পরিণত হইয়াছে (১)।

এই খাণ্ডববনের বিস্তৃতি দেখিয়া মনে হয় মহাভারতের বর্ণনা নিতান্ত অলীক নহে। পঞ্চদশ দিনের ন্যূন সময়ে এই সুদূর ব্যাপী বিশাল অরণ্য দগ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা পূর্ব্বাহ্ণ দশটা হইতে অপরাহ্ণ তিনটা পর্য্যন্ত দ্রুতগামী বাষ্পশকটে অবিশ্রান্ত গমন করিয়া ঐ অরণ্যানীর দক্ষিণ প্রান্তে উপনীত হইলাম। রেলপথের উভয়-পার্শ্বস্থ ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষগুল্মপরিবৃত ভূভাগের কোথায় ও পর্ব্বতমালা কোথায় বা পার্ব্বত্যনির্ঝরিণী শুষ্ক বক্ষে শয়ানা, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ও পাষাণনির্ম্মিত রাজপথ সকল দেখা যাইতে লাগিল। এই মনুষ্য-সঞ্চার-রহিত নিবিড়তর অরণ্যানীমধ্যে মন্দির ও রাজপথ সকল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই সকল প্রদেশে যে সমৃদ্ধ মানববসতি ছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এই সকল ক্ষুদ্র মন্দিরও পাষাণময় রাজপথ তাহারই শেষ চিহ্ন। অতএব পৌরাণিক উপাখ্যান অতিরঞ্জিত কিংবা রূপকদ্বারা প্রচ্ছন্ন হইলেও একেবারে অমূলক নহে।

(১) কালিকাপুরাণে ও ললিতবিস্তর পাঠ করুন।

৫ই বৈশাখ অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় খাণ্ডোয়া ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম (১)। খাণ্ডোয়া নিমার্ জেলার হেড্‌কোয়াটার্। পূর্ব্বকালে এই প্রদেশ মাহিষ্মতী নগরীর হৈহয়-বংশীয় রাজাদের শাসনাধীন ছিল। সম্ভবতঃ মাহিষ্মতীর অধীশ্বরগণ শেষে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। একটি কিম্বদন্তী আছে;—'ব্রাহ্মণেরা হৈহয়-বংশীয় নরপতিগণকে পদচ্যুত করিয়া ঐ দেশে শিবপূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন'। কেহ কেহ বলেন,'মাহিষ্মতীর ভূমিপালগণ রাজ্যচ্যুত হইলে ঐ প্রদেশ আশানামক একজন গোপবংশীয় বীরের অধিকারে আইসে। উক্ত গোপবীরের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী অদ্যাপি আশীরগড় নামে খ্যাত হইয়া থাকে'। গোপরাজের পরই প্রমর-বংশীয় রাজপুতগণ দীর্ঘকাল এই দেশ শাসন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চোহান বংশীয়গণ দক্ষিণ নিমারের প্রভু ছিলেন। উত্তর নিমারে ভীল-রাজগণ রাজত্ব করিতেন। কিছুকাল পরে দিল্লীর মুসলমান্ সম্রাট্, প্রমররাজ ও ভীলরাজগণকে পরাজিত করিয়া নিমার্ প্রদেশ অধিকার করেন। এখনও নর্ম্মদা-বেষ্টিত মান্ধাতা নামক স্থানে এক ভীলরাজ বাস করেন। ঐ রাজা আপনাকে মান্ধাতার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

খাণ্ডোয়া সহরটি নিতান্ত আধুনিক নহে। অতি প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টলেমি ও আবুরিহান পর্য্যন্ত এই নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই নগরে দুইটি প্রধান রাজপথ আছে। মধ্য স্থলে চৌরাস্তা। ঐ সকল রাজপথের উভয় পার্শ্বে সারি সারি অট্টালিকা। নগরে খোলার ঘরও যথেষ্ট। ঐ সকল ঘর দ্বিতল ত্রিতল এবং সুন্দর

(১) এখানকার বাঙ্গালী প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় M.A. B.L. মহাশয় কৃতবিদ্যও স্বদেশহিতৈষী। পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহারই বাসায় সাদরে গৃহীত হইলাম।

চিত্রিত। ইউরোপীয়দিগের বাঙ্গলোগুলি ও বিলক্ষণ নয়নপ্রীতিকর। নাগপুরের চিফ্ কমিসনার্ মধ্যভারতের শাসনকর্ত্তা। তাঁহার অধীন একজন ডেপুটি কমিশনার্ নিমার্ জেলার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। খাণ্ডোয়া উক্ত ডেপুটি কমিশনারের বাসস্থান। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিচারালয় আছে।

৬ই বৈশাখ নগরের অগ্নিকোণে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে 'রামশর' নামক একটি প্রাচীন পবিত্র স্থান সন্দর্শন করিতে গেলাম। ঐ স্থানটি বিজন অরণ্যমধ্যে একটি কৃত্রিম নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। এ দেশে একটি গল্প প্রচলিত আছে ;—"রাম নির্ব্বাসিত হইয়া যখন সীতাও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্য অতিক্রম করিয়া পঞ্চবটী অভিমুখে গমন করেন। সেই সময় একদিন পথিমধ্যে সীতা পিপাসায় অধীর হইয়া পড়েন। লক্ষ্মণ বহু অনুসন্ধানেও পানীয় সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন না। অবশেষে রঘুপতি ভূতলে এক তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করেন। দেখিতে দেখিতে ভূমি ভেদ করিয়া স্বচ্ছ জল উত্থিত হয়। ঐ জলে জনকনন্দিনী তৃষ্ণা দূর করেন। তদবধি স্থানটি 'রামশর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।" একটি বালক ভক্তি-গদ্গদস্বরে রামশরতীর্থের এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বর্ণন করিল। শুনিয়া মনে হইল, রামের চরিত্রের এতই মাহাত্ম্য ও ভারতবর্ষের লোকের উহার প্রতি এতই শ্রদ্ধা যে কত কত যুগ যুগান্তর অতীত হইয়াছে তথাপি তাঁহার এই ক্ষুদ্র কার্য্যের স্মৃতি ও মানব-হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। যে স্থান হইতে জল উত্থিত হইয়াছিল, সেই স্থানে একটি কূপ বিদ্যমান। উহার চতুর্দ্দিক্ পাষাণ-মণ্ডিত। নিকটে কয়েকটি মন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরের কোনটিতে রাম সীতা লক্ষ্মণও হনূমানের পাষাণ-মূর্ত্তি, কোনটিতে বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি ও দুই একটিতে শিবলিঙ্গ বিরাজমান। কিছু দূরে একটি মুসলমানের মস্‌জিদও

রহিয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র নদীর পশ্চিমতীরে প্রান্তর-মধ্যে একটি দুর্গ দেখিলাম। ঐ দুর্গে বহুসংক্ষক ইংরাজ-সৈন্য বাস করে। রামশর দেখিয়া প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে মেঘ-গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। বারিপাতের পূর্ব্বেই আমরা বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

পরদিন (৭ই বৈশাখ) নগরের নৈঋত কোণে একটি সরোবর দেখিতে গেলাম। ঐ সরোবরটি সমচতুষ্কোণ, নাম পদ্মকুণ্ড। উহার চতুস্পার্শ্বে প্রাচীর আছে। প্রাচীরের গাত্রে কুলুঙ্গীতে ভৈরব এবং নন্দীর মূর্ত্তি বিরাজমান। কোন কোন কুলুঙ্গীর মধ্যে শিলালিপিতে ঐ মন্দির নির্ম্মাণের সময় উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পদ্মকুণ্ডের জলমধ্যস্থ ক্ষুদ্র মন্দিরের মেঝেতে সাধারণের অবোধ্য নানাবিধ অক্ষর খোদিত দেখা যায়। পদ্মকুণ্ডের পার্শ্বেই একটি মন্দিরে পদ্মেশ্বর শিবও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি আছেন। ঐ স্থানের নৈঋত কোণে কিছু দূরে ভৈরবতাল নামক সরোবর। নগরের বায়ুকোণে কুলালকুণ্ড ও তাহার পার্শ্বেই তুলজাভবানীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল জলাশয় ও মন্দির ব্যতীত রেলপথের পার্শ্বেই ভীমকুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড নামক দুইটি প্রাচীন জলাশয় বিদ্যমান। খাণ্ডোয়ার চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বত-মালা। নগরটি পর্ব্বতের উপত্যকায় অবস্থিত। এই স্থানের স্বাস্থ্য অতি উত্তম। এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা তেমন শিক্ষিত নহে।" চারি পাঁচ ঘর বাঙ্গালী বিষয় কার্য্য উপলক্ষে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই শিক্ষিত ও সম্মানিত। খাণ্ডোয়ার প্রাচীন অধিবাসীরা ইংরাজ ও বাঙ্গালীকে তুল্যরূপ সম্মান করে। একটি বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার্ ইউরোপীয় মহিলার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও সস্ত্রীক এখানে বাস করেন।

৯ই বৈশাখ অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় অবন্তি অভিমুখে যাইবার

জন্য ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। খাণ্ডোয়া একটি জংসন, এখান হইতে জি, আই, পি, রেলপথের একটি শাখা জব্বলপুরে গিয়া ই, আই রেলপথের সহিত মিলিয়াছে। আমরা ভোঁশোয়াল হইতে যে রেলপথ দিয়া খাণ্ডোয়া আসিয়াছিলাম, সেই রেলপথটি এখান হইতে বম্বে গিয়াছে। জি, আই, পি রেলপথের অপর একটি শাখা এখান হইতে ইন্দোর হইয়া ফতেয়াবাদ জংসনে উপনীত হইয়াছে। আমরা ঐ রেলপথ অবলম্বন করিয়া চলিলাম। ষ্টেসনের সীমা অতিক্রম করিলেই বাষ্পাশকট ক্রমে মন্থরগতি পরিহার পূর্ব্বক দ্রুত ধাবিত হইতে লাগিল। যত ক্ষণ সূর্য্যালোক ছিল, নয়ন ভরিয়া বিন্ধ্য-পর্ব্বতমালার গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া লইলাম। এই পর্ব্বতমালা বঙ্গদেশের রাজমহল নগরের নিকটবর্ত্তি ভাগীরথীতীর হইতে গুজরাটের স্তম্ভতীর্থ (কাম্বে উপসাগর) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বেদ রামায়ণ মহাভারত ও নানাপুরাণে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি বাল্মীকি বিন্ধ্যকে সহস্রশীর্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এই পর্ব্বতের অসংখ্য শৃঙ্গ দেখিয়া তাঁহার বর্ণনার যথার্থ তাৎপর্য্য অনুভব করা যায়। উক্ত মহাশৈলই আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দক্ষিণাপথকে বিভক্ত করিয়া সীমাস্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কথিত আছে;—এক সময়ে বিন্ধ্যশৈল স্বীয় শৃঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সূর্য্যের গমনপথ রোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মিত্রাবরুণের পুত্র মহর্ষি মান যখন আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দক্ষিণাপথে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিন্ধ্য তাঁহাকে প্রণিপাত করে। ঋষি আশীর্ব্বাদ কালে বলেন, "বিন্ধ্য! আমি যত দিন দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাগমন না করি, তত দিন তুমি এই রূপে নতশিরে অবস্থান কর।" বিন্ধ্য ঋষির বাক্যে সম্মত হইল। মানঋষি দক্ষিণাপথে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। তাঁহার আর প্রত্যাগমন করা ঘটিল না,

বিন্ধ্যপর্ব্বত ও মস্তক উন্নত করিয়া সূর্য্যের পথ রোধ করিতে পারিল না। সেই সময় অগ (বিন্ধ্য পর্ব্বতকে) স্ত্যান (হতদর্প) করিয়া মহর্ষি মান 'অগস্ত্য' আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। সেই সুদূর অতীত কালে আর্য্যাবর্ত্তের একজন মহাপ্রভাব ঋষির সর্ব্বপ্রথম দুর্গম বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনার্য্য-সঙ্কুল দক্ষিণাপথ-যাত্রার বিবরণ পুরাণে এইরূপ রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। বিন্ধ্য পর্ব্বতের প্রথম পরাজয় মহর্ষি অগস্ত্য হইতে, দ্বিতীয় পরাজয় ইংরাজ-জাতি হইতে ঘটিয়াছে। রেলকোম্পানি এখন লৌহপথ বিস্তার করিয়া গর্ব্বোন্নত বিন্ধ্যগিরিকে নাগপাশে বন্ধন করিয়াছেন। সূর্য্যের পথ রোধ করা দূরে থাকুক, এখন বিন্ধ্য মানুষের অত্যাচার দমনেও সমর্থ নহে।

সন্ধ্যা অতীত হইল, ক্রমশঃ কৃষ্ণপক্ষীয় নিশার ঘোর তিমিরে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, বৃক্ষ-গুল্ম-পরিবৃত শৈলমালার গাত্রে শুধু ঘনীভূত অন্ধকার-রাশি। মধ্যে মধ্যে গুল্মস্তূপের উপরি ভাগে ক্ষীণরশ্মি খদ্যোতমালা পুঞ্জীকৃত হইয়া আছে। ক্ষণকাল পরে আমরা নর্ম্মদাসেতুর নিকট উপনীত হইলাম। নর্ম্মদা সেই বৈদিক কালের পুণ্যনদী। বেদ ও পুরাণের মতে এই নদী অমরকণ্টক পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। আবার কোন পৌরাণিক লিখিয়াছেন "নর্ম্মদা বিন্ধ্য গিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া তমসা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে"। পূর্ব্বোক্ত মতটিই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। এখনও রেবা-রাজ্যের অন্তর্গত অমরকণ্টক পর্ব্বতে নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থান দৃষ্ট হয়। একটি ক্ষুদ্র উৎস হইতে এই নদীর উদ্ভব হইয়াছে (১) ঐ উৎস (জলাশয়টি) রক্ষা করিবার জন্য

(১) কলিঙ্গদেশে পশ্চার্দ্ধে পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে।
পুণ্যাচ ত্রিষু লোকেষু রমণীয়া মনোরমা॥ (মৎস্যপুরাণ)

তত্রত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে কয়েকটি তীর্থপুরোহিত বাস করিতেন। পূর্ব্বে নিতান্ত ক্লেশসহিষ্ণু পরিব্রাজক কিংবা তীর্থযাত্রীরাই কেবল অমর-কণ্টক তীর্থ সন্দর্শনে যাইতেন, এখন পথ অনেক পরিমাণে সুগম হইয়াছে, সুতরাং ঐ স্থান আর এখন সাধারণের অগম্য নহে। এই অমরকণ্টক পর্ব্বতই মেঘদূতে কালিদাস কর্ত্তৃক বর্ণিত আম্রকূট গিরি (১)। কথিত আছে;—প্রথম রাজা পুরূরবার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া মহাদেব নর্ম্মদাকে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার জন্য আজ্ঞা করেন। তাহাতেই ইনি মর্ত্ত্যধামে আগমন করেন। চন্দ্রবংশীয় রাজা হিরণ্য-রেতার চেষ্টায় নর্ম্মদা দ্বিতীয় বার ভূতলে অবতীর্ণ হন। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা পুরুকুৎসের প্রযত্নে নর্ম্মদা তৃতীয় বার পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন (২)। সম্ভবতঃ ঐ সকল নরপতিই দুর্গম অরণ্যানী ছেদন করিয়া নর্ম্মদার উৎপত্তি-ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করেন, তজ্জন্যই বোধ হয় পৌরাণিকেরা তাঁহাদের তপস্যায় এই নদীর মর্ত্ত্যে আগমনের বৃত্তান্ত কল্পনা করিয়া থাকিবেন। মধ্যভারতের অধিবাসীরা নর্ম্মদার প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্। যখন বাষ্পশকট নর্ম্মদা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে লাগিল, তখন তাহারা অপরাধীর ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিল। আমরা ও অচিরোদিত চন্দ্রালোকে নর্ম্মদার স্ফটিকনিভ জলপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করিয়া প্রণিপাত করিলাম।

গভীর রজনীতে বাষ্পশকট মাউ ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। মাউ সহর সাধারণ লোকের নিকট "মাউ ছাউনী" নামে অভিহিত।

---

(১) ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্দ্ধা।
বক্ষ্যাস্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ॥ (মেঘদূত)

(২) স্কন্দপুরাণ—রেবাখণ্ড পাঠ করুন।

ষ্টেসনের অনতিদূরে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের একটি সৈন্যাবাস আছে। ঐ স্থানে বহু সংখ্যক ইংরেজ ও দেশীয় সৈন্য বাস করে। ষ্টেশনে বহু যাত্রীর সমাগম দেখিলাম। উহার ষোল ক্রোশ দূরে সুপ্রসিদ্ধ ধারা-নগরী বিদ্যমান। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন এক সময় ধারানগরী কিরূপ সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে বিখ্যাত ভোজবংশীয় নৃপতিগণ ধারানগরীতে রাজত্ব করিতেছেন। উক্ত বংশের ভূপাল-গণের কীর্ত্তিকলাপ ভারতবিখ্যাত। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন-সভার আদর্শে ধারেশ্বরগণ কর্ত্তৃকও একটি নবরত্ন-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই রাজবংশ সুদীর্ঘকাল ধারাবাহিকরূপে ধাররাজ্য ভোগ করিয়া আসিতেছেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ধারা নগরীস্থিত নবরত্নসভার অন্যতম সদস্য ভোজরাজীয় কালিদাস 'দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা' নামক সংস্কৃতকাব্য রচনা করেন। এখনও ধারেশ্বরগণের অধস্তন বংশীয়েরা মাণ্ডুতে ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের মিত্ররাজ রূপে অপেক্ষাকৃত অল্লায়তন রাজ্য শাসন করিতেছেন।

রজনীর শেষাংশে "মাউ" অতিক্রম করিয়া বাষ্প শকট ইন্দোরে পৌঁছিল। ইন্দোর হোলকর-রাজবংশের রাজধানী। ইহাও পর্য্যটকের (১) একটি দ্রষ্টব্য স্থান। কিন্তু তখন আমার উজ্জয়িনী-দর্শনের বাসনা এত বলবতী যে, উহা না দেখিয়া অন্যত্র অবতরণ করা কোন প্রকারেই সঙ্গত মনে হইল না। বাষ্পশকট ইন্দোর ত্যাগ

(১) 'পর্য্যটক'---শব্দটি অনেকে অশুদ্ধ মনে করেন, কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করিলে উহাতে কোন ব্যাকরণ-দোষ দেখা যায় না। পরি পূর্ব্বক অট্ ধাতুর উত্তর পচাদিত্বাৎ কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয় করিয়া 'পর্য্যট' এই আকার হয়। তাহার উত্তর স্বার্থে কন্ প্রত্যয় করিয়া 'পর্য্যটক' পদ সিদ্ধ হইতে পারে। পরি পূর্ব্ব অট্ ধাতু দেখিলেই যে উহার স্কন্ধে ণক প্রত্যয় চাপাইতে হইবে এমন ত কোন বিধান নাই।

করিলণ• রাত্রি প্রায় চারি ঘটিকার সময় আমরা ফতেয়াবাদ জংসনে গিয়া পৌঁছিলাম। ফতেয়াবাদ একটি বিশাল প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত। এখানেই যোধপুরের রাঠোর-রাজ যশোবন্ত সিংহের সহিত দিল্লীর সম্রাট্ আরঙ্গজেবের ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল। ফতেয়াবাদ জংসন হইতে জি, আই, পি, রেল পথের একটি শাখা রতলাম অভিমুখে গিয়াছে। অপর শাখা উজ্জয়িনী ভূপাল ও ঝাঁসি হইয়া কানপুরে ই, আই, রেলপথের সহিত গিয়া মিলিত হইয়াছে। উজ্জয়িনীগামী যাত্রীদিগের এখানে গাড়ী বদল করিতে হয়। আমরা অবিলম্বে উজ্জয়িনীর•গাড়ীতে উঠিলাম। যখন গাড়ী ছাড়িল তখন নিশা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ঐ শাখা রেলপথের গাড়ীর বেগ অত্যন্ত অধিক। সূর্য্যোদয়কালে আমরা উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসন হইতে সিপ্রাতীর প্রায় দেড় ক্রোশ পথ। একখানি একায় চড়িয়া বন্ধুর পথ অতিক্রম পুর্ব্বক ১০ই বৈশাখ সোমবার সাতটার সময় সিপ্রাতীরে পৌঁছিলাম।

একে পুণ্যমাস তাহাতে সোমবার, সুতরাং ঐ দিন যাত্রি-সমাগম যথেষ্ট হইয়াছিল। অন্যান্য তীর্থের ন্যায় এখানেও পাণ্ডাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যে পাণ্ডা ফতেয়াবাদ হইতে আমার সঙ্গ লইয়াছিল, আমি তাহাকেই দর্শক স্থির করিলাম। পাণ্ডাজী আমাকে বহুদিনের পরিত্যক্ত এক প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ীতে উপস্থিত করিল। উহার নিম্নতল নিতান্ত অন্ধকারময়। দ্বিতলে শ্রেণীবদ্ধ উন্মুক্ত বাতায়নগুলি যেন সিপ্রার দিকে মুখব্যাদান করিয়া আছে। ঐ পুরাতন বাটীতে মূষিক ও চর্ম্মচটিকা ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী কখনও বাস করিয়াছিল কিনা তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। অল্প ভাড়ার প্রলোভন সত্বেও আমি ঐ বাটীতে থাকিতে সম্মত হইলাম না। তাহার পর, আমরা রামঘাটের ঠিক উপরে একটি শেঠের গৃহে উপস্থিত হইলাম।

শেঠের নূতন দ্বিতল সুন্দর খোলার বাড়ী। ঐ বাড়ীটি ঘাটে যাইবার রাস্তার বাম পার্শ্বে অবস্থিত। রাজপুতনার কোন বিধবা রাণী তীর্থ দর্শনে আসিয়া তাঁহার লোক লস্কর সহ ঐ বাড়ীর উপর তলায় বাস করিতেছেন। বৃদ্ধ শেঠ করযোড়ে বলিল—"বাবুজী আপাততঃ আপনি এই নীচের একটি ঘরে থাকুন, রাণীজী আজ সন্ধ্যার গাড়ীত চলিয়া যাইবেন, তাহার পর আপনি উপরের একটি ঘরে বাসা লইবেন। শেঠের বাড়ীটি যেরূপ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন, তাহাতে নীচের ঘরে থাকায় আমার কোনই আপত্তি হইল না। উজ্জয়িনীতে গিয়া আমার মনের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। আশৈশব যে কালিদাস ও বরাহমিহিরের গ্রন্থ পাঠে বিমুগ্ধ আছি, আজ সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহাদেরই লীলাভূমিতে উপস্থিত হইয়াছি—ইহা ভাবিতেও আমার হৃদয়ে কত আনন্দ হইতে লাগিল। এই বার আমি কিছু ক্ষণের জন্য ভ্রমণবৃত্তান্ত রাখিয়া পুরাতত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব, পাঠকগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা অনুকম্পা করিয়া বর্ণনীয় বিষয়ে মনোযোগ করুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমি এখন যে স্থানে অবস্থিত এই দেশ বৈদিককালে অবন্তি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। অবন্তি-দেশে প্রবাহিত বলিয়া শিপ্রানদীর অপর নাম অবন্তী। এই অবন্তীনদীর তীরস্থ তীর্থক্ষেত্র ও অবন্তীতীর্থ নামে খ্যাত। অবন্তী (অবন্তিকা) ভারতের প্রধান সাতটি মহাতীর্থের অন্যতম (১)। আর্য্যগণের মধ্য-ভারতবর্ষে বসতিবিস্তারের

(১) "অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ"॥

পর হইতে সুদীর্ঘকাল অবন্তীতীর্থ ঋষিগণের প্রাত্যহিক বেদধ্বনিতে মুখরিত ছিল। মহর্ষি সান্দীপনি কাশী হইতে অবন্তীপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বৃষ্ণিবংশোদ্ভব বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই নিকট আসিয়া অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। (১) যখন মহাভারত রচিত হয়, তখনও এখানকার তীর্থসন্নিহিত নগরী অবন্তী নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। (২) তাহার পর, পৌরাণিককালে মালব নামধেয় এক ক্ষত্রিয়-জাতিকর্ত্তৃক অবন্তি দেশ অধিকৃত হয়। তাহাদের নামানুসারে এই দেশের নাম হয় মালব। উক্ত মালবজাতীয় ক্ষত্রিয়েরা অবন্তীর পার্শ্বে যে রাজধানী স্থাপন করে, তাহারই নাম উজ্জয়িনী। কোন্ নরপতি কর্ত্তৃক প্রথম উজ্জয়িনী নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণায় যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম বিবৃত হইল।

প্রাচীনকাল হইতে অনেক রাজচক্রবর্ত্তী উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সিংহল দেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশে লিখিত আছে ;—"খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ২৬৩ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের পুত্র রাজা বিন্দুসার যখন পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে অবস্থানপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করেন, সেই সময় তাঁহার পুত্র অশোক পিতার প্রতিনিধিরূপে উজ্জয়িনী শাসন করিতেন। উহার প্রায় শত বৎসর পরে এক বৌদ্ধযতি উজ্জয়িনীর দক্ষিণগিরি মঠ হইতে চল্লিশ হাজার শিষ্য সহ সিংহলদ্বীপে গমন করেন।" পাশ্চাত্য দেশীয়

(১) "ততঃ সান্দীপনিং কাশ্যমবন্তীপুরবাসিনম্।
অস্ত্রার্থং জগ্মতুর্বীরৌ বলরামজনার্দ্দনৌ"॥

(২) "কুন্তয়োঽবন্তয়শ্চৈব তথৈবাপরকুন্তয়ঃ"।

একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক (১) লিখিয়াছেন ;—"চষ্টন্ নামা এক নরপতি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মালব দেশ শাসন করেন। উজ্জয়িনী তাঁহার রাজধানী ছিল। ঐ চষ্টন্ নৃপতি শকজাতীয় ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত। রাজন্যসমাজে তাঁহার অসাধারণ খ্যাতি ছিল। তিনি 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।" উজ্জয়িনী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে চষ্টন্ নৃপতির নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কাহারও মতে এই চষ্টন্ নরপতি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে উজ্জয়িনীতে অবস্থান করিয়া মালব ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশ সকল শাসন করিতেন। কারণ, পুরাতত্ত্ববিৎগণ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন,—'চষ্টনের অধস্তন বংশীয়দের দ্বারাও কিছু কাল মালব রাজ্য শাসিত হইয়াছিল'। মহাক্ষত্রপ চষ্টন্‌বংশীয় নৃপতিদের রাজ্যাবসানে উজ্জয়িনীতে সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অভ্যুদয় হয়। এই বিক্রমাদিত্যের নাম না শুনিয়াছেন ভারতবর্ষে এরূপ লোক অতি বিরল। কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট বিক্রমাদিত্য সুররাজের ন্যায় সমাদৃত। তাঁহার 'আবির্ভাবকাল' 'বংশ'ও 'নবরত্নসভা' সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের অনেক মতভেদ দেখা যায়।

প্রাচীন পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, ভারতবর্ষে সংবৎ নামক যে একটি অব্দ গণনা প্রচলিত আছে, উহা বিক্রমাদিত্যের জন্ম সময় হইতে গণিত। সংবৎ অনুযায়ী বৎসর গণনা মাঘ মাস হইতে আরম্ভ হয়। এখন ১৯৬৭ সংবৎ চলিতেছে। অতএব বর্ত্তমান সময় হইতে ১৯৬৭ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য জন্ম গ্রহণ করেন। আবার, কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদের মতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মহাকবি কালিদাস ঐ

(১). টলেমি।

সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। বিক্রমাদিত্য পরমার নামক ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত। পরমার বংশের উৎপত্তি-বিবরণ পুরাণে এই রূপ লিখিত হইয়াছে। "অশোক প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণেরা অর্ব্বুদ পর্ব্বতে (১) এক ব্রহ্মহোমের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞ কুণ্ড হইতে চারি জাতীয় ক্ষত্রিয়বংশের উৎপত্তি হয়। যথা ;—পরমার চপহানি শুক্ল এবং পরিহার। পরমারগণ অবন্তিদেশের উজ্জয়িনীতে, পরিহারগণ চিত্রকূটের কলিঞ্জরনগরে, চপহানি (চোহান) গণ রাজপুত্রাখ্যদেশের অজমেঢ়পুরে এবং শুক্লগণ আনর্ত্তমণ্ডলের দ্বারকা-নগরীতে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক ভারতবর্ষ শাসন করেন। পরমারগণ সামবেদী, চপহানিগণ যজুর্ব্বেদী, শুক্লগণ ত্রিবেদী এবং পরিহারগণ অথর্ব্ববেদী (২)। ঐ সকল রাজন্যগণের সাহায্যে ভারতবর্ষে লুপ্তপ্রায় বৈদিকধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় (৩)।

---

(১) অর্ব্বুদপর্ব্বত -আবুপাহার। উহা অতিপ্রাচীন স্থান। এখনও অনেক পুরাতন মঠ ও দেবমন্দির ঐ স্থানে বিদ্যমান আছে। রাজপুতানার পলিটিকাল্-রেসিডেন্ট এখন আবু পাহাড়ে বাস করেন.

(২) (ভবিষ্যপুরাণের প্রতিসর্গপর্ব্বের কলিযুগীয় ইতিহাস বর্ণন প্রসঙ্গ পাঠ করুন)

(৩) পুরাতত্ত্ববিৎগণ বলেন ;—বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের সাম্রাজ্য-কালে বৈদিক ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ নিরুপায় হইয়া তদানীন্তন অভ্যুদয়শীল কয়েক জন বৌদ্ধশকভূপতিকে বৈদিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদিগকে বৈদিকধর্ম্মের বিরোধী-দিগের প্রতি অভিযান করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করেন। তাঁহারা বহুসংখ্যক বৌদ্ধ শকনরপতিকে নিহত করিয়া বৌদ্ধসম্প্রদায়কে দুর্ব্বল ও বৈদিকসম্প্রদায়কে প্রবল করিয়া তুলেন। এই কার্য্যের জন্য শেষে তাঁহাদের কেহ সূর্য্যবংশসম্ভূত কেহ চন্দ্রবংশ-সম্ভূত কেহ যাদববংশসম্ভূত কেহ অগ্নিকুলসম্ভূত বলিয়া ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক স্তুত হন। বর্ত্তমান রাজপুতানার রাজন্যবর্গ তাঁহাদেরই অধস্তন বংশধর। ঐরূপ বৈদিকধর্ম্মে দীক্ষাই ভবিষ্যপুরাণে 'ব্রহ্মহোম' নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে সকল শক-রাজবংশ বৈদিকধর্ম্মে

পূর্ব্বোক্ত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে উজ্জয়িনীর অধিবাসী পরমারবংশে গন্ধর্ব্বসেন নামক এক রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ রাজার পুত্র বিক্রমাদিত্য পঞ্চমবর্ষবয়সে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করেন। উহার ফলে তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য স্বীয় বিক্রম-প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অসংখ্য শকভূপতিকে নিহত করেন"। তজ্জন্য তাঁহার আর একটি নাম "শকারি"। নাসিক হইতে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে বিক্রমাদিত্যের শকারি বিশেষণ দৃষ্ট হয়। বিক্রমাদিত্য অতিশয় গুণগ্রাহী রাজা ছিলেন। ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের সুধীগণকর্ত্তৃক এই কৃতবিদ্য নরপতির সভা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বয়স্য ছিলেন। তাঁহার আদেশেই উজ্জয়িনীর রাজকীয় নাট্যশালায় জগৎপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক অভিনীত হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের একটি ধর্ম্মসভা (বিদ্বৎসমিতি ছিল। উহাই শেষে নবরত্ন-সভা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ বিদ্বান্ ব্যক্তি উক্ত সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তন্মধ্যে ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির এবং বররুচিই সমধিক প্রসিদ্ধ।(১) বিক্রমাদিত্য অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন নরপতি ছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অসংখ্য কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তিনি নাকি সাধনাবলে এক বেতালকে (সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভূত-যোনিকে) প্রাপ্ত

দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের শক নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত ক্ষত্ররাজগণের অধস্তন পুরুষ হইয়াছেন। আর বৌদ্ধশকভূপতিগণের শক নাম বিলুপ্ত হয় নাই।

(১) ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

হইয়াছিলেন। তাহারই প্রভাবে তাঁহার সমস্ত দুরূহ কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইত। বিক্রমাদিত্য যে সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, উহার বত্রিশটি পায়ায় বত্রিশটি গন্ধর্ব্বকুমারী বাস করিত। তাহারা দিব্য-শক্তিশালিনী। লোকে তাহাদিগকে দেখিতে পাইত না। এই রূপ বহু জনশ্রুতি, তাঁহার পরবর্ত্তী সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত ভারতে যে সকল নরপতি শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে বিক্রমাদিত্য যশস্বী এবং বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন (১)।

নবরত্নসভা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সর্ব্বপ্রধান গৌরব-স্থল ছিল। উহাই ভারতের তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয় (University)। প্রাচীন-কালে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় এই নাম ছিল না বটে কিন্তু উহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের অভাব ছিল না। যে সময়ে ঋষিগণ পুণ্যনদীর তীরে অথবা নির্ঝর-সন্নিহিত শৈলনিতম্বে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বিদ্যার্থীদিগকে বেদশিক্ষা দিতেন, তখনও একস্থানে সমবেত হইয়া তাঁহারা লোক শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা করিতেন, উহাই তখনকার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। যেমন আর্য্যাবর্ত্তের নৈমিষারণ্য। তাহার পর, বর্ত্তমান সময় হইতে তিন সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে পঞ্চনদ প্রদেশের তক্ষশিলা নগরীতে এক

(১) পূর্ণে দ্বেচ সহস্রান্তে সূতো বচনমব্রবীৎ। সপ্তত্রিংশশতে বর্ষে দশাব্দে চাধিকে কলৌ। প্রমরো নাম ভূপেন কৃতং রাজ্যঞ্চ ষট্ সমাঃ ॥ * * *
তস্মাদ্ গন্ধর্ব্বসেনশ্চ পঞ্চাশদব্দভূপদঃ। কৃত্বা চ স্বসুতং শঙ্খমভিষিচ্য বনং গতঃ ॥
দেবাঙ্গনা বীরমতী শক্রেণ প্রেষিতা তদা। গন্ধর্ব্বসেনং সংপ্রাপ্য পুত্ররত্নমজীজনৎ ॥
সুতস্য জন্মকালেতু নভসঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ। পেতুদু‍র্ন্দুভয়ো নেদুর্বান্তি বাতাঃ সুখপ্রদাঃ ॥
* * পূর্ণে ত্রিংশচ্ছতে বর্ষে কলৌ প্রাপ্তে ভয়ঙ্করে। শকানাঞ্চ বিনাশার্থ মার্য্যধর্ম্ম-বিবৃদ্ধয়ে ॥ জাতঃ শিবাজ্ঞয়া সোঽপি কৈলাসাদ্ গুহ্যকালয়াৎ। বিক্রমাদিত্য-নামানং পিতা কৃত্বা মুমোদ হ ॥

(ভবিষ্য পুরাণ প্রতিসর্গপর্ব্ব কলিযুগীয় রবিশশিবংশবর্ণন পাঠ করুন।)

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা সম্পূর্ণরূপে না হউক, কতকটা বর্ত্তমান প্রণালীর অনুরূপ ছিল। মহর্ষি আত্রেয় প্রভৃতি বিপশ্চিদ্বর্গ উহার অধ্যাপক ছিলেন। রাজকুমারগণ এবং ধনিসন্তানেরা রীতিমত বেতন প্রদান পূর্ব্বক ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্যকালে মগধ প্রদেশে এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়; উহার নাম ছিল 'নরেন্দ্রবিহার'। ঐ নরেন্দ্রবিহারই পালিভাষায় আসিয়া 'নালন্দবিহার' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। নালন্দবিহারে শীলভদ্র প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধ অধ্যাপকবর্গ নানাশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতেন। উহার খ্যাতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। উজ্জয়িনীর নবরত্নসভা ভারতের চতুর্থ বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্ত্তি-কথা জগদ্বিখ্যাত। ইহার নয়জন প্রধান সদস্যের বিরচিত গ্রন্থরাজি এখনও অত্যুজ্জ্বল রত্নের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞান-ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু নবরত্নসভার সদস্যগণের লিখিত যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, উহাব সমুদয় এক শতাব্দীর রচিত নহে। তজ্জন্য কেহ কেহ বলেন;—"নবরত্নসভা যে ছিল তাহার প্রমাণ কি?" কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায়, পরমারবংশীয় যে ভূপতি প্রথম উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার নাম বিক্রমাদিত্য এবং ধন্বন্তরিপ্রমুখ নয়জন পণ্ডিত তাঁহারই নবরত্নসভার প্রধান সদস্য ছিলেন। পরে ঐ বংশীয় এবং অন্যান্য বংশীয় যে সকল রাজা উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করেন, তাঁহারাও বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক নবরত্নসভার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ সভার পরবর্ত্তী সদস্যগণকেও কালিদাসাদি নাম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ঐ সকল সদস্যের মধ্যে যাঁহারা গ্রন্থকার, তাঁহাদের কেহ প্রথম বিক্রমাদিত্যের সময়ে কেহ কেহ বা পরবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যগণের সময়ে আবির্ভূত হন। তজ্জন্য নবরত্নসভার সকল গ্রন্থকার এক শতাব্দীর নহেন। নিম্নে আমরা নবরত্নসভার সদস্যগণের

সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম"। বলা বাহুল্য নবরত্নসভার কোন সদস্যেরই ধারাবাহিক জীবনবৃত্তান্ত নাই। তবে উক্ত সদস্যগণের গ্রন্থোক্ত বাক্য, শিলালিপি, পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণের মত এবং কিংবদন্তীই বক্ষ্যমাণ জীবনবৃত্ত সমূহের উপাদান।

(১) মহাকবি কালিদাস নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। এই কবি প্রথম বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক, সুতরাং খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে কিংবা খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। ভারতবর্ষের নানাদেশের লোকে আপন আপন প্রদেশে কালিদাসের জন্মভূমি বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন কিন্তু আমরা বহু অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইতে পারিয়াছি—এই মহাকবি মিথিলা প্রদেশের বাঙ্মতী নদীর তীরবর্ত্তী উচ্চৈট্ নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে কোন কৃষিজীবী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈশবে ঐ ব্রাহ্মণ-বালকের জ্ঞানার্জ্জনের কোনই সুযোগ ঘটে নাই। অসাধারণ সাহস ও প্রতিভা লইয়া প্রত্যহ প্রান্তরে গো মহিষ চারণেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। যিনি ভবিষ্যতে সুধানিস্যন্দিনী কবিতার ঝঙ্কারে জগৎ বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন, যাঁহার গৌরবে ভারতভূমি কবিপ্রসূতি আখ্যা লাভ করিয়াছে, তাঁহার জীবনের প্রথম ষোড়শবর্ষ কেবল নিরক্ষর পল্লীবালকের সাহচর্য্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল। সহসা একদিন তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল। সমবেত পল্লীবাসীরা যুবকগণের সাহস-পরীক্ষার জন্য পণ রাখিল 'যে যুবা নিশীথকালে একাকী শ্মশানে কালিকা-মন্দিরে গমন করিতে পারিবে তাহাকে উদর পূর্ণ করিয়া ভোজ্য দ্রব্য দেওয়া হইবে'। কেহই ঐ প্রস্তাব শুনিয়া উত্তর করিল না। এক প্রান্ত হইতে এক কদাকার নবীন যুবা অগ্রসর হইয়া বলিল "আমি যাইব"। সকলে যুবকের মূর্খতার কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইল কিন্তু যুবক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অটল স্থির। ভয় প্রদর্শন করিয়াও কেহ তাহাকে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট করিতে

পারিলনা। নির্দ্দিষ্ট দিবসের অপরাহ্ণে সমবেত পল্লীবাসিগণ এক ক্রোশ দূরস্থ জনশূন্য শ্মশানে কালিকার মন্দিরে যুবকের নিমিত্ত চিপিটক দধি শর্করা রাখিয়া আসিল। নিশীথ কাল উপস্থিত। একে শ্রাবণমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথি, তাহার উপর ঘনঘটায় আকাশ আচ্ছন্ন। যুবা গ্রামবাসীদিগের আদেশ পাইবামাত্র সেই সূচিভেদ্য তিমির ভেদ করিয়া বেগে ধাবিত হইল। সে মুহূর্ত্তমধ্যে নদীর তীরে অরণ্য-সন্নিহিত শ্মশানে উপস্থিত হইল। কি ভীষণ স্থান! যেন প্রেতপুরী। দিবসেও কেহ সেখানে যাইতে সাহস করে না। নিবিড় অন্ধকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মরাজি খদ্যোতমালা মস্তকে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যুবকের মনে হইল অসংখ্য পিশাচ পিশাচী যেন মুখব্যাদান করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইতেছে। যুবক কোন দিকে দৃক্পাত করিল না, সে সেই যুগ যুগান্তরের প্রতিষ্ঠিত অরণ্যমধ্যবর্ত্তি কালিকার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নিরুদ্বেগে ভোজ্য দ্রব্যগুলি আত্মসাৎ করিল। তাহার পর, গমনের নিদর্শন দধিহস্তে পাষাণময়ীর কপোলে চপেটাঘাতের চিহ্ন রাখিয়া প্রস্থানে উদ্যত হইল। শ্মশানবাসিনী যুবকের সাহস দেখিয়া বিস্মিত ও পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি প্রসন্নবদনে যুবাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—"বৎস তোমার সাহসে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।" যুবা বলিল—"দেবী আমি ত এমন কিছু করি নাই, যাহাতে আপনার নিকট বর প্রার্থনা করিতে পারি। তবে যদি দাসের প্রতি নিতান্তই করুণা হইয়া থাকে, তবে যাহাতে আমার এই মূর্খতা দূর হয় তাহাই করুন"। দেবী বলিলেন "বৎস! আমি তোমার প্রার্থিত প্রদান করিলাম। সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হও, আর তুমি যে কবি-প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহার গুণে তুমি জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ কর। সুধাংশুর সুধা, কুসুমগন্ধি মলয়সমীরণ, রসালমুকুলে অলির ঝঙ্কার, বসন্তের

কোকিল-কূজন এবং স্বর্গের অমৃত ও তোমার কবিতার মধুরতায় পরাজিত হউক।" কালিকার প্রসাদে যুবকের পুনর্জন্ম হইল, তাহার সমস্ত জড়তা অন্তর্হিত হইল। সে প্রফুল্লচিত্তে স্ফীতবক্ষে আসিয়া পল্লীবাসীদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। প্রভাতে আসিয়া লোকে দেখিল, সেই পশুপালক মূর্খ ব্রাহ্মণ-যুবা সরস্বতীর বরপুত্র হইয়াছে। তাহার মসীকৃষ্ণ দেহ হইতে যেন লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। প্রতিভার অরুণরাগে মুলমণ্ডলে যেন কেমন এক অনির্ব্বচনীয় শোভা লক্ষিত হইতেছে। যুবা যে শাস্ত্র পাঠ করে, তাহাতেই তাহার পূর্ণ অধিকার। পল্লীবাসীরা এই ঘটনায় বিস্ময়ে অভিভূত হইল। কালিকার প্রসাদে এই রূপ সৌভাগ্য ঘটিয়াছে বলিয়া লোকে সেই দিন হইতে ঐ যুবককে 'কালিদাস' নামে অভিহিত করিল (১)।

(১) কালিদাস সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, নিম্নে যথাক্রমে তাহার কয়েকটির স্থূল মর্ম্ম লিখিত হইল। ১। কোন রাজার বিদ্যোত্তমা নাম্নী এক বিদুষী কন্যা ছিল। ঐ রাজকুমারী পণ করিয়াছিলেন "যিনি শাস্ত্রীয় বিচারে তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি বরমাল্য অর্পণ করিবেন। রাজবালার সৌন্দর্য্য ও বিদ্যার খ্যাতিতে নানাদেশের রাজকুমারগণ আসিয়া তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন কিন্তু কেহই জয় লাভ করিতে পারিলেন না, সকলেই লজ্জা ও অপমানে মৃতপ্রায় হইয়া পলায়ন করিলেন। তাহার পর, পরাজিত রাজকুমারগণ একস্থানে সমবেত হইয়া বিদ্যাভিমানিনী রাজকুমারীর যাহাতে গর্ব্ব চূর্ণ হয় তাহার উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে দেখিলেন, এক কদাকার মূর্খ ব্রাহ্মণযুবা বৃক্ষের যে ডালে বসিয়াছে, তাহারই মূল চ্ছেদন করিতেছে। রাজপুত্রেরা ঐ যুবাকেই পণ্ডিত সাজাইয়া রাজসভায় উপস্থিত করিলেন এবং বলিলেন ইঁহার অপেক্ষা অধিক বিদ্বান্ পৃথিবীতে নাই। ইনি পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিকেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন না, সুতরাং অবজ্ঞাভরে কাহারও সহিত বাক্যব্যয় করেন না। আমরা বহু অনুনয় করিয়া ইঁহাকে আনয়ন করিয়াছি। রাজকুমারী প্রশ্ন করুন, ইনি অঙ্গুলি সঙ্কেতে উত্তর দিবেন। রাজকুমারী তাহাই করিলেন, মূর্খযুবা রাজকুমারদের শিক্ষা

কালিদাস এই রূপে দেবীর কৃপায় অলৌকিক প্রতিভা ও কবিত্ব লাভ করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত কাব্য পাঠে অবগত হওয়া যায়—কবিবর তালীবনশ্যাম বঙ্গোপসাগরের উপকণ্ঠ হইতে সুহ্ম বঙ্গ

অনুসারে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিতে লাগিল। বিদ্যোত্তমা ভ্রান্ত সংস্কারবশে ঘোর মূর্খকে মহাপণ্ডিত মনে করিয়া বরমাল্য অর্পণ করিলেন। তাহার পর, বিবাহান্তে বাসর ঘরে গিয়া দেখেন, পরাজিত রাজকুমারেরা তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন। রাজকুমারী উষ্ট্রের শব্দ শুনিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ জন্তু শব্দ করিতেছে?" মূর্খ ব্রাহ্মণ যুবা উত্তর করিল "উষ্ট"। ইহাতে রাজনন্দিনী হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। যুবা অপ্রতিভ হইয়া পুনরায় বলিল "উট্র"। তখন রাজকুমারী সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন পরাজিত নৃপকুমারদের চক্রান্তে তিনি ঘোর মূর্খের হস্তে পতিত হইয়াছেন। তাহার পর, তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন ;-

উষ্ট্রে লুম্পতি রং বা ষং বা তস্মৈ দত্তা নিবিড়নিতম্বা।
কিং ন করোতি স এব হি রুষ্টঃ কিং ন করোতি স এব হি তুষ্টঃ॥

—"যে ব্যক্তি 'উষ্ট্র' শব্দ উচ্চারণ করিতে গিয়া একবার 'র' একবার 'ষ' লুপ্ত করে, বিধাতা তাহারই করে আমাকে অর্পণ করিলেন। অতএব তিনি রুষ্ট হইয়া কি না করিতে পারেন এবং তুষ্ট হইয়াই বা কি না করিতে পারেন।" রাজনন্দিনী অত্যন্ত বিদুষী ও সুরুচিসম্পন্না, তিনি এরূপ কদাকার মূর্খ স্বামীর সাহচর্য্যে পদে পদে বিড়ম্বিত হওয়া অপেক্ষা স্বামি-দর্শনে বঞ্চিত থাকাই শ্রেয়স্কর মনে করিয়া ঐ মূর্খকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মূর্খ যুবা বড় আশা করিয়া রাজকন্যার প্রেম লাভ করিতে গিয়াছিল কিন্তু হায় একি! প্রেম ত দূরের কথা, রাজকুমারীর অবজ্ঞাসূচক বাক্যগুলি শেলের ন্যায় তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। সে বিভ্রান্ত-চিত্তে ভ্রমণ করিতে করিতে সরস্বতীকূপে পতিত হইল। ঐ পবিত্র কূপের জলে নিমগ্ন হওয়ায় তাহার সমস্ত জড়তা প্রক্ষালিত হইয়া গেল। সে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ এবং মহাকবি হইল। যুবা ঐ রাত্রিতেই পুনরায় কোন কৌশলে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারীর গৃহদ্বারে উপস্থিত। রাজকুমারী লজ্জায় ক্ষোভে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া আছেন। দ্বারে করাঘাত করায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে?" যুবা বলিল

উৎকল কলিঙ্গ পাণ্ড্য কেরল অপরান্ত পারস্য সিন্ধুতীর কাম্বোজ হিমবৎপ্রদেশ প্রাগ্‌জ্যোতিষ কামরূপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের সুদূর জনপদ সকল পরিভ্রমণ করিয়া তত্তৎ জনপদের আচার ব্যবহার ও সভ্যতার বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিনি সুহ্ম দেশের কলমধান্য জলপ্রায় বঙ্গদেশের নৌ যোদ্ধা, মহেন্দ্রপর্ব্বতের মদস্রাবী হস্তী, তাম্রপর্ণীনদী ও সমুদ্রের সঙ্গম-স্থলের মুক্তার আকর, চন্দনবহুল মলয়-পর্ব্বত, কেরল রমণীগণের কবরী-বন্ধন, পারস্যসুন্দরীদের মধুপানে আসক্তি, সিন্ধুতীরের দ্রাক্ষা-ক্ষেত্র ও কুঙ্কুমতরু, কম্বোজের দ্রুতগামী অশ্ব, হিমবৎ-প্রদেশবাসীদের নৃত্যগীত, কামরূপে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদ প্রভৃতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন। মধ্যভারতের আম্রকূট (অমরকণ্টক) পর্ব্বত বিন্ধ্যের পাদমূলে প্রবাহিতা নর্ম্মদা, দশার্ণ দেশের রাজধানী বিদিশা, বেত্রবতী গম্ভীরা-চর্ম্মন্বতী প্রভৃতি

"আমি তোমার স্বামী।" রাজকন্যা বলিলেন "আবার কেন?" ব্রাহ্মণ যুবা বলিল, "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌ বিশেষঃ।" হঠাৎ মূর্খস্বামীর মুখে ঐরূপ দেববাণী উচ্চারিত হইতে শুনিয়া রাজনন্দিনী বিস্মিত হইলেন। পুনরায় প্রতারিত হইবার ভয়ে বলিলেন,—"যদি তুমি অস্তি, কশ্চিৎ, বাক্‌, বিশেষঃ, এই চারিটি পদ প্রথমে যোজনা করিয়া চারিখানি কাব্য রচনা করিয়া আনিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারি।" কালিদাস তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তিনি অস্তি পদ অগ্রে যোজনা করিয়া কুমারসম্ভব, কশ্চিৎ পদ অগ্রে যোজনা করিয়া মেঘদূত, বাক্‌পদ অগ্রে যোজনা করিয়া রঘুবংশ এবং বিশেষ পদ অগ্রে যোজনা করিয়া ঋতুসংহার কাব্য রচনা করিয়া রাজনন্দিনীকে উপহার প্রদান করিলে রাজনন্দিনীও তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কালিদাস অত্যন্ত আস্তিক ছিলেন এবং ব্যাকরণশাস্ত্রের দিকে তাঁহার অতিশয় অভিনিবেশ ছিল। একদা তিনি কোন ব্রত উপলক্ষে মৌনব্রত অবলম্বন করেন। গৃহে থাকিলে নানা লোকের কথা বার্ত্তায় কর্ণপাত করিতে গিয়া পাছে

স্রোতস্বিনীনিচয়, দশপুরের পুরাঙ্গনাদিগের বিলাস বিভ্রম, কুরুক্ষেত্র-তীর্থ, পুণ্যতোয়া সরস্বতী, হরিদ্বারে প্রবাহিতা গঙ্গা, পবিত্র কনখল, হংসদ্বার ক্রৌঞ্চরন্ধ্র-প্রভৃতি কোন প্রসিদ্ধ পদার্থ বা স্থানই তাঁহার অপ্রত্যক্ষ ছিলনা। মহাকবির অসাধারণ সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি ছিল, তিনি যেখানেই পদার্পণ করিয়াছেন, সেখানকার কোন সুন্দর বস্তুই তাঁহার নয়নপথ অতিক্রম করিতে পারে নাই।

কালিদাস ভ্রমণ শেষ করিয়াই ভারতবর্ষের তদনীন্তন রাজধানী উজ্জয়িনীতে গমন করেন। সে সময়ে উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ এবং গুণগ্রাহী নরপতি ছিলেন। এই গুণপক্ষপাতী ভূপালের সহিত কালিদাসের সম্মিলন

মৌন ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় কোন বনের নিকটে বৃক্ষতলে বসিয়া আপন মনে মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। এক রাজা পাল্‌কী চড়িয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছেন, পূর্ব্বে অসভ্য বন্য লোক দেখিলেই তাহাদিগকে বেগার ধরা হইত, সুতরাং কদাকার কালিদাসকে দেখিয়াই রাজা পূর্ব্ববাহকদের সঙ্গে তাঁহার স্কন্ধে পাল্‌কী চাপাইয়া দিলেন। ব্রত-ভঙ্গ ভয়ে কালিদাস কোন কথা বলিতে পারিলেন না। সকল বাহকই হুঁহুঁ এইরূপ অব্যক্ত শব্দ করিয়া উৎসাহে ধাবিত হইতে লাগিল কিন্তু কালিদাস অপমানে মতপ্রায় হইয়া নীরবে চলিলেন। রাজা পণ্ডিত লোক, নূতন বাহকের কাতর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি বলিলেন;—"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।" অর্থাৎ হে নির্ব্বোধ! যদি তুমি স্কন্ধে পীড়া অনুভব করিয়া থাক, তবে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। কালিদাস দেখিলেন তখন তিথি উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখন মৌনভঙ্গ হইলেও প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হইবে না, সুতরাং তিনি বলিলেন;—"ন তথা বাধতে স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে"। অর্থাৎ বাধ্ এই আত্মনেপদী ধাতুর "বাধতি" এই রূপে পরস্মৈপদে প্রয়োগ করায় আমি যেরূপ পীড়া অনুভব করিয়াছি, এই পাল্কী বহনেও আমার সে রূপ পীড়া অনুভূত হয় নাই। রাজা বিস্মিত, শেষে কালিদাসের পরিচয় পাইয়া চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ঐ পাল্কীতে উপবেশন করাইয়া তাঁহাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দেন।

যেন মণিকাঞ্চন যোগের তুল্য হইয়াছিল। পরস্পর পরস্পরের গুণে মুগ্ধ হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এই মিলনের শেষ ফল বন্ধুতা। অকিঞ্চন কালিদাস কবিত্ব-গুণে সার্ব্বভৌম ভূপতির বয়স্যপদে বৃত হইয়া ভারতবর্ষের সমস্ত কবি এবং পণ্ডিতের লক্ষ্য স্থল হইয়াছিলেন। তখন বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভাই পাণ্ডিত্য-পরীক্ষার নিকষপাষাণ ছিল। সুতরাং যে দেশের যত বড় পণ্ডিতই আগমন করুন, সকলকেই কালিদাসের নিকটে আনত হইতে হইত। কিন্তু এক জন পণ্ডিত কেবল তাঁহার নিকট নম্রতা স্বীকার করেন নাই; তিনি আর কেহই নহেন, অসাধারণ দার্শনিক দিঙ্‌নাগাচার্য্য। দিঙ্‌নাগ বৌদ্ধপণ্ডিত, সুতরাং পবিত্রভাবের পক্ষপাতী (Puritan)। কালিদাসের অধিকাংশ আদিরস-প্রধান কবিতা তাঁহার ভাল লাগিত না। তজ্জন্য তিনি উহার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করিতেন। কালিদাস সে সমালোচনার তীব্রতা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তজ্জন্য মেঘদূতের একটি কবিতায় তাঁহার হৃদয়ের অসন্তোষ আপনা আপনিই প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে।

কালিদাস উজ্জয়িনীকে বড় ভাল বাসিতেন। উজ্জয়িনীর পৌরাঙ্গনারা বিদ্যুৎ-স্ফুরণে চকিত হইয়া সৌধের উপরিভাগ হইতে ঊর্দ্ধদিকে কেমন লোল নয়ন নিক্ষেপ করিত, সায়ংকালে তত্রত্য

কথিত আছে;—একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য একটি কবিতাংশ পূরণ করিবার নিমিত্ত নবরত্নসভার পণ্ডিতমণ্ডলীর হস্তে অর্পণ করেন। ঐ কবিতাংশ এই—"ক জপঃ ক তপঃ ক সমাধি-বিধিঃ"। (অর্থাৎ জপই বা কোথায় তপই বা কোথায় এবং যোগের অনুষ্ঠানই বা কোথায়?) বহু কবি বহু প্রকারে এই কবিতাংশ পূরণ করিলেন কিন্তু কোন কবিতাই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মনোমত হইল না। অবশেষে সকলের অনুরোধে কালিদাস ঐ কবিতাংশ পূরণ করেন। ঐ কবিতা এই;—

মহাকাল নামক মহাদেবের কি প্রকার সমারোহে আরাত্রিক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইত, ধনিক-ভবনে গৃহ-ময়ূরেরা মেঘসন্দর্শনে কেমন মধুর নৃত্য করিত, পুষ্পিত-তরুরাজি-শোভিত হর্ম্ম্যমালার সোপানপথ সুন্দরীদের অলক্তকরাগরঞ্জিত পদে পরিচিহ্নিত হইয়া কেমন অনুপম শোভা বিস্তার করিত, কবি সে সমস্তই মুগ্ধনেত্রে অবলোকন করিয়াছিলেন। তিনি কবিজনোচিত মধুর ভাষায় তৎসমুদয় বর্ণন করিয়া স্বীয় অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

-

দ্বিজরাজমুখী মৃগরাজকটিঃ
গজরাজবিনিন্দিত-মন্দগতিঃ।
যদি সা প্রমদা হৃদয়ে বসতি
ক্ব জপঃ ক্ব তপঃ ক্ব সমাধি-বিধিঃ॥

বলা বাহুল্য কালিদাসের কবিতাই রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। তিনি মহারাজ কর্তৃক বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত হইলেন।

কথিত আছে;—একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য খলগণের প্ররোচনায় কালিদাসের প্রতি কথঞ্চিৎ উপেক্ষাসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই রূপ—উজ্জয়িনীর নবরত্নসভার সদস্য বলিয়াই কালিদাসের এত সম্মান, নচেৎ অন্যত্র অবস্থান করিলে তিনি কখনই এরূপ গৌরব লাভ করিতে পারিতেন না। কালিদাস রাজার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কিছু দিনের জন্য রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণাপথের কর্ণাট-রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তদানীন্তন কর্ণাট-নরপতি অতিশয় কবিতা-প্রিয় এবং স্বয়ং ও একজন সুকবি ছিলেন। যে সে কবিতায় তিনি মুগ্ধ হইতেন না। কর্ণাটরাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদিগকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন;—"যিনি কোন নূতন কবিতা রচনা দ্বারা তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারিবেন, তিনি সেই কবিতার রচয়িতাকে সম্মুখস্থ সমস্ত রাজ্য প্রদান করিবেন"। মন্ত্রী, এই দারুণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া সভাপণ্ডিত বল্লনকবিকে গোপনে আদেশ করিলেন—"কোন পণ্ডিত রাজধানীতে আগমন করিলে প্রথমেই যেন পরীক্ষা করা হয়,—তিনি কবি কি না?

কোন কোন পণ্ডিতের মতে প্রকৃতির প্রিয়নিকেতন সিংহলদ্বীপে কালিদাসের জীবন লীলা শেষ হয়। কথিত আছে;—সিংহলের রাজা কুমারদাস একজন সুকবি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত-ভাষায় "জানকী-হরণ" নামক প্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করেন। উক্ত রাজা কালিদাসের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। কালিদাস প্রৌঢ় বয়সে সিংহল দ্বীপে গমন করেন। সিংহলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি

কবি হইলে তাঁহাকে যেন কোন রূপেই রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া না হয়, আমিই ঐরূপ পণ্ডিতকে পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিব। রাজার নিকট একেবারে পণ্ডিত যাওয়া বন্ধ হইলেও রাজা সন্দেহ করিবেন। অতএব মধ্যে মধ্যে যেন দুই একটি সামান্য কবি কিংবা পণ্ডিতকে লইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করান হয়।" সেই দিন হইতে বল্লনকবি তাহাই করিতে লাগিলেন। তাহার পর, কালিদাস কর্ণাট-রাজধানীতে উপস্থিত। বল্লনকবি, কালিদাসকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কবিতা লেখা অভ্যাস আছে"? কালিদাস উত্তর করিলেন,—"হাঁ, কিছু কিছু অভ্যাস আছে।" তিনি চতুর ভাবিলেন,—'সভাপণ্ডিতের নাম "বল্লনকবি," সুতরাং অবশ্যই ইহার কিছু কবিত্ব আছে। যদি আমি ভাল কবিতা রচনা করি, তাহা হইলে এ ব্যক্তি নিজের প্রতিপত্তি হ্রাসের আশঙ্কায় কখনই রাজার নিকট লইয়া যাইবে না। অতএব অগ্রেই ইহার ঈর্ষ্যার পাত্র যাহাতে না হই, এরূপ ভাবে পরিচয় দিতে হইবে।' বল্লনকবি বলিলেন,"রাজার উদ্দেশ্যে একটা কবিতা লেখ ত দেখি"। কালিদাস তখন লিখিলেন;—উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভূপাল মুখং প্রক্ষালয় স্ব টঃ। রৌতি তে নগরে কুক্কু শ্চ বৈ তু হি চ বৈ তু হি॥ কালিদাস এমন ভাবে কবিতা লিখিলেন যে, শেষ চরণটি যেন মিলাইতে না পারিয়া (চ বৈ তু হি) দিয়া পূরণ করিলেন। বল্লন-কবি কালিদাসের কবিতা পাঠ করিয়া মনে মনে হাস্য করিলেন এবং ভাবিলেন 'এই রূপ কবিকেই রাজার নিকট লইয়া যাওয়া মন্ত্রীর অভিপ্রায়।' তাহার পর, কবিতা হস্তে করিয়া কালিদাসের সহিত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন; "রাজন্ অভ্যুদয়োঽস্তু" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল্লন-কবে হস্তে কিমাস্তে তব" বল্লন বলিলেন—"শ্লোকঃ" রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কস্য কবেঃ" বল্লন অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইলেন "অমুষ্য" রাজা কালিদাসের

মনোহর এবং কবিজনপ্রিয়; বিশেষ সিংহলে চিরবসন্ত বিরাজমান। কবিবর এই সকল কারণে শীঘ্র সিংহলদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। মহাকবির সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া তত্রত্য সমস্ত নর-নারীই তাঁহাকে আপন জন মনে করিত এবং রাজা কুমারদাসের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। একদা রাজা কুমারদাস একটি কবিতার অর্দ্ধাংশ

প্রতি নয়নপাত করিয়া বলিলেন "ভবতঃ" কালিদাস বলিলেন, "হুম্" রাজা আদেশ করিলেন "পঠ্যতাম্" কালিদাস বল্লনকবির হস্ত হইতে কবিতাটি লইয়া বলিলেন ;— কিন্ত্বাসামরবিন্দসুন্দরদৃশাং দ্রাক্ চামরান্দোলনাদুদ্বেল্লদ্ভুজবল্লীকঙ্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাম্॥ অর্থাৎ এই পদ্মনয়নাদের কর্ত্তৃক চামর ব্যজনে ঘন ঘন যে কঙ্কণের ঝণৎকার শব্দ হইতেছে, উহা ক্ষণকালের জন্য নিবারণ করিতে আদেশ দেওয়া হউক। পাঠকগণ দেখুন ইঁহাদের পরস্পর কথোপকথনে শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের একটি সুন্দর কবিতা হইয়াছে।

রাজন্ অভ্যুদয়োঽস্তু বল্লনকবে হস্তে কিমাস্তে তব
শ্লোকঃ কস্য কবেরমুষ্য ভবতো হুম্ পঠ্যতাং পঠ্যতে।
কিন্ত্বাসামরবিন্দসুন্দরদৃশাং দ্রাক্ চামরান্দোলনা
দুদ্বেল্লদ্ভুজবল্লীকঙ্কণ-ঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাম্॥

রাজার আদেশে ব্যজনকারিণীরা ব্যজন কার্য্য হইতে বিরত হইল। কালিদাস একটি কবিতা রচনা করিয়া পাঠ করিলেন। রাজা পূর্ব্বাভিমুখ হইয়াছিলেন, তিনি ঐ কবিতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখস্থ রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখ হইয়া বসিলেন। কালিদাস, ভাবিলেন রাজা কবিতা শ্রবণে সন্তুষ্ট হন নাই, সুতরাং তিনি দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইয়া আর একটি কবিতা পাঠ করিলেন। রাজা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে দক্ষিণ দিকের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখ হইয়া বসিলেন। এই রূপে চারিটি কবিতা শ্রবণে চারি দিকের রাজ্য ত্যাগ করিয়া রাজা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বসিলেন। কালিদাস যে কবিতার পুরস্কার স্বরূপ কর্ণাটরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা তিনি কিছুই জানিতে, পারেন নাই। তাঁহার মনে হইতেছে ;—রাজা বিদ্বান্ স্বয়ং সুকবি, আমার কবিতা যে তাঁহার হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও আনন্দ প্রদান করে নাই এমন বোধ

রচনা করিয়া অপরার্দ্ধ পূরণের নিমিত্ত একটি রূপবতী বিদুষী রমণীর হস্তে অর্পণ করেন। ঐ রমণী কালিদাসকে পাইয়া তাঁহার দ্বারা ঐ শ্লোকাংশ পূরণ করিয়া লয়েন এবং রাজার নিকট প্রতিপত্তি বৃদ্ধি-মানসে কালিদাসকে নিহত করিয়া স্বীয় নামে ঐ কবিতা প্রচার করেন। রাজা কুমারদাস সন্দিহান হইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং ঐ রূপবতী ললনার গৃহ হইতেই কালিদাসের মৃত দেহ বাহির হয়। সিংহলদ্বীপে

হয় না। অতএব এরূপ বিমুখ হইবার কারণ কি? অথবা পুরস্কার দানের ভয়েই রাজা ঐরূপ বিমুখ হইয়া থাকিবেন। যাহাই হউক, এরূপ ব্যবহারের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে হইবে। তাহার পর তিনি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ;—

মাগাঃ প্রত্যুপকারকাতরধিয়া বৈমুখ্যমাকর্ণয়,
রে কর্ণাট বসুন্ধরাধিপসুধাসিক্তানি সূক্তানি মে।
বর্ণ্যন্তে কতিভূধরার্ণবনদীভূগোলবিন্ধ্যাটবী-
ঝঞ্ঝামারুতচন্দ্রমঃ-প্রভৃতয়স্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া॥

মহারাজ! প্রত্যুপকারের ভয়ে বিমুখ হইবেন না, হে কর্ণাটবসুধাধীশ্বর! আমার সুধাসিক্ত বাক্যগুলি শ্রবণ করুন। (আমরা কবি, পরের গুণ বর্ণনা করাই আমাদের স্বভাব) আমরা কত পর্ব্বত, অর্ণব, নদী, পৃথিবী, বিন্ধ্যারণ্য, ঝঞ্ঝাবায়ু, চন্দ্রমা প্রভৃতির বর্ণন করিয়া থাকি, তাহারা কি আমাদের কিছু প্রদান করে? এই অবসরে রাজা একজন কবিকে চতুর্দ্দিকের রাজ্যই প্রদান করিয়াছেন,—এই সংবাদ অন্তঃপুরে পৌঁছিল। রাজমহিষী বিদুষী, তিনি ভাবিলেন—কে এমন কবি যে, সে রাজাকে কবিতায় মুগ্ধ করিয়া সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করিল? যাহা হউক, ঐ কবিকে একবার দেখিতে হইবে। তাহার পর, মহিষী তাঁহার লাবণ্যবতী বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাটিকে সঙ্গে করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং সগর্ব্বে বলিলেন ;—

একোঽভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপরে,
তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরবস্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে।
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্যরচনৈশ্চেতশ্চমৎ কুর্ব্বতে
তেষাং মূর্দ্ধি দদামি বামচরণং কর্ণাট-রাজপ্রিয়া॥

ভারত-মহাসাগরের উপকণ্ঠে মাতরনগরের সন্নিহিত কালিন্দী নদীর তীরে কালিদাসের মৃতদেহ ভস্মীভূত করা হয়। রাজা কুমারদাস কবিবন্ধুর দারুণ বিয়োগ-ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার চিতানলে আত্ম বিসর্জ্জন করেন। এখনও ঐ চিতাভূমি সুপারি এবং নারিকেল-তরু-শ্রেণীর মধ্যভাগে পুষ্পময়ী বন্যলতায় স্বীয় অঙ্গ আবৃত করিয়া বিরাজমান রহিয়াছে।

এই কিংবদন্তীর যাথার্থ্য স্বীকার করিলে কালিদাসকে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কবি বলিতে হয়। কারণ রাজা কুমারদাস যে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ

এক কবি বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হন (ব্রহ্মা)। আর এক কবি নদীপুলিনে জন্ম লাভ করেন (মহর্ষি-দ্বৈপায়ন)। অপর কবি বল্মীক ভেদ করিয়া নির্গত হন (বাল্মীকি)। তাঁহারা কবি এবং ত্রিলোকের শিক্ষাদাতা, অতএব তাঁহাদিগকে কোটি কোটি নমস্কার করি। আধুনিক যে সকল কবি গদ্য পদ্য রচনা দ্বারা লোকের চিত্ত বিমোহিত করেন, তাঁহাদের মস্তকে (আমি কর্ণাটরাজ-মহিষী) বাম চরণ অর্পণ করি।

কালিদাস রাজমহিষীর ব্যবহারে বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন আমি এমন কি করিয়াছি যাহাতে ইনি আমার মস্তকে বামচরণ নিক্ষেপ করিতে পারেন। কিছু ক্ষণমধ্যে সকল রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল. কালিদাস মহিষীর ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারিলেন। তাহার পর, তিনি বলিলেন ;—

> ন যাচে গজালীং নবা বাজিরাজিং,
> ন বিত্তেষু চিত্তং কদাচিন্মমৈব।
> ইয়ং সুস্তনী মস্তক-ন্যস্ত-হস্তা,
> নবাঙ্গী কৃশাঙ্গী দৃগঙ্গীকরোতু ॥

আমি হস্তী কিংবা অশ্ব যাচ্ঞা করিতেছি না, বিত্তের প্রতি আমার চিত্ত কখনও ধাবিত হয় না। এই সুন্দরী রাজকুমারী যিনি মস্তকে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ইনি একবার প্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

রাজমহিষী কবির প্রার্থনায় তথনই সম্মত হইলেন এবং নিজের কঠোর উক্তি

শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন উহা সিংহলের ইতিহাস পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক কালিদাসও খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন (১)।

২। মহাকবি ঘটকর্পর নবরত্নসভার অন্যতম সদস্য। ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও মহাকবি কালিদাসের সমসাময়িক। ঘটকর্পর ভারতের কোন্ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং কোন্ বংশ তাঁহা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল, তাহা এপর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ পাঠে জানা যায়—তাঁহার প্রকৃত নাম হরি। কবিবর হরি, যমক অনুপ্রাস-প্রভৃতি শব্দালঙ্কার-পূর্ণ কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহার রচিত একটি যমক কবিতা শুনিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং কবিকে বিশেষ প্রশংসা করেন। সভাসদ্গণ রাজার মতের অনুসরণ করিতে গিয়া তাঁহার কৃত প্রশংসাবাদকে অধিকতর পল্লবিত করিয়া তুলেন। আশাতীত প্রশংসা লাভে কবির হৃদয় গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠে, তিনি নিজের বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠার বাসনায় নবরত্নসভার কবিগণের ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই প্রতিজ্ঞা করেন ;—

"যে কবি উৎকৃষ্ট যমক রচনাদ্বারা আমাকে পরাজিত করিতে

প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। বলিলেন আপনি আমার কবিতার অন্বয় বুঝিতে পারিয়াছেন ত? আমার উক্তির তাৎপর্য্য এই,—"তেষাং কবীনাং বামচরণং কর্ণাট-রাজ-প্রিয়া অহং মূর্দ্ধি দদামি"। কালিদাস রাজমহিষীর চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত এবং আনন্দিত হইলেন এবং রাজজামাতা হইয়া কিছুকাল কর্ণাট-রাজ্যে বাস করিলেন। শেষে বিক্রমাদিত্য দূত প্রেরণ করিয়া কবিকে মহাসম্মানে স্বরাজ্যে লইয়া যান।

(১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীমান সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি,-লিখিত "মহাকবি কালিদাসের চিতাভূমি ও তাঁহার অন্তিম কবিতা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করুন।

সমর্থ হইবেন, আমি তাঁহার জন্য ঘটকর্পর দ্বারা (অর্থাৎ কল্সীতে করিয়া) জল বহন করিব" (১)।

এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য শুনিয়া সভাস্থ পণ্ডিতগণ নীরব হইয়া রহিলেন। কেবল মহাকবি কালিদাস কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন কেহই কালিদাসের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কয়েক দিনের মধ্যে "নলোদয়" নামক একখানি যমক-কাব্য রচনা করিয়া নবরত্নসভায় উপস্থিত হইলেন। কালিদাস তাঁহার রচিত শব্দালঙ্কারপূর্ণ কবিতা সকল পাঠ করিলে সদস্যগণ উহা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং সকলেই একবাক্যে বলিলেন "হরির কবিতা হইতে কালিদাসের কবিতা উৎকৃষ্টতর"। আমরা পাদটীকায় উভয় কবির কবিতাই উদ্ধৃত করিলাম (২)।

এইবার কবিবর হরির ঘটকর্পরে করিয়া জলবহনের সময় উপস্থিত কিন্তু শিষ্টতার অনুরোধে কেহই তাঁহাকে ঐ রূপ নীচকার্য্য করিতে আদেশ করিল না কিন্তু ঐ প্রতিজ্ঞা-বাক্য লোকের মুখে মুখে দেশময়

(১) জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ।
তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ॥

(২) হংসপংক্তিরপি নাথ সংপ্রতি,
প্রস্থিতা বিয়তি মানসং প্রতি।
চাতকোঽপি তৃষিতোঽম্বু যাচতে
দুঃখিতা পথিক সা প্রিয়া চ তে॥
কুসুমৈরুপশোভিতাং সিতৈ
র্ঘনমুক্তাম্বুলবপ্রকাশিতৈঃ।
মধুনঃ সমবেক্ষ্য কালতাং।
ভ্রমরশ্চ্যুতি যূথিকালতাম্॥
(ঘটকর্পর-কবিকৃতং যমককাব্যম্)

ন সমা ন সমা ন সমা ন সমা
গমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।
ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ
ভ্রমরশ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ॥
যমনায়মনায়মনায়মনা
গভিবীক্ষ্য রতন্দ্রবতীহ পরঃ।
সরুষো নিষধক্ষিতিনাথগল
ন্নবমানবমানব মানব মাঃ॥
(কালিদাস-কৃতং নলোদয়-কাব্যম্)

প্রচারিত হইল। কবিবর হরির কথা উঠিলে লোকে তাঁহার নাম না করিয়া "ঘটকর্পর" শব্দ উচ্চারণ করিত। ক্রমে ক্রমে কবির নামের স্থলে ঘটকর্পর শব্দই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। অদ্যাপি যাঁহারা জ্যোতির্ব্বিদাভরণ পাঠ করেন নাই, তাঁহারা এই কবিকে ঘটকর্পর বলিয়াই জানেন। ঘটকর্পর-প্রণীত প্রথমগ্রন্থ "যমককাব্য" উহার শ্লোকসংখ্যা ২২টি মাত্র। ঐ সকল শ্লোকের রচনা শব্দালঙ্কারের দিক্ দিয়া ধরিলে হয় ত নলোদয়ের রচনার তুল্য নাও হইতে পাবে কিন্তু তাই বলিয়া কবিত্ববিহীন নহে। উহাতে কষ্টকল্পনার লেশমাত্র নাই। কবিতাগুলি সুন্দর মধুর এবং সরল বর্ণনায় পরিপূর্ণ। উক্ত কবির কৃত আর একখানি ক্ষুদ্র কাব্য দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নাম "নীতিসার"। নীতিসারের শ্লোকসংখ্যা ২১ শটি মাত্র। ঐ শ্লোক কয়টির রচনায় কোন বিশেষত্ব না থাকিলেও উহা সুন্দর দৃষ্টান্তসমূহে পরিপূর্ণ (১)

৩। পণ্ডিতবর বরাহমিহির ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্। এই মহাত্মার আবির্ভাবের পূর্ব্বে অথবা পরে জ্যোতিষ-বিদ্যায় তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী এবং বহুদর্শী মনীষী জন্ম গ্রহণ করেন নাই। বরাহমিহির যে উজ্জয়িনীর অধিবাসী এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন তদ্বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। তাঁহার প্রণীত বৃহজ্জাতকের টীকাকার ভট্ট উৎপল লিখিয়াছেন; – ৪২৭ শকাব্দে (৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে) বরাহমিহির সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থরচনা করেন এবং

(১) গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদঃ,
লক্ষান্তরে হর্কশ্চ জলেষু পদ্মঃ।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষং কুমুদস্য বন্ধু
যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্ ॥১॥
(ঘটকর্পর-বিরচিতং নীতিসারকাব্যম্)

৫০৯ শকাব্দে (৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার তিরোভাব হয়। যাঁহাদের মতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর রাজা, বরাহমিহিরের আবির্ভাব কাল তাঁহাদের মত সমর্থনের পক্ষে অন্যতম প্রমাণ। বরাহমিহির স্বর্য্যোপাসক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মগধ প্রদেশের রাজধানী পুষ্পপুর (পাটলিপুত্র) নগর হইতে উঠিয়া গিয়া অবন্তীতে (উজ্জয়িনীতে) বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম আদিত্যদাস; তিনিও মহাপণ্ডিত ছিলেন। বরাহমিহির প্রথমে পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন, তাহার পর, কাপিথ্থক নামক স্থানে গমনপূর্ব্বক তপস্যা করেন এবং স্বর্য্যের প্রসাদে বর লাভ করিয়া অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন (১)। তিনি যে উজ্জয়িনীতে বাস করিতেন এবং তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় যে উজ্জয়িনীতেই অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহার গ্রন্থ মধ্যেই উহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বরাহমিহির নানা অবসরে বহুবার উজ্জয়িনীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ত্রৈলোক্যসংস্থানের (২) কথা বলিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন;—

উজ্জয়িনী লঙ্কার সমসূত্রপাতে উত্তরদিকে অবস্থিত। অতএব

(১) আদিত্যদাসতনয়স্তদবাপ্তবোধঃ,
কাপিথ্থকে সবিতৃ-লব্ধবরপ্রসাদঃ।
আবন্তিকো মুনিমতান্যবলোক্য সম্যগ্
ঘোরাং বরাহমিহিরো রুচিরাং চকার ॥
(বরাহমিহিরকৃত--বৃহজ্জাতক।)

(২) ত্রৈলোক্যসংস্থান—পৃথিবী কোন্ গ্রহ হইতে কত দূরে, তাহার আকার পরিমাণ, গতি এবং তাহাতে কোন্ নদী কোন্ সমুদ্র কোন্ পর্ব্বত কোন্ দেশ কোথায় অবস্থিত ইত্যাদির বিষয় যে অধ্যায়ে আছে তাহাকে "ত্রৈলোক্যসংস্থান নামক অধ্যায়" বলে।

উভয় স্থানে মধ্যাহ্ন এক কালেই হয় কিন্তু বিষুব দিবসদ্বয় (১) ব্যতীত অন্য দিবস গুলির পরিমাণ উভয় স্থানে সমান নহে (২) ইহা ব্যতীত আরও অনেক স্থলে উজ্জয়িনী নগরীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বরাহমিহির অসীম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। অধিকন্তু তৎকাল-প্রচলিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জ্যোতিষ-বিদ্যার আলোচনা করায় তাঁহার জ্ঞানের অধিকতর বিস্তৃতি হইয়াছিল। তিনি ভারতীয় জ্যোতিষবিদ্যার পরিপূর্ণতা বিধানের নিমিত্ত যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা নিরুপম। বরাহমিহির জ্যোতিষ-বিদ্যাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম গণিত-জ্যোতিষ, দ্বিতীয় হোরাশাস্ত্র, তৃতীয় শাখাশাস্ত্র। গণিত-জ্যোতিষে গ্রহগণের গতি উদয় অস্ত গ্রহণ ইত্যাদি নির্ণীত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে তাঁহার প্রধান গ্রন্থ পঞ্চসিদ্ধান্তিকা। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পৌলিশসিদ্ধান্ত রোমকসিদ্ধান্ত বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং পৈতামহসিদ্ধান্ত এই পাঁচখানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া নিজের মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয় হোরাশাস্ত্র বিষয়ে বরাহমিহির বৃহজ্জাতক এবং লঘুজাতক নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই দুই গ্রন্থের সাহায্যে জাত ব্যক্তির জীবনের ফলাফল নির্ণয় করা যাইতে পারে। তৃতীয় শাখাশাস্ত্র বিষয়ে বৃহৎসংহিতা তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থ গভীর

(১) বিষুব দিবসদ্বয়—বৎসরের মধ্যে যে দুই দিনে দিবারাত্রি সমান হয় অর্থাৎ ৯ই চৈত্র এবং ৯ই আশ্বিন।

(২) উজ্জয়িনী লঙ্কায়াঃ
সন্নিহিতা যোত্তরেণ সমসূত্রে।
তন্মধ্যাহ্নো যুগপ
দ্বিসমো দিবসো বিষুবতোহন্যঃ॥
বরাহমিহিরকৃত—"পঞ্চসিদ্ধান্তিকা"।

জ্ঞান এবং ভূয়োদর্শনের ফল। বৃহৎসংহিতায় সপ্তর্ষি-মণ্ডলের গতি স্থিতি, বাস্তুবিদ্যা, বৃক্ষাদি-রোপণ, স্ত্রী-পুরুষের শুভাশুভ চিহ্ন, কৃষিকার্য্য, উৎপাতের পূর্ব্ব লক্ষণ, দিগ্‌দাহ, উল্কাপাত, ধূমকেতু, মুক্তা-পদ্মরাগ-মরকত-প্রভৃতির পরীক্ষা, গো-প্রভৃতি পশুর ইঙ্গিত-জ্ঞান, অশ্ব-হস্তী প্রভৃতির লক্ষণ, পক্ষি-রবের শুভাশুভ নির্ণয় ইত্যাদি বহুবিষয় উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত তাঁহার রচিত আরও অনেক জ্যোতিষ-গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। পৃথিবীর সভ্যজনপদ-সমূহে যতই তাঁহার গ্রন্থের আলোচনা হইতেছে, ততই মনীষিগণ তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইতেছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের প্রকৃতির সহিত বরাহমিহিরের প্রকৃতির যথেষ্ট প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রায়ই পুরাতন গ্রন্থকারদের মতে দোষ আরোপ করিয়া নিজের মত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বরাহমিহির তাহা করেন নাই। তিনি প্রাচীন ঋষি এবং ঋষিকল্প পণ্ডিতগণের মত এবং তাহার সহিত নিজের মত অতিপ্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্র লিখিতে বসিয়াও সরস কাব্যের মধুরতা বিকীর্ণ করিতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার ভাষা রীতিশুদ্ধ সংস্কৃতের আদর্শ। তিনি বিংশ শতাব্দীর মনীষিগণের ন্যায় গুণগ্রাহী এবং মার্জ্জিতরুচি ছিলেন। স্বদেশীয় কিংবা বিদেশীয় বলিয়া তাঁহার কোন পক্ষপাত ছিলনা। বরাহমিহির বৃদ্ধগর্গ গর্গ, পরাশর বসিষ্ঠ অসিত দেবল ঋষ্যশৃঙ্গ উশনাঃ ভরদ্বাজ কপিল কণাদ বাদরায়ণ-প্রভৃতি ঋষি এবং লাটাচার্য্য সিংহাচার্য্য আর্য্যভট্ট-প্রভৃতি ঋষিকল্প পণ্ডিতগণের মত যেরূপ আদর সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন, আবার বৈদেশিক পণ্ডিত রোমক যবন মনিথ প্রভৃতির মতের ও সেইরূপ আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। জ্ঞানচর্চ্চায় বৈদেশিক বলিয়া তাঁহার কোন বিদ্বেষ ছিল না।

বহুশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা বরাহমিহিরের হৃদয় সুসংস্কৃত হইয়াছিল। তাঁহার লেখা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। বৃহৎসংহিতায় তিনি স্ত্রীজাতির অশেষ গুণের প্রশংসা করিয়াছেন।

৪। ধন্বন্তরি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার আর একটি রত্ন এবং তাঁহার সমসাময়িক। কথিত আছে;—স্বয়ং ভগবান্ সূর্য্য কাশীধামে কল্পদত্তনামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়নের পর তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করেন। তাঁহার চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এতই খ্যাতি হইয়াছিল যে রোগী তাঁহার দর্শনমাত্র রোগমুক্ত হইত। তজ্জন্য জনসাধারণে পুরাণোক্ত ধন্বন্তরির তুল্যপ্রভাব বলিয়া এই ব্রাহ্মণ-কুমার অংশুদত্তকেও ধন্বন্তরি নামে আহ্বান করিত। তজ্জন্য অংশুদত্তের প্রকৃত নাম বিলুপ্ত হইয়াছিল, তিনি জনসমাজে ধন্বন্তরি আখ্যায়ই আখ্যাত হইতেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য উক্ত ভিষগ্বরের প্রশংসা-বাদ শুনিয়া নবরত্ন সভার অন্যতম সদস্যপদে বরণ করেন। ধন্বন্তরির কত বৎসর বয়সে কোথায় তিরোভাব হয়, তাহা জানা যায় না। তাঁহার কৃত নাকি অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ আছে কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও এ পর্য্যন্ত উহার একখানিও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

৫। ক্ষপণক মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অপর এক প্রসিদ্ধ রত্ন। এই মনীষীর প্রকৃত নাম দিঙ্নাগাচার্য্য। বৌদ্ধভিক্ষুরা সাধারণতঃ ক্ষপণক আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন। আচার্য্য দিঙ্নাগও বৌদ্ধভিক্ষু ছিলেন বলিয়া জনসমাজে ক্ষপণক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্যের সময়ের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক। তাঁহার ন্যায় তার্কিক সে সময়ে ভারতবর্ষে আর কেহই বর্ত্তমান ছিলেন না। দিঙ্নাগের খ্যাতিতে মুগ্ধ মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে নবরত্ন-

সভার অন্যতম রত্নপদে বরণ করিয়া সভাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। তিনি সকল সময়ে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত থাকিতেন না, কদাচিৎ উক্ত রাজধানীতে আগমন করিতেন। দিঙ্‌নাগ গৃহী ছিলেন না, তিনি বৌদ্ধপরিব্রাজক। বাদী জয় করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সেই উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেন। তাঁহাকে দেখিলে নৈয়ায়িকগণ ভীমরুলের মত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিতেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইতেন। বহু গবেষণায় ক্ষপণকের (দিঙ্‌নাগের) সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। নিম্নে উহা লিপিবদ্ধ হইল।

দিঙ্‌নাগ ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে সুপ্রসিদ্ধ কাঞ্চীতীর্থের নিকটবর্ত্তী সিংহবক্ত্র-গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতার নাম জানা যায় না। অধ্যয়ন শেষ হইলেই বৌদ্ধদের কোন সম্প্রদায়বিশেষের পণ্ডিত নাগদত্ত তাঁহাকে নিজ সম্প্রদায়-ভুক্ত করেন। তাহার পর, তিনি আচার্য্য বসুবন্ধুর শিষ্য হন। কথিত আছে ;—দিঙ্‌নাগ বৌদ্ধদের বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী মঞ্জুশ্রীর মুখ দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই কৃপায় দিঙ্‌নাগের বিদ্যা লাভ হয়। দিঙ্‌নাগের যশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে তিনি মগধের নালন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত হন। সেখানে সুদুর্জ্জয় নামক এক তার্কিক ব্রাহ্মণকে বিচারে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধমতে আনয়ন করেন। তজ্জন্য নালন্দ-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "তর্কপুঙ্গব" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার পর, তিনি উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্রের সমস্ত তীর্থবাসী নৈয়ায়িকগণকে পরাজিত করেন। উড়িষ্যার তদানীন্তন রাজার কোষাধ্যক্ষ ভদ্রপালিত ঐ সময়ে দিঙ্‌নাগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দিঙ্‌নাগ যেমন বলিষ্ঠ তেমনই প্রতিভাশালী ছিলেন।

প্রবীণ বয়সে তিনি তাঁহার জন্মভূমি আন্ধ্রুরাজ্যের একটি শৈলমালার উপরিভাগে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতেন। ঐ সময় তিনি অন্য কার্য্য হইতে বিরত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়নে আসক্ত হন। তিনি প্রথমে "প্রমাণসমুচ্চয়" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। দিঙ্নাগ এক দিবস উক্ত গ্রন্থের কিয়দংশ রচনা করিয়া আশ্রমে রাখিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতে গিয়াছেন, এমন সময় ঈশ্বরকৃষ্ণ নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া সমস্ত অংশ মুছিয়া দিয়া প্রস্থান করেন। দিঙ্নাগ পুনরায় ঐ অংশ লেখেন, ঈশ্বরকৃষ্ণ আবার মুছিয়া দিয়া যান। এই রূপে তিন বার লেখার পর দিঙ্নাগ ঐ পুস্তকের উপর একখানি পত্রে লিখিয়া রাখেন--"আমার লেখা আর মুছিও না, যদি কাহারও মত-বিরুদ্ধ কথা লিখিয়া থাকি, তিনি প্রকাশ্য ভাবে আসিয়া আমার সহিত ঐ বিষয়ে তর্ক করিতে পারেন"। তাহার পর, ঈশ্বরকৃষ্ণ সশরীরে আসিয়া দিঙ্নাগের সহিত তর্ক আরম্ভ করেন। বহু বিতর্কের পর, পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করেন। অনেকেই দিঙ্নাগের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত মার্জ্জিত-রুচি দিঙ্নাগ সময়ে সময়ে কালিদাসের আদিরসপ্রধান কবিতার উপর সুতীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। তজ্জন্য কালিদাস মেঘদূত কাব্যের একটি কবিতায় দিঙ্নাগের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন (১)। দিঙ্নাগ যে শুধু জীবিত থাকিতেই বহু পণ্ডিত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, মৃত্যুর পরও অনেকে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর

(১) অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভি
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্।

কুমারিলভট্ট বাচস্পতিমিশ্র পার্থসারথিমিশ্র প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁহার মত খণ্ডনের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছেন।

কথিত আছে ঃ—উড়িষ্যায় অবস্থানকালে তাঁহার দেহাত্যয় ঘটে। তিনি "প্রমাণসমুচ্চয়" "প্রমাণশাস্ত্রপ্রবেশ" "প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি" "ন্যায়প্রবেশ" "ত্রিকালপরীক্ষা" "আলম্বনপরীক্ষা" "হেতুচক্র" প্রভৃতি কয়েকখানি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ সকল মূলগ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। তিব্বতীয় ভাষায় ও চীনভাষায় উহার অনুবাদ আছে (I)।

৬। অমরসিংহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন। ইঁহার নামান্তর অমরদেব। এই শাব্দিক গ্রন্থকার উজ্জয়িনী-পতির সমসাময়িক সুতরাং উক্ত নরপতির আবির্ভাব-কালই অমর-সিংহের আবির্ভাব-কাল। তিনি কোন্ প্রদেশে বা কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার লিখিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেকে কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া বলেন "তিনি মগধে জন্ম গ্রহণ

এই কবিতার শেষ দুই পংক্তিতে কালিদাস শ্লেষ-অলঙ্কারের সাহায্যে নিজের বিরুদ্ধ-পক্ষ দিঙ্‌নাগের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। প্রথম অর্থ 'হে মেঘ! তুমি যে দেশে সরস নিচুলবৃক্ষ আছে, সেই দেশ হইতে দিগ্‌হস্তীদিগের শুণ্ডের আঘাত অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হও'। দ্বিতীয় অর্থ—'হে কবিতা! তুমি যেখানে আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু সুরসিক নিচুল কবি আছেন, সেই স্থান হইতে দিঙ্‌নাগাচার্য্যের হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চারিত প্রতিবাদ বাক্যকে উপেক্ষা করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হও'। পণ্ডিতগণ বলেন—"কালিদাস এই কবিতায় দিঙ্‌নাগকে প্রতিপক্ষরূপে বর্ণনা করিয়া নিজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন"। কথিত আছে দিঙ্‌নাগ কালিদাসের কবিতার দোষ প্রদর্শন করিলেই সুরসিক নিচুল কবি নানা রসপূর্ণ বাক্যদ্বারা উহার খণ্ডন করিতেন।

(I) Vide History of the Mediaeval School of Indian Logic by Mohamahopadhyaya Dr. Satis chandra Vidyabhuson M. A., Ph. D.

করিয়াছিলেন।” অমরসিংহ যে মগধবাসী ছিলেন, দুইটি কারণে তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, মগধই এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল, সুতরাং তাঁহার জন্মভূমি মগধে হওয়াই অধিক সম্ভব। দ্বিতীয় কারণ, বুদ্ধগয়ার কোন বুদ্ধমন্দিরে একখানি শিলালিপিতে যে কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

“বিক্রমাদিত্য একজন পৃথিবীবিখ্যাত নরপতি ছিলেন, এবং তাঁহার নবরত্নসভায় যে নয়জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা নবরত্ন নামে আখ্যাত। অমরদেব তাঁহাদের অন্যতম। তিনি অতিশয় সুপণ্ডিত এবং রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম অমাত্য ছিলেন (I)”।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ৩০৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে উপরি লিখিত বুদ্ধমন্দির ছিল না। তাহার পর, অপর বিখ্যাত চীন-দেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্সাঙ্ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বাস করেন, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে ; অতএব খ্রীষ্টীয় ৫ম খ্রীষ্টাব্দের শেষে কিংবা খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হয়, ইহা এক প্রকার স্থির। এ প্রমাণ দ্বারাও স্থির হইল, বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী এবং ঐ সময়ে অমরসিংহ বিদ্যমান ছিলেন। মগধেই যে তাঁহার জন্মভূমি ছিল তাহার অপর কারণ এই যে, লোকে অধিকাংশ সময়ে স্বদেশে নিজ পরিচিত ব্যক্তিগণের দর্শনযোগ্য স্থানেই স্বীয় কীর্ত্তি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। অমরসিংহ মগধবাসী না হইলে মগধের প্রধান

(1) Wilkins, (As. Res. Vol I p 286). Also General Cunningham's Archaeological Survey Report (Journ. As. soc. B. Vol. XXXII)

বৌদ্ধতীর্থ বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন কেন? ইচ্ছা করিলে তিনি উজ্জয়িনী অথবা অন্য কোন স্থানেও উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। অমরসিংহের প্রধান কীর্ত্তি ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধান। উহা এখন "অমরকোষ" নামেই প্রসিদ্ধ। এই অভিধানে তিনটি কাণ্ড (অংশ) আছে বলিয়া উহা "ত্রিকাণ্ডশেষ" নামে উক্ত হইয়া থাকে। অমরসিংহ তৎকৃত অভিধানের মঙ্গলাচরণ কালে লিখিয়াছেন।—

"যিনি জ্ঞান এবং দয়ার সাগর, যাঁহার গুণ অনন্ত এবং নির্ম্মল, হে পণ্ডিতগণ! আপনারা কল্যাণ এবং নির্ব্বাণ লাভের নিমিত্ত তাঁহার সেবা করুন (১)"।

বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকগণ বলেন:—"অমরসিংহের বৌদ্ধধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল কিন্তু তাঁহার প্রভু বিক্রমাদিত্য শিবোপাসক ছিলেন। সুতরাং প্রভুর বিরাগ আশঙ্কায় মঙ্গলাচরণের শ্লোকটি এরূপভাবে রচনা করিয়াছেন যে, বুদ্ধ এবং শিব উভয় পক্ষেই উহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।" কিন্তু আমাদের মনে হয়, অমরসিংহ ঐরূপ কপট বৌদ্ধ ছিলেন না। তিনি মঙ্গলাচরণের শ্লোকে স্পষ্টরূপে বুদ্ধদেবকেই নমস্কার করিয়াছেন। যদি রাজার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত শিবের নমস্কার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে সকল দেবতার অগ্রে বুদ্ধদেবের নামমালা লিপিবদ্ধ করিতেন না। তিনি স্বর্গবর্গের প্রথমেই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবের নাম সর্ব্বাগ্রে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আর অভিধানের মঙ্গলাচরণের শ্লোকে বুদ্ধদেবের নমস্কার করিলে মহারাজ বিক্রমাদিত্যেরই বা কেন বিরাগের কারণ হইবে? মহারাজ বিক্রমাদিত্য কৃতবিদ্য ও উদারচরিত্র

(১) যস্য জ্ঞানদয়াসিন্ধোরগাধস্যানঘা গুণাঃ।
সেব্যতামক্ষয়ো ধীরাঃ স শ্রিয়ে চামৃতায় চ॥
(ত্রিকাণ্ডশেষঃ)

ছিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরই শাসক ও বিচারক, অতএব তিনি অন্যের ধর্ম্মবিশ্বাসে বাধা প্রদান করিয়া কলঙ্কভাগী হইবেন কেন? বরং ঐ বিষয়ে তাঁহার উদারতাই দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গুণগ্রাহী নরপতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই বিদ্বান্ এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া "নবরত্নসভার" সদস্যপদে বরণ করিয়াছিলেন। অমরসিংহ ব্যতীত ক্ষপণক-প্রভৃতি আরও বৌদ্ধ-পণ্ডিত তাঁহার নবরত্নসভায় পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত-ভাষায় অমরকোষের ন্যায় উৎকৃষ্ট অভিধান আর রচিত হয় নাই। একার্থক সমুদয় শব্দ এক পর্য্যায়ে লিপিবদ্ধ থাকায় কবি ও লেখক-গণের পক্ষে এই অভিধান অতীব উপকারী হইয়াছে।

৭। পণ্ডিতবর শঙ্কু মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতম সদস্য এবং তাঁহার সমসাময়িক। কেহ কেহ বলেন "তিনি গুজরাটের অধিবাসী।" শঙ্কুর বংশ ও মাতা পিতার নাম জানা যায় নাই। কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিতের মুখে শুনা যায়—শঙ্কু অলঙ্কারশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার যে শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ তিনি নবরত্নসভার ন্যায় প্রধান বিদ্বৎসমিতিতে কখনই স্থান প্রাপ্ত হইতেন না। নবরত্নসভার প্রায় সকল সদস্যের কৃত গ্রন্থই পাওয়া যায়। অতএব শঙ্কু যে একবারে কোন গ্রন্থ লেখেন নাই, এরূপ বোধ হয় না, কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার কৃত কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই।

৮। মহাকবি বেতালভট্টও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক এবং নবরত্নসভার অন্যতম সদস্য। এই কবির জন্ম কিংবা বংশের বিষয়ে কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। কোন কোন পণ্ডিত বলেন;— "বেতালভট্ট বিদর্ভ-প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন"। যত দিন পর্য্যন্ত উহার কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া যায়, তত দিন উক্ত কবিকে

বিদর্ভের অধিবাসী বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কথিত আছে,—মহাকবি বেতালভট্ট নবরত্নসভার ঐতিহাসিক পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় এই বিখ্যাত পণ্ডিতের রচিত কোন ইতিহাস গ্রন্থই পাওয়া যায় না। হয় ত বেতালভট্টকৃত ইতিহাস গ্রন্থ ছিল, কালে উহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল তাঁহার কৃত "নীতিপ্রদীপ" নামক একখানি ক্ষুদ্র কাব্য পাওয়া যায়। ঐ কাব্যের শ্লোকসংখ্যা ষোলটি মাত্র। কিন্তু উহাতে যথেষ্ট কবিত্ব আছে এবং দৃষ্টান্তগুলিও অতিসুন্দর। দুই একটি কবিতার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

"রত্নাকর রত্নদ্বারা কি করে, বিন্ধ্যাচলই বা হস্তিগণের দ্বারা কি করিয়া থাকে, চন্দনতরুর দ্বারা মলয়পর্ব্বতের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? অতএব সাধুগণের সম্পদ্ কেবল পরোপকারের নিমিত্তই হইয়া থাকে। নিজের স্বার্থসাধনের নিমিত্ত নহে।" (১)

"হে শাল্মলীতরুবর! তুমি পথ হইতে দূরে অবস্থান কর, তোমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকে আবৃত, তুমি কোন রূপ ছায়া দান কর না, তোমার ফল বানরেরও অভক্ষ্য, তোমাতে কোন প্রকার সৌরভ নাই, মধুকর কখনও তোমার নিকট আগমন করেনা, তোমার দেহে কিছুমাত্র সার নাই, অতএব এত কাল যে আমরা তোমার সেবা করিলাম, তাহা বিফল হইল, তুমি থাক, আমরা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া

(১) রত্নাকরঃ কিং কুরুতে স্বরত্নৈঃ,
বিন্ধ্যাচলঃ কিং করিভিঃ করোতি।
শ্রীখণ্ডখণ্ডৈ র্মলয়াচলঃ কিং,
পরোপকারায় সতাং বিভূতিঃ ॥১॥

যাই৭" (১) এই কবিতাটি দ্বারা শাল্মলীতরুকে উপলক্ষ্য করিয়া কৃপণকে তিরস্কার করা হইয়াছে।

৯। বররুচি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার আর একটি প্রসিদ্ধ রত্ন। এই মনীষীর কোন লিখিত জীবনবৃত্তান্ত নাই। তবে তিনি যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক এবং খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা সুনিশ্চিত। কারণ, বিক্রমাদিত্য কালিদাস ও বররুচি এই সুধীত্রয়ের একত্র সমাবেশে সংঘটিত ঘটনা সংক্রান্ত দুই একটি কিংবদন্তী বিদ্বৎ-সমাজে প্রচারিত আছে। অনেকের বিশ্বাস বররুচি মগধ প্রদেশের অধিবাসী কিন্তু উহা অসম্ভব নহে (১) বররুচি কোন্ গ্রাম বা নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাঁহার মাতা পিতার নাম কি, তিনি কোথায় বিদ্যা লাভ করেন, কি উপায়েই বা নবরত্নসভায় প্রবেশ লাভ কবিয়াছিলেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও জানা যায় না। কথিত আছে;—বররুচির কোনরূপ অসাধারণ প্রতিভা ছিলনা, তিনি কেবল পরিশ্রমের গুণে নিখিল শাস্ত্র

(১) দূরে মার্গান্নিবসসি পুনঃ কণ্টকৈরাবৃতোঽসি,
ছায়াশূন্যঃ ফলমপিচ তে বানরৈরপ্যভক্ষ্যম্।
নির্গন্ধস্থং মধুপরহিতঃ শাল্মলে সারশূন্যঃ
সেবাস্মাকং ভবতি বিফলা তিষ্ঠ নিঃশঙ্ক যামঃ॥
(মহাকবি-বেতালভট্ট-বিরচিতং নীতিপ্রদীপকাব্যম্)

(১) পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর বৃত্তিপ্রেণেতা বররুচি মগধ প্রদেশের কুসুমপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ খ্যাতি ছিল, বোধ হয় সেই খ্যাতনামা মনীষীর নাম তাঁহার দেশবাসীরা পরেও সাদরে গ্রহণ করিত। নবরত্নসভার বররুচির পিতাও বোধ হয় প্রাচীন বররুচির নাম-মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া নিজ পুত্রের নাম বররুচি রাখিয়াছিলেন। প্রাচীন বররুচির অপর নাম কাত্যায়ন। কাত্যায়ন-বররুচির বৃত্তান্ত কথাসরিৎসাগর বৃহৎকথামঞ্জরী স্থবিরাবলীচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যাঁহারা কেবল পরিশ্রমবলে জগতে বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, বররুচি তাঁহাদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত স্থানীয়।

বররুচি-সংক্রান্ত একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাস ও বররুচির রচনানৈপুণ্য পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহার মাতৃভাষায় বলেন "শুষ্ক কাষ্ঠ সম্মুখে রহিয়াছে"—এই অংশের আপনারা উভয়ে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করুন। বররুচি কিছু ক্ষণ চিন্তা করিয়া উহার অনুবাদ করিলেন কিন্তু উহা রসভাবপ্রিয় বিক্রমাদিত্যের মনোমত হইল না। তাহার পর, কালিদাস উহার অনুবাদ করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ঐ অনুবাদ শ্রবণে অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। নিম্নে উভয় অনুবাদই উদ্ধৃত হইল (১) বররুচির প্রণীত অনেক গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে সংস্কৃতভাষায় লিখিত পত্রকৌমুদী, পুষ্পসূত্র, যোগশতক, রাজনীতি, রাক্ষসকাব্য এবং প্রাকৃতভাষায় লিখিত প্রাকৃতপ্রকাশ তাঁহার প্রণীত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

---

(১) শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে। (বররুচিঃ।)

(১) নীরসতরুবরঃ পুরতো ভাতি। (কালিদাসঃ।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উজ্জয়িনীতে পৌঁছিয়া পুরাতত্ত্বের আলোচনায় অনেক সময় ব্যয়িত হইয়াছে, এই বার প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। শেঠের গৃহে সঙ্গের আস্‌বাব রাখিয়া শিপ্রাস্নানে চলিলাম। এখানে তীর্থস্নানে ও তীর্থশ্রাদ্ধে যে সকল দ্রব্য লাগে তীর্থপুরোহিত শেঠের নিকট হইতে সে সমুদয় সংগ্রহ করিয়া লইলেন। শিপ্রার খাত নিতান্ত অপ্রশস্ত নহে, উহা প্রায় কিছু কম সিকি মাইল হইবে। কিন্তু প্রবাহ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, বৈশাখমাসে কালীঘাটের গঙ্গার জলপ্রবাহের বিস্তার যতটা, শিপ্রার প্রবাহ তদপেক্ষা অধিক বিস্তৃত নহে। শেঠের গৃহ হইতে বাহির হইয়া ঢালু রাস্তাদিয়া ক্রমে নদীগর্ভে উপনীত হইলাম। পার্ব্বত্যভূমি বলিয়া নদীগর্ভ ও পাষাণময়। সারি সারি প্রস্তর-নির্ম্মিত ঘাট, সিঁড়ীগুলি বিলক্ষণ দৃঢ়। প্রত্যেক ঘাটের উভয় দিকে আহ্নিক পূজার জন্য প্রস্তর-নির্ম্মিত গোলাকৃতি স্থান আছে। শিপ্রা বৈদিক কালের পুণ্যনদী। পুরাণে বর্ণিত আছে ;—

"মহর্ষি বশিষ্ঠ যথাবিধি অরুন্ধতীর কর গ্রহণ করিয়া অতিশয় পরিতোষ লাভ করিলেন। বিবাহের যজ্ঞ শেষ হইলে অনেক শান্তি-জল অবশিষ্ট রহিল। ঋত্বিক্ উহা ঢালিয়া ফেলিলেন। ঐ জল অত্যন্ত বেগে হিমাদ্রির শৃঙ্গ হইতে গুহায় এবং গুহা হইতে সরোবরে আসিয়া পতিত হইল। বিষ্ণু সেই সরোবর-দুহিতা শিপ্রাকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিলেন, তাহাতেই মধ্যভারতে শিপ্রার আবির্ভাব হইয়াছে"।

শিপ্রার পৌরাণিক জন্মবৃত্তান্ত ঐরূপ বটে কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, এই পবিত্রতোয়া স্রোতস্বতী অনতিদূরবর্ত্তী পারিযাত্র পর্ব্বত

হইতে নির্গত হইয়া চর্ম্মণ্বতী (১) নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিকগণ শিপ্রার স্ফটিকনিভ স্বচ্ছজল দেখিয়াই বোধ হয় যজ্ঞীয় পবিত্র শান্তিজল হইতে এই নদীর উদ্ভব কল্পনা করিয়াছেন। ভারতের বহু দেশে পর্য্যটন করিয়াছি কিন্তু এমন পবিত্র নির্ম্মল জল কোথাও প্রত্যক্ষ করি নাই। উজ্জয়িনীতে শিপ্রার অনেক তীর্থঘাট আছে। তন্মধ্যে দত্তাত্রেয়ঘাট পিশাচমুক্তেশ্বরঘাট দশাশ্বমেধঘাট গন্ধর্ব্ববতীঘাট সিদ্ধনাথঘাট রামঘাট মঙ্গলাঘাট ছত্রিঘাটপ্রভৃতিই সমধিক প্রসিদ্ধ। আমি যে ঘাটে স্নান করি, উহার নাম রামঘাট। ঐ ঘাটটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর এবং প্রশস্ত। অসংখ্য দণ্ডী পরমহংস গৃহস্থ গৃহস্থমহিলা স্নান-পূজায় নিরত আছেন। এখানে জলের গভীরতা ছয় সাত হাতের ন্যূন নহে কিন্তু উহার স্বচ্ছতা অসামান্য। দর্পণে যেরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেই রূপ সন্তরণশীল গৌরাঙ্গ বালক বালিকাদের দেহের সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য গভীর জল মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে। বিমল স্রোতে শ্বেত পীত লোহিত নানাবর্ণের পুষ্প ভাসিয়া যাওয়ায় নদীর কেমন এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে শিপ্রাভেটের নারিকেল যেই জলে পতিত হইতেছে, আর অসংখ্য বালক বালিকা গিয়া তাহার উপর পড়িতেছে। কেহ কেহ বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়া সেই নিতান্ত শুষ্ক ক্ষুদ্র নারিকেল আত্মসাৎ করিতেছে। শিপ্রাকূলে এই সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীতে কত যুগযুগান্তর পূর্ব্বে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তাহার পর, এই নগরীবক্ষে কত রাজবিপ্লব ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে কিন্তু ইহার সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকু এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। স্নানার্থীদের ব্যবহারে আমি

(১) চর্ম্মণ্বতী—চম্বলনদ।

উহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইলাম। ঘাটে যাইবার পথে পুরুষ ও মহিলাগণ উত্তম উত্তম বসন-ভূষণ কমণ্ডলু এবং পূজোপকরণ হস্তে কেমন প্রশান্তভাবে গমনাগমন করিতেছেন। সাক্ষাৎ হইলেই পুরুষেরা যথাযোগ্য নমস্কার প্রণাম প্রতিনমস্কার আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আপ্যায়িত করিতেছেন। এমন কি, আপন আপন প্রতিবেশী, যাঁহাদের সহিত দিবসে দশবার দেখা হয়, তাঁহারাও উক্ত ব্যবহার-পালনে পরাঙ্মুখ নহেন। শাস্ত্রী পণ্ডিতদের সুন্দর গৌরাঙ্গ দেহ, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে অনুলিপ্ত, ললাটে আপন আপন সম্প্রদায়ের অনুরূপ তিলক, পরিধানে ক্ষৌম বসন ও উত্তরীয়, বক্ষঃস্থলে শুভ্র উপবীত, শিখায় পুষ্প, হস্তে কমণ্ডলু, যেন এক একটি মূর্ত্তিমান্ সাত্ত্বিকভাব। পুরললনাদের ব্যবহার আরও মধুর। পরস্পর দেখা হইলে হাঁসিমুখে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন। সে মধুর হাঁসি, ধীরে ধীরে মিষ্টালাপ, মৃদুমধুর সঙ্কোচ ভাব অবর্ণনীয়। এখানকার মহিলারা দুই প্রকার নিয়মে পরিচ্ছদ পরিধান করেন। মালবী মহিলারা প্রায়ই গৌরাঙ্গী। তাঁহারা গ্রীষ্মোপযোগী সূক্ষ্ম বসন দিব্য কুঁচাইয়া পরেন। বক্ষঃস্থলে রঙ্গিন আঙ্রাখা, অতি সূক্ষ্ম সুন্দর চাদরে অবগুণ্ঠন ও অঙ্গাবরণ সম্পাদিত হয়। ললাটে চন্দনের ফোঁটার মধ্যে ক্ষুদ্র সিন্দূরের টিপ্, কাণে মাক্ড়ী, গলায় হার, কাঁকালে চন্দ্রহার এবং পায়ে মল পরিধান করিয়া থাকেন। এখানকার উপনিবেশি-মহারাষ্ট্র-মহিলারা অবগুণ্ঠন ব্যবহার করেন না, কিন্তু কাছা দেন। আর প্রত্যেকের মস্তকের বেণীতেই একটি করিয়া সুবর্ণের চন্দ্রক শোভা পায়। স্নান ও তীর্থকৃত্য শেষ হইলে তীর্থপুরোহিতকে বিদায় করিয়া বাসায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। স্নানের পূর্ব্বে সঙ্কল্পমন্ত্র পাঠ করিয়া পরে শিপ্রাম্ভে প্রদান করিতে হয়। সঙ্কল্পমন্ত্রটি ঐতিহাসিক স্মৃতির পরিচায়ক। উহাতে জম্বুদ্বীপ ভারতখণ্ড অবন্তিদেশ শিপ্রানদী পূর্ব্ববর্ত্তী

ও আধুনিক নরপতিগণের অধিকারকাল, স্নানার্থীর কামনা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই উল্লেখ আছে। শিপ্রাকে প্রণিপাত করিয়া যখন নগরীর দিকে মুখ ফিরাইলাম, তখন কি যে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নপথে উদ্ভাসিত হইল, তাহা লেখনীর সাহায্যে ব্যক্ত করা অসম্ভব।



শিপ্রাতীর হইতে উজ্জয়িনীর দৃশ্য

আধুনিক অনেক নগরীর বাহিরের মনোহর শোভা প্রত্যক্ষ করিয়াছি,

কিন্তু ইহার সহিত সে সমুদয়ের উপমা হয় না। ঐ সকল শোভায় নয়নের কৌতূহল নিবৃত্তি হয় বটে কিন্তু এমন ভক্তি-মিশ্রিত ভাবোদয় হয় না। এই প্রাচীন নগরীর দৃশ্যের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিলে পুরাকালের কত ঐতিহাসিক স্মৃতিই যে মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। নদীগর্ভের প্রান্তসীমায়, ঈষৎ বক্র তীর প্রদেশ দিয়া প্রাচীন তরুরাজি-পরিবৃত অসংখ্য জীর্ণমঠ অট্টালিকা দেবালয় সকল কত কত নরপতি ও পুণ্যাত্মা মানবের স্মৃতি বক্ষে করিয়া সুদীর্ঘকাল হইতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? কালের নির্ম্মম হস্তে এক একটি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, আর তাহার সহিত দিন দিন কত কীর্ত্তিমান্ পুরুষ এবং কত যশস্বিনী রমণীর স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। নগরীর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বাসায় ফিরিলাম। শেঠ পূর্ব্ব হইতেই পূজোপকরণ সাজাইয়া রাখিয়াছিল. উহা লইয়া পাণ্ডার সহিত মহাকালের মন্দির অভিমুখে চলিলাম।

শেঠের গৃহ হইতে মহাকাল-স্থান প্রায় অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে। নদীর ধারে ধারে জঙ্গলাপথ বাহিয়া মহাকালের মন্দিরে উপনীত হইলাম। ওঃ কি বিশাল মন্দির! উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের মন্দির ব্যতীত এরূপ সুবৃহৎ মন্দির পূর্ব্বে আর কোথায়ও দেখি নাই। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা ইহার আকার অনেক বৃহৎ। কতকাল পূর্ব্ব হইতে মহাকাল এখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহার নির্ণয় হয় না। তবে যখন অবন্তীতীর্থ এবং উজ্জয়িনী নগরীর নামকরণ হয় নাই, তখনও শিপ্রাতীরবর্ত্তী এই মহাকালের অধিষ্ঠিত স্থানকে "মহাকাল-স্থান" বলিত। মহাভারতের বনপর্ব্বে মহাকাল-স্থলের উল্লেখ আছে। মহর্ষি পুলস্ত্য ভীষ্মের নিকট তীর্থবর্ণন-প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—"অনন্তর সংযত হইয়া মহাকাল-স্থলে গমন করিবে। (তত্রত্য)

কোটিতীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় (১)।" অতএব মহাভারতীয় যুদ্ধকালে চারি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেও মহাকাল-স্থান ভারতীয় জনসাধারণের নিকট মহাতীর্থ বলিয়া পরিচিত ছিল। পুরাণেও মহাকালের বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত দেখা যায় (২)। কালিদাস রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর বর্ণন-কালে অবন্তীরাজের পরিচয়স্থলে মহাকালের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (৩)। পরবর্ত্তী সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থে. মহাকালের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। ফিরিস্তা নামক মুসলমান-ইতিহাসে মহাকাল-মন্দিরের সুন্দর বর্ণনা আছে। উহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"এই মন্দিরের বৃহৎ সুবর্ণস্তম্ভ-সকল মণিমাণিক্য খচিত ছিল। গর্ভগৃহ-মধ্যে একটি সামান্য আলোক জ্বালাইয়া দিলে, সেই আলোক অসামান্য হীরকে প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত মন্দির যেন সূর্য্যালোকের মত উজ্জ্বল করিয়া তুলিত।"

কথিত আছে ;—দিল্লীর মুসলমান্ সম্রাট্ আলতমাস্ কর্ত্তৃক মন্দিরের সমস্ত মণিমাণিক্য-রত্নাদি লুণ্ঠিত ও মন্দির বিধ্বস্ত হয়। এখন এই মন্দিরের প্রধান দর্শনীয় পদার্থ স্বর্ণকলস। মন্দিরের

---

(১) মহাকালং ততো গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
কোটিতীর্থমুপস্পৃশ্য হয়মেধফলং লভেৎ ॥
(মহাভারত বনপর্ব্ব।)

(২) মৎস্যপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ পাঠ করুন।

(৩) অসৌ মহাকালনিকেতনস্য
বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ।
তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভিঃ,
জ্যোৎস্নাবতো নির্বিশতিপ্রদোষান্।
(রঘুবংশ।).

চূড়াস্থিত উজ্জ্বল সুবর্ণময় কুম্ভ বহুদূর হইতে দর্শক-গণের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিয়া থাকে। এখন আর মহাকাল এই অভ্রভেদী মন্দিরে বিরাজমান নহেন। যে দিন মন্দির অপবিত্র হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব হইতে উহা দেবতা-শূন্য। সম্ভবতঃ সম্রাট্ আলতমাসের আক্রমণের সম্ভাবনা দেখিয়াই উজ্জয়িনীর অধিবাসিগণ বৃহৎ মন্দিরের অনতিদূরে দক্ষিণদিকে ভূমিগর্ভে একটি পাষাণময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে মহাকালকে রাখিয়াছিলেন। অদ্যাপি তিনি সেই খানেই অধিষ্ঠিত আছেন। সুরঙ্গপথে সিঁড়ী বাহিয়া নীচে নামিলেই ঐ মন্দির প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গের সম্মুখভাগে প্রায় ত্রিশটি নরনারী পূজায় নিরত আছেন। চতুর্দ্দিকে দপ্ দপ্ করিয়া ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। ধূপ ধূনা ও পুষ্পের সৌরভে মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ আমোদিত। ভূগর্ভে সুরঙ্গ-পথ ব্যতীত বায়ু প্রবেশের সম্ভাবনা নাই, অধিকক্ষণ থাকিলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে, তথাপি মহাদেবের বামপার্শ্বে কয়েকটি গৌরাঙ্গী ব্রাহ্মণমহিলা কেমন নিশ্চিন্তভাবে ভক্তিপূত-অন্তঃকরণে কৃতাঞ্জলি হইয়া মহিম্ন-স্তব আবৃত্তি করিতেছেন। আমি রমণীকণ্ঠে ঐরূপ মধুর স্তব-আবৃত্তি আর কখনও শুনি নাই। পূজা শেষে কয়েকটি ভক্তের সহিত উপরে উঠিলাম। দুইটি পথ না থাকায় যাতায়াতে বাধা পাইতে হয়, সুতরাং বায়ুর অভাবে বড় কষ্ট বোধ হয়। উপরে আসিয়া কিছু ক্ষণ বিশ্রামের পর, সেই গগনস্পর্শী পুরাতন মন্দির দেখিতে গেলাম। এরূপ বৃহৎ ও কারুকার্য্য-শোভিত মন্দির ভারতবর্ষে অতি অল্পই আছে। এখন ঐ মন্দির-গাত্রে হীরক-মণিমাণিক্য কিছুই নাই, কেবল আছে আততায়ীর করচিহ্ন। খ্রীষ্টীয় ১২১০ অব্দ হইতে ১২৩৬ অব্দ পর্য্যন্ত আলতমাসের রাজ্যকাল। অতএব উক্ত মুসলমান সম্রাট্

কর্তৃক বিধ্বস্ত এই মন্দির প্রায় সাতশত বৎসর দেবতার অধিষ্ঠানে বঞ্চিত আছে। বহুকাল হইতে মন্দিরের প্রধান দ্বার অবরুদ্ধ, বারান্দায় চৌকীতে বসিয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণ বেদপাঠ ও চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণের সহিত সংস্কৃত ভাষায় অনেকক্ষণ কথোপকথন হইল। তাঁহাদের মুখে উজ্জয়িনীর অনেক প্রাচীন কাহিনী শুনিলাম। তাঁহারা বলিলেন ;—দেবাসের পরমার ভূপতিগণ গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, বড়োদার গায়কবার এবং ইন্দোরের হোলকরের অর্থসাহায্যে মহাকালের সেবা সম্পন্ন হয়। এই সকল নরপতি পুরাকাল হইতে নিয়মিতরূপে প্রচুর মাসিক বৃত্তি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য রাজা এবং ধনিকগণের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে। মহাকালের মন্দিরের দক্ষিণ দিকে কিছুদূর গেলেই কেদারেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। এই মন্দিরটি বারাণসীধামের কেদার-মন্দির অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্র কিন্তু স্থানীয় লোকের ধারণা ইহা বারাণসীর কেদারেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা অনেক পুরাতন। এই মন্দিরে কেদারেশ্বরনামা এক শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। ইঁহার পূজার অনুষ্ঠানও নিতান্ত আড়ম্বরশূন্য নহে। উজ্জয়িনীতে কেদারেশ্বরের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে ;—

একদা হিমালয়বাসী ঋষিগণ মহাদেবের নিকট আসিয়া বলেন ;— "দেবদেব! আমরা দারুণ হিমে অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, আর সহ্য হইতেছে না, আপনি যাহা হয় করুন"। ঋষিদের কাতর প্রার্থনায় করুণা-পরবশ হইয়া মহাদেব গিরিরাজ হিমালয়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরিবর! চিরকালই কি আমার বাসস্থানে এই রূপ দারুণ হিম থাকিবে, এ হিমের কি অবসান নাই?" হিমালয় কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন ;—"দেবদেব! আপনি আমার উপরে আসিয়া বাস করুন।

আমি আটমাস শীতের প্রভাব কমাইয়া দিব।” মহাদেব তাহাতেই সম্মত হইলেন, তিনি গিরিশৃঙ্গের একটি উষ্ণ কুণ্ডের নিকট আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণও সেখানে আসিয়া বাস করিলেন এবং নূতন স্থানে সমাগত মহাদেবকে কেদারেশ্বর নাম প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কেদারেশ্বরের প্রকাশ হইল। কালক্রমে মানুষের পাপে পৃথিবী কলুষিত হইল, সুতরাং কেদারেশ্বরও সেখান হইতে অন্তর্ধান করিলেন। ঋষিরা কেদারেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে আসিয়া দেখিলেন, কেদারেশ্বর তথায় নাই। তাঁহারা অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিতে লাগিলেন—“হায় আমরা কোথায় গেলে সেই হৃদয়েশ্বরের সাক্ষাৎ পাইব, আর কি তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে দেখা দিবেন, তিনি ব্যতীত কে আমাদের হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিবে?” সহসা দৈববাণী হইল, মহাকাল-বনে গমন কর, সেখানে শিপ্রা নদীর তীরে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। ঋষিরা উল্লসিত-হৃদয়ে মহাকাল-স্থলে আগমন পূর্ব্বক শিপ্রাতীরে বসিয়া ভক্তিপূত-হৃদয়ে স্তব আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে স্রোতস্বতীর বক্ষে এক শিলা ভাসিয়া উঠিল, ঋষিগণ তাঁহাকেই কেদারেশ্বর-লিঙ্গ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। সেই সময় হইতে উজ্জয়িনীতে কেদারেশ্বরের আবির্ভাব হইয়াছে।

কেদারেশ্বর দর্শন করিয়া পাণ্ডার সহিত কালীয়-দীঘী অভিমুখে চলিলাম। পূর্ব্বে নাকি উজ্জয়িনীতে রুদ্রকুণ্ড প্রভৃতি দ্বাদশটি সরোবর ছিল। উহার অধিকাংশ লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কয়টি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহাও গ্রীষ্মকালে জলহীন শুষ্কপ্রায় হইয়া থাকে। আমরা ঐ সকল সরোবরের মধ্য দিয়া চলিলাম। স্থানে স্থানে স্বল্প জলে বিকসিত অসংখ্য শ্বেত ও লোহিত পদ্ম বায়ুভরে বিকম্পিত হইয়া মধ্যাহ্ন-সূর্য্যকিরণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কোথায়ও কর্দ্দমাক্ত

ভূমি, কোন কোন জায়গায় বা শ্যামল দূর্ব্বাক্ষেত্রে গো মেষ মহিষ বিচরণ করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে কালীয়-দীঘীতে উপনীত হইলাম। কেহ কেহ বলেন;—"স্কন্দপুরাণে অবন্তীতীর্থে যে ব্রহ্মকুণ্ডের উল্লেখ আছে, কালক্রমে উহাই কালিয়-দীঘী নাম ধারণ করিয়াছে।" ঐ দীঘীর মধ্যস্থলে দ্বীপাকার ভূমিখণ্ডের উপর একটি মনোহর জল-প্রাসাদ বিরাজিত। পূর্ব্বে ঐ প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে কয়েকটি ফোয়ারা ছিল, এখন উহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ প্রাসাদের প্রাচীর-গাত্রে কালীয় নাগের মস্তকোপরি শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃশ্যটি অত্যন্ত মনোহর। এই জলপ্রাসাদের নির্ম্মাতা কে? তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, উহা উজ্জয়িনীর অধিপতি কোনও বিক্রমাদিত্যের নির্ম্মিত। প্রকৃতপক্ষেও এই প্রাসাদ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞায় নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। সম্ভবতঃ এই জলপ্রাসাদ অবলোকন করিয়াই তাঁহার প্রিয় বয়স্য মহাকবি কালিদাস ঋতুসংহার কাব্যে গ্রীষ্মবর্ণন-প্রসঙ্গে জলযন্ত্র-মন্দিরের বর্ণনা করিয়াছিলেন (১)। এই প্রাসাদ কি অপূর্ব্ব উপাদানে রচিত! সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া জলস্রোত নির্গত হইতেছে তথাপি উহার কণামাত্র বিনষ্ট হয় নাই।

কালিয়দীঘী ত্যাগ করিয়া অনতিদূরবর্ত্তী হর্ষদ্বীপে উপনীত হইলাম। উহা যথার্থই দ্বীপাকার, উহার চতুর্দ্দিকে বহুদূরব্যাপী সরোবর ছিল, এখন শুকাইয়া গিয়াছে। দ্বীপের মধ্যভাগে উন্নত দেবমন্দিরে

(১) নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ
ক্বচিদ্ বিচিত্রং জলযন্ত্র-মন্দিরং।
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং
শুচৌ প্রিয়ে যান্তি জনস্য সেব্যতাম্॥২॥
(ঋতুসংহারকাব্যম্)

লেলিহরসনা পাষাণময়ী কালিকামূর্ত্তি বিরাজিত। একজন অধ্যাপকের (১) মুখে শুনিয়াছিলাম "তন্ত্রসারপ্রণেতা নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ কালিকাদেবীর বর্ত্তমান মূর্ত্তির প্রচার করেন।" আগমবাগীশ বর্ত্তমান সময় হইতে কিঞ্চিৎ অধিক দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হর্ষদ্বীপের এই কালিকা-মূর্ত্তি দেড় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। ঐ প্রতিমা দেখিয়া আমার পূর্ব্ব সংস্কার দূর হইল। কথিত আছে ;—মহারাজ হর্ষবিক্রমাদিত্য এই কালিকা-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা। স্থাণ্বীশ্বরের অধীশ্বর মহারাজ শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সাম্রাজ্য লাভ করেন। তিনি নাকি মালবেশ্বরগণকে পরাজিত করিয়া কিছুকাল উজ্জয়িনীতে অবস্থানপূর্ব্বক মালবদেশ শাসন করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষ প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন, প্রবীণ বয়সে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহা দ্বারা না হউক, তাঁহার সময়ে কিংবা তাঁহার কিছুকাল পরে যে হর্ষদ্বীপে এই কৃষ্ণপাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অনেক কালিকামূর্ত্তি দেখিয়াছি কিন্তু এরূপ পূর্ণাবয়বা ভীষণমূর্ত্তি কখনও নয়নগোচর করি নাই। দেবালয়ের দ্বারদেশে সশস্ত্র প্রহরী বিদ্যমান এবং কতিপয় দেবল-ব্রাহ্মণ মন্দিরের পূজা সম্পাদন করিয়া থাকে। উহাদের মুখে শুনিলাম, অনেক রাজা এবং ধনীর অর্থে দেবীর সেবা-নির্ব্বাহ হয়।

বেলা একটার সময় ফিরিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য শেষ করিলাম। বিশ্রামান্তে উঠিয়া দেখি, আমার তীর্থপ্রদর্শক খাণ্ডেবালা-ব্রাহ্মণবালক বসিয়া আছে। বৃদ্ধ শেঠ ঐরূপ রৌদ্রে বাহির হইতে নিষেধ করিল, সুতরাং কিছুক্ষণ বসিয়া শেঠ ও তাহার পত্নীর মুখে তাহাদের সাংসারিক সুখ

(১) ঐ অধ্যাপকের নাম শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অজিতনাথন্যায়রত্ন। ইনি আগমবিদ্যাবাগীশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহস্রাক্ষের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

দুঃখের কাহিনী শুনিলাম। তাহার পর, রৌদ্রের তেজ থাকিতেই বাহির হইয়া পড়িলাম। আমরা ঠিক নদী-প্রবাহের ধারে ধারে উত্তরাভিমুখে চলিলাম। যদিও অবন্তীরই নামান্তর উজ্জয়িনী, তথাপি মহাকালের মন্দির যে অংশে অবস্থিত, স্থানীয় লোকে ঐ অংশকে উজ্জয়িনী ও উহার উত্তরাংশকে অবন্তী নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কিছুক্ষণ গমনের পর জলের ধার ত্যাগ করিয়া তীরে উঠিলাম। এবং অনেকক্ষণ ভ্রমণের পর ভর্তৃগুহা প্রাপ্ত হইলাম। গুহাটি ঠিক শিপ্রা-নদীর তীরে অবস্থিত। তিন দিকে তরু-গুল্ম-পরিবৃত বন-ভূমি, পশ্চিমে শিপ্রার স্রোত রজতধারার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। নিকটে লোকালয় নাই, স্থানটি সম্পূর্ণ নির্জ্জন। এখানে দুইটি মন্দির আছে। পশ্চিম দিকের মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিন্তু চূণকাম করা সাদা ধব্ধবে। বোধ হয় গুহার অধিকারীর অবস্থানের জন্য অল্পদিন নির্ম্মিত হইয়াছে। উত্তরদিকের দক্ষিণদ্বারী মন্দিরটি অতি প্রাচীন এবং বৃহৎ। একটি প্রাচীর দ্বারা প্রাঙ্গণভাগ ঘেরা। আমি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া প্রথম বুঝিতেই পারিলাম না, এই সমতল ভূমিতে গুহা কোথায় আছে। প্রদর্শক বালক ক্ষুদ্র মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কিরূপ এক অবোধ্য ভাষায় গুহাধিকারীকে ডাকিল। তৎক্ষণাৎ জটাশ্মশ্রু-পরিবৃত কৌপীনমাত্র-পরিধায়ী এক খর্ব্বাকৃতি সন্ন্যাসী গৃহ-মধ্য হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার নিকট গুহা দর্শনের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে তিনি একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। তাহার পর, বড়মন্দিরের বারান্দায় গিয়া মন্দিরের কপাট খুলিয়া আমাকে ভিতরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি ও খাণ্ডেবালা-ব্রাহ্মণকুমার অন্ধকারময় মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলে একটী প্রদীপ জ্বালা হইল। তাহার পর, সন্ন্যাসী মন্দিরের মেঝে হইতে একখানি পাষাণ-খণ্ড সরাইয়া সুরঙ্গ-পথে সিঁড়ী বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন,

এবং আমাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন। আমি, খাণ্ডেবালা-ব্রাহ্মণ-বালকের সহিত নামিতেই সন্ন্যাসী ঐ বালককে যাইতে নিষেধ করিলেন এবং হিন্দী ভাষায় বলিলেন, "ও কেন যাইবে? ও কতবার গুহা দেখিয়াছে,"। কিন্তু এই ক্ষণমাত্রপরিচিত কঠোর-দৃষ্টি সন্ন্যাসীর সহিত একাকী যাইতে আমার সাহস হইল না, অনেক অনুনয় করিয়া বালককে সঙ্গে লইলাম। সন্ন্যাসী একতলায় নামিয়া সেখানকার মূর্ত্তিগুলি দেখাইয়া দোতলায় অবতরণ করিলেন। এ দিকে বায়ুসঞ্চার-রহিত ভূগর্ভে অবস্থান করায় আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। মনে করিয়াছিলাম দোতলার মূর্ত্তিগুলি দেখা হইলেই অব্যাহতি পাইব কিন্তু সন্ন্যাসী যখন তেতলার সিঁড়ীতে নামিতে লাগিলেন, তখন প্রাণ শুকাইয়া গেল। আমি অগ্রসর হইতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু সন্ন্যাসী অটল স্থিরপ্রতিজ্ঞ। তিনি বোধ হয় ভাবিলেন, 'দোতলা পর্য্যন্ত দেখিয়া তাহার প্রাপ্যই দিবে, তেতলার পয়সা ত আর দিবে না, অতএব তেতলা পর্য্যন্ত না দেখাইয়া ছাড়িব না।' আমি আর সন্ন্যাসীর সহিত বিতণ্ডা করিতে ইচ্ছা করিলাম না, কেবল মনে হইতে লাগিল—"যদি দৈবাৎ সন্ন্যাসীর পদস্খলন হয়, তাহা হইলেই দীপ নিবিয়া যাইবে, সুতরাং গাঢ় অন্ধকারে এই ভীষণ গোলোকধাঁধা অতিক্রম করিয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অতএব এই ভর্ত্তৃগুহায়ই চিরকালের জন্য সমাহিত হইতে হইবে।" তাহার পর, অনিচ্ছাসত্ত্বে তেতলায় অবতরণ করিলাম। সেখানকার মূর্ত্তিগুলি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। সন্ন্যাসী এক একটি মূর্ত্তির নিকটে লইয়া গিয়া এখানে দুপয়সা চড়াও, ওখানে চারি পয়সা চড়াও ইত্যাদি আদেশ করিতে লাগিলেন। আমার কোমরে থলিতে নোট টাকা আধুলি সিকি দুআনী পয়সা ইত্যাদি এরূপ দৃঢ় ভাবে বদ্ধ ছিল যে, ইচ্ছা করিলেও সত্বর বাহির করিবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং

অত্যন্ত অনুনয় সহকারে বলিলাম,—"পয়সার জন্য কোন গোল হইবে না, উপরে গিয়া সমস্ত হিসাব করিয়া দিব, শীঘ্র উপরে চলুন।" সন্ন্যাসী নিরাশভাবে বলিলেন ;—"এ সকল ধর্ম্মকর্ম্ম, ইহাতে জবরদস্তি চলে না, দেওয়া না দেওয়া তোমার মর্জি।" আমি আর কোন কথা বলিলাম না, তেতলার মূর্ত্তি-গুলি দেখা শেষ হইলে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া অপ্রশস্ত সিঁড়ী বাহিয়া অতিকষ্টে নিতান্ত নির্জীব অবস্থায় উপরে উঠিলাম। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, শরীর অবসন্ন, বারান্দায় আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর অগ্রে সন্ন্যাসীর পয়সা হিসাব করিয়া দিয়া তাঁহার নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করিলাম। সন্ন্যাসী ইঁদারা হইতে নির্ম্মল সুশীতল জল তুলিয়া আদর পূর্ব্বক পান করিতে দিলেন। জল পানের পর, সন্ন্যাসীর সহিত কিছুক্ষণ গুহা ও তাহার মধ্যস্থিত প্রাচীন মূর্ত্তি-সংক্রান্ত কথোপকথন হইল। ভূগর্ভস্থ পাষাণময় অট্টালিকার গৃহে গৃহে যে সকল প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, উহার প্রত্যেক মূর্ত্তিই উপবিষ্ট এবং ধ্যানমগ্ন। ঐ সকল মূর্ত্তি, ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সন্ন্যাসী কিন্তু ঐ সকল মূর্ত্তিকে বিষ্ণুর দ্বাবিংশতি অবতারের অন্যতম 'দত্তাত্রেয়' বলিয়া পরিচিত করিলেন। একটি প্রধান গৃহে তিনটি মূর্ত্তি দেখিলাম। একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পুরুষ ধ্যান-মগ্ন আছেন। তাঁহার পার্শ্বে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি এবং মস্তকের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে আসনোপরি উপবিষ্ট আর একটি ধ্যানস্থ পুরুষ-মূর্ত্তি। সন্ন্যাসী বলিলেন ;—"নীচে যে পুরুষ ধ্যান-মগ্ন, উনিই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভর্তৃ হরি। উঁহার পার্শ্বে মহিষী পিঙ্গলা এবং মস্তকোপরি গুরুদেব গোরক্ষনাথ"। গোরক্ষনাথের নাম শুনিয়া সন্ন্যাসীর ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধা হইল। দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা নামক সংস্কৃত কাব্য পাঠে অবগত হওয়া যায়—ভর্ত্তৃহরি বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনিই প্রথমে উজ্জয়িনীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন'। কিছুকাল

রাজ্য শাসনের পর, কোন বিশেষ কারণে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তাহার পর, অনুজ বিক্রমাদিত্যকে সিংহাসন প্রদান পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ করেন এবং যোগ অবলম্বন করিয়া মুক্তি লাভের চেষ্টা করেন (১)। যদি বিক্রমাদিত্যকে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর রাজা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বর্ত্তমান সময় হইতে এক হাজার তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা ভর্ত্তৃহরি বিদ্যমান ছিলেন। তখন গোরক্ষনাথ কোথায়? গোরক্ষনাথ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন সিদ্ধপুরুষ। ইনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মহর্ষি পতঞ্জলির যোগ মত প্রচার করিয়া বেড়ান। যোগ-কৌশলে মোহিত হইয়া অসংখ্য লোক ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এখনও সম্ভবতঃ গোরক্ষনাথ-প্রবর্ত্তিত যোগিসম্প্রদায়ের লোক বিদ্যমান আছে। প্রকৃতপক্ষে ভর্ত্তৃগুহা দেখিয়া মনে হইল, ঐ ভূগর্ভস্থ অট্টালিকা বহুকালের প্রাচীন এবং কোন বৌদ্ধ নরপতির নির্ম্মিত। পৃথিবীর কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার জন্য বৌদ্ধ-যোগীরা ঐরূপ গুহা নির্ম্মাণ করাইতেন। শেষে হয় ত ভর্ত্তৃহরি ও তাঁহার মহিষী ঐ বিজন গুহায় অবস্থিতি করিয়া যোগ-সাধনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ঐ ভূমিগর্ভস্থ অট্টালিকা 'ভর্ত্তৃগুহা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ গুহা যে বৌদ্ধদের ছিল, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, গুহা মধ্যে অবস্থিত কোন দেবতারই পূজা হয় না। উঁহারা কেবল দর্শকগণের নয়নের অতিথি হইবার জন্যই চিরকাল উপবাসী অবস্থায় এখানে বিরাজ করিতেছেন। সন্ন্যাসীর বাস-গৃহের বারান্দায় এক শিবলিঙ্গ দেখিলাম, উহা অতি অল্প দিনের বলিয়া মনে হইল।

ভর্ত্তৃগুহা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যটনের

(১) কেহ কেহ বলেন ;—বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ভর্ত্তৃহরিই "বাক্যপ্রদীপ" নামক পদ্যময় সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক ও বৈরাগ্যশতক নামক তিনখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

পর মহর্ষি সান্দীপনির আশ্রমে উপনীত হইলাম। উহার নিকটে অঙ্কপাত নামক একটি তীর্থ স্থান আছে। কথিত আছে;—বলদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ ঐ ক্ষেত্রে প্রথম অঙ্কপাত শিক্ষা করেন। তজ্জন্যই উহা অঙ্কপাত নামে প্রসিদ্ধ। অঙ্কপাতে বিষ্ণুর বিশ্বরূপ মূর্ত্তি বিরাজ-মান। হোল্‌কর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মলহররাও কর্ত্তৃক অঙ্কপাতের ঐ বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মিত হয়। তাঁহার পুত্রবধূ পুণ্যবতী অহল্যাবাইর নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিতে এই তীর্থের দেবপূজা ও অতিথি সৎকার সম্পন্ন হইয়া থাকে। অঙ্কপাত-তীর্থের অনতিদূরে বিষ্ণুসাগর গোমতীকুণ্ড দামোদরকুণ্ড-প্রভৃতি কয়টী জলাশয় বিদ্যমান। ঐ সকল কুণ্ডও অপ্রাচীন নহে। অঙ্কপাত তীর্থ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বাসার দিকে আসিতে বামভাগে পর্ব্বতমালার সন্নিহিত প্রান্তরমধ্যে পাষাণময় অতিপুরাকালের একটি বৃহৎ মন্দির দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। প্রদর্শক বালক বলিল;—"মহারাজ বিক্রমাদিত্য ঐ মন্দিরে বসিয়া শক্তি-সাধনা করিতেন।" প্রদর্শকের কথায় মনে নিতান্ত কৌতূহল জন্মিল। প্রান্তর অতিক্রম করিয়া ঐ স্থানে উপনীত হইলাম। বিজন প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী সেই মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই। মন্দিরের মধ্যে ভিত্তিগাত্রে এক ভয়ঙ্করী কালিকা-মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিলাম। মন্দিরটি বহুকালের পরিত্যক্ত এবং প্রায় অন্ধকারময়ী। এখানে নিত্যপূজা হয় না। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত লোকালয় নাই। শূন্য প্রান্তরে সেই শূন্য মন্দির সুদীর্ঘকাল হইতে পুরাতন স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান আছে।

গ্রীষ্মের দিবা শেষ হইয়াও হয় না। আমরা এই বার বাসা অভিমুখে চলিলাম। যে পথে গিয়াছিলাম, ফিরিবার সময় সে পথ খুঁজিয়া পাইলাম না। ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার শিপ্রাতীরে উপস্থিত হইলাম। অদূরে উজ্জয়িনীর শ্মশান-ভূমি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। নগরীর এই

অংশে পুরাকালের পাষাণময় রাজপথে, লোকের যাতায়াত অতি অল্পই ঘটে। সুতরাং কোথাও বনাকীর্ণ, কোথাও নিম্ন, কোথাও উচ্চ। রাজ-পথের উভয় পার্শ্বে ভগ্ন অর্দ্ধভগ্ন ও বিচূর্ণ অসংখ্য দেবমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। পথের দুইধারে মনসাবৃক্ষ ও ঘনসন্নিবিষ্ট কণ্টকতরু সাগ্রহে হস্ত বাড়াইয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। অতিকষ্টে তাহাদের সাদর আহ্বান অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। উজ্জয়িনী সকল ধর্ম্মের সমাধিভূমি। এখানে পর্য্যায়ক্রমে বৈদিক-ধর্ম্ম বৌদ্ধ-ধর্ম্ম জৈন-ধর্ম্ম ও মুসলমান-ধর্ম্মের বারংবার উত্থান পতন ঘটিয়াছে। কাহারও প্রভাব অল্প নহে, সকলেই আপন আপন পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এক একটি পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং হস্ত-পদ-ভগ্ন দেবমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, আর মনে হইতে লাগিল, একটু দাঁড়াইয়া দেখি কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। বেলা অবসান-প্রায়, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের স্বর্ণ-কিরণ ক্রমশঃ বৃক্ষপত্র হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। খাণ্ডেবালা-বালক বলিল "এখনও অনেক দূর যাইতে হইবে, বিশেষ এই সকল বনপথ নিতান্ত নিরাপদ্ নহে।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই এক বৃহৎ-ফণী, স্তূপাকার দেবমূর্ত্তির মধ্য হইতে শর্ শর্ শব্দে নির্গত হইয়া বনাভিমুখে ধাবিত হইল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখি—তিন চারিটি শৃগাল মুখোমুখি হইয়া রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের দেখিয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর এক একবার ফিরিয়া চাহিতে লাগিল। ঐ সকল ব্যাপার দেখিয়া শঙ্কিত-চিত্তে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমরা যখন শেঠের গৃহে উপস্থিত হইলাম, তখন সূর্য্য অদৃশ্য হইয়াছেন, লোহিত মেঘে পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত হইয়াছে।

উজ্জয়িনীতে গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ বড়ই মনোহর। কালিদাস বহু দিন এই নগরীতে বাস করিয়াছিলেন। তিনি এ মাধুর্য্য বিশেষ ভাবেই

অনুভব করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই বোধ হয় অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রস্তাবনায় অভিনেতাদের মুখে বলিয়াছেন ;—"দিবসাঃ পরিণাম-রমণীয়াঃ" সত্য সত্যই অন্যস্থান অপেক্ষা উজ্জয়িনীর গ্রীষ্মের অপরাহ্ন পরমরমণীয় রাঙ্গা রাঙ্গা মেঘখণ্ড-সকল শিপ্রার অপর পারে বনরাজির উপরে স্তরে স্তরে মাথা উঁচু করিয়া আছে। নীল আকাশে এক একটি করিয়া নক্ষত্র দেখা দিতেছে। বৈকালিক স্নানের পর পুর-মহিলারা নানাবিধ বসনভূষণে ভূষিত হইয়া দীপ-দানের জন্য শিপ্রাতীরে আসিয়াছেন ; শিপ্রার কি মনোহর শোভা হইয়াছে ! জলের নিকট দিয়া সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত দীপশ্রেণী বহুদূর পর্য্যন্ত আলোক বিতরণ করিতেছে। সেই আলোকশ্রেণীর প্রতিবিম্ব জলমধ্যে পতিত হইয়া আরও শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রত্যেক পাড়ার প্রতি ঘাটে এক দল যাইতেছেন, আর এক দল আসিতেছেন। ইঁহাদের যেমন সৌন্দর্য্য তেমনই স্বাস্থ্য, সকলেই যেন প্রফুল্লমুখী। আমি হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া কেবল সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছি, এমন সময় শেঠ-পত্নী দীপ দান করিয়া এক দল বণিক্-মহিলার সহিত গৃহে ফিরিলেন। গোলাপী রঙের সূক্ষ্ম ধৌত বসন দিব্য কুচাইয়া পরিয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণাভরণ, মুখে হাসি ভরা ; আমাকে দেখিয়াই বলিলেন ;—"পণ্ডিতজী ! এখনও বসিয়া আছ, আরতি দেখিতে যাইবে না ?" আমি বলিলাম—"না বাইজী ! সারা দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বড় ক্লান্ত হইয়াছি, আর পারি না।" গৌরাঙ্গী এক গাল হাঁসিয়া বলিলেন ;—"সে কি মহারাজ ! উজ্জয়িনীতে আসিয়া যদি মহাকালের আরতি না দেখিবে, তবে আর দেখিবে কি ?" যেই "মহাকালের আরতি" কথাটি কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তৎক্ষণাৎ কালিদাসের সেই মেঘদূতের কবিতাটি আমার স্মৃতিপথে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিরহী যক্ষ মেঘকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল ;—

না হ'তে প্রদোষ-কাল আগে ভাগে মহাকাল
যাও যদি শুন জলধর।
করো তথা অবস্থান যদবধি নাহি যান,
অস্তাচল দিবস-ঈশ্বর।
আরতি সময়ে তাঁর গরজিয়া বারংবার,
লও যদি পটহের ভার।
মধুর গম্ভীর রব প্রাকৃত যে আছে তব
সফলতা হবে যেনো তার (১)" ॥ ৩৪ ॥

আমি শারীরিক অবসন্নতার কথা ভুলিয়া গেলাম, কোথা হইতে যেন নূতন উৎসাহ আসিয়া আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ঐ দিন সোমবার, সুতরাং মহাকালের আরতির ঘটা অধিক। অসংখ্য নরনারী আরতি দেখিবার জন্য যাইতেছে। আমিও সেই জনস্রোতের সহিত গিয়া মিশিলাম। আমরা যখন মহাকাল-মন্দিরে পৌঁছিলাম, তখনও আরতি আরম্ভ হয় নাই। দর্শনার্থিগণ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সহসা বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল। কতকগুলি ত্রৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ মহাকালের পঞ্চমুখী মুকুট লইয়া মহা-সমারোহে কুণ্ডের (চতুর্দ্দিক্ প্রস্তরখণ্ডে বাঁধান গভীর পুখুরের) অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র-পাঠ ও জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। দুই পাশে পাণ্ডারা ময়ূরপুচ্ছের চামর বীজন করিতে করিতে পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। মুকুট জলাশয় তীরে

(১) অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে,
স্থাতব্যং তে নয়ন-বিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়াম্
আমন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাম্ ॥ ৩৫ ॥

(মেঘদূতম্)

আনীত হইলে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মুকুটকে স্নান করাইলেন। ঐ সময় ভক্ত নরনারীগণের প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। চতুর্দ্দিক্ হইতে "বম্ বম্ মহাকালেশ্বর!" এই রবও সঙ্গে সঙ্গে স্তোত্র-পাঠ ও বেদধ্বনি হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে পুরোহিতগণ মুকুট লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মহাসমারোহে পুনরায় সেই অনতিপ্রশস্ত সুরঙ্গ-পথে ভূগর্ভস্থ মহাকালের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় অত্যন্ত জনতা। আমরা একটু বিলম্ব করিয়া মন্দিরে উপনীত হইলাম। একযোগে অধিক লোকের প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে অধিকাংশ লোকেরই দেখা হয়। আরতিকালে মহাকালের অন্য বেশ হইল। তাঁহার আর দিগম্বরত্ব রহিল না। ঐ সময় গিরিজাপতি কৌষেয় বসন পরিধানপূর্ব্বক মস্তকে মুকুট ধারণ করিলেন এবং মণি-মাণিক্যে বিভূষিত হইয়া গিরিরাজের জামাতৃরূপে দেখা দিলেন। মহাকালের মন্দিরের দীপ-বর্ত্তিকাগুলি ঘৃত কর্পূর ও অগুরু চন্দন দ্বারা রচিত, সুতরাং ঐ সকল দীপ এবং ধূপ ধূনার গন্ধে গৃহটি অত্যন্ত আমোদিত। পূর্ব্বোক্ত পুরোহিত যথাক্রমে পঞ্চপ্রদীপ, বারিপূর্ণ শঙ্খ, ধৌত বসন, বিল্বপত্র ও প্রণিপাত দ্বারা নীরাজন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। আমরা জনসঙ্ঘের চাপে নিপীড়িত হইয়া অতিকষ্টে উপরে উঠিলাম। সুরঙ্গ-পথ হইতে কুণ্ডের তীর ও মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ লোকে লোকারণ্য। বহু লোক কলরব করিতে করিতে মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইল। আমি তাহাদের অগ্রে অগ্রে যাইতে ছিলাম, কিয়দ্দূরে আসিয়া আর কলরব শুনিতে পাওয়া গেল না, পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি সঙ্গিগণ বিভিন্ন পথে চলিয়া গিয়াছে, আমি একাকী। রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে, জঙ্গলা পথ, কি করিয়া চিনিয়া যাইব ভাবিতেছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে আবার একদল মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাওয়া

গেল। ঐ সকল নরনারীর সহিত নিরাপদে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইলে অনতিদূরস্থ কানন হইতে পাখীর অস্ফুট মধুর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। শয্যা ত্যাগ করিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তে স্নানার্থ প্রস্তুত হইলাম। শেষ রাত্রি হইতে শিপ্রা-তীরে লোক-সমাগম হইতে থাকে। অগ্রে অগ্রে পুরযুবতীগণ সঙ্গিনীদের সহিত গল্প করিতে করিতে শিপ্রাস্নানে যাইতেছেন। এই সময়ের শিপ্রা-সমীরণ বড় স্নিগ্ধ, বড় মধুর। মহাকবি যথার্থই বলিয়াছেন ; —

* * * * * * * * * *

* * * * *

মাখিয়া সৌরভ-অঙ্গে প্রফুল্ল কমল সঙ্গে
উষাকালে শিপ্রাসমীরণ।
অনুকূল প্রবাহিয়া তোষয়ে যুবতী হিয়া
দূর করি শ্রান্তি-জন্য-ক্লেশ (১)॥

* * * * * * * * * *

* * * * *

স্নান শেষে যথাক্রমে কালভৈরব সরস্বতী দত্তাত্রেয় চামুণ্ডা মঙ্গলেশ্বর পিশাচমোচনেশ্বর সহস্র-ধনুকেশ্বর-প্রভৃতির মন্দিরে গমনপূর্ব্বক অর্চ্চনাদি শেষ করিয়া পুনরায় নগর ভ্রমণে বাহির হইলাম। কিছু

(১) "দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ॥"

(কালিদাসঃ)

দূরে সিন্দূর ও চন্দন-লিপ্ত একটি প্রাচীন সিংহদ্বার দৃষ্ট হইল। প্রদর্শক বলিল;—"ইহা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজভবনের সিংহদ্বার"। উজ্জয়িনীতে অনেক রাজা, বিক্রমাদিত্য নাম ধারণ করিয়া রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। হয়ত উহা পরবর্ত্তী কোন বিক্রমাদিত্যের ভবনের সিংহদ্বার হইবে। নচেৎ খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্যের রাজ-ভবনের সিংহদ্বার এতকাল এরূপ অবস্থায় বিদ্যমান থাকা অসম্ভব। যাহা হউক, লোকের প্রাচীন বস্তুর প্রতি এতই শ্রদ্ধা যে, প্রতিদিন বহু নর নারী রীতিমত গন্ধ পুষ্প দ্বারা ঐ পাষাণময় প্রাচীরের পূজা করিয়া থাকেন। নগরের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে যোগসিদ্ধ নামক একটি পর্ব্বত আছে। প্রদর্শক বলিল;—"উহারই উপত্যকায় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা-যুক্ত সিংহাসন প্রোথিত ছিল"। যোগসিদ্ধ পর্ব্বতে আরোহণ করিলে উজ্জয়িনীর প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সময়াভাবে উক্ত পর্ব্বতে আরোহণ করা ঘটিল না। পুরাকালে উজ্জয়িনী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়েরও একটি তীর্থক্ষেত্র মধ্যে গণ্য ছিল এবং এখানে অসংখ্য বৌদ্ধমঠ ছিল। এখন সে সমুদয় বিনষ্ট ও পরবর্ত্তী অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধদের ন্যায় উজ্জয়িনী জৈনদেরও একটি মহাতীর্থ এখনও এখানে অনেক জৈনধর্ম্মাবলম্বী বাস করেন। যে সমুদয় জৈনমন্দির শিল্প ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, উহার কয়েকটি এখন হিন্দুদের অধিকারে আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে জবরেশ্বরের মন্দির ও জৈনভঞ্জীশ্বরের মন্দিরই প্রধান। উজ্জয়িনীর আর একটি দৃশ্য সতীস্তম্ভ। প্রত্যেক দেবালয়ের পার্শ্বে প্রাচীন বৃক্ষমূলে সহমৃতাদের স্মরণার্থ সহমৃতাও তাঁহার পতির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। উহার নাম সতীস্তম্ভ। ঐ সকল মূর্ত্তি ক্ষুদ্র এক এক খণ্ড প্রস্তরের উপরিভাগে উৎকীর্ণ। ব্রাহ্মণজাতীয় দম্পতির পার্শ্বে বৃষ ও ক্ষত্রিয়জাতীয়

দম্পতির পার্শ্বে অশ্বমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। পুরকামিনীগণ সতীস্তম্ভের অত্যন্ত আদর করেন। দেবালয়ে পূজা শেষ করিয়া গৃহ গমনকালে গন্ধপুষ্পদ্বারা সতীস্তম্ভের ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

এ প্রদেশে হিন্দুরাজত্বের অবসান হইলে ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নগরী মুসলমান সম্রাট্‌গণের হস্তে ছিল। সম্রাট্‌ আলাউদ্দীন, শূরবংশীয় সম্রাট্‌ আকবর ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া মালব প্রদেশ এবং উজ্জয়িনীর শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে উজ্জয়িনীর অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। উজ্জয়িনীর অধিবাসীরা বলেন ;—"মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের আদেশে প্রাচীন রাজভবন ও দেবমন্দিরের উপাদান দ্বারা অনেক মসজিদ্‌ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সকল মসজিদ্‌ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের অতিরিক্ত আধিপত্যের পরিচায়ক"। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রপতি সুপ্রসিদ্ধ বাজীরাওপেশ্‌ওয়া মালবপ্রদেশ ও উহার রাজধানী উজ্জয়িনী অধিকার করেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইন্দোরের হোল্‌কার ও গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া এই উভয় নৃপতির হস্তে ইহার শাসন-ভার অর্পিত হয়। কিছুকাল পরে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া উজ্জয়িনী অধিকার করিয়া লয়েন। অদ্যাপি এই নগরী গোয়ালিয়রের রাজবংশেরই শাসনাধীন আছে।

বাসায় আসিয়া প্রদর্শকের সহিত পুনরায় বর্ত্তমান রাজভবন দেখিতে গেলাম। উহারও দৃশ্য মন্দ নহে। সুবৃহৎ প্রাসাদের উপরিভাগে লোহিত-বর্ণের পতাকা উড়িতেছে। মহারাজ সিন্ধিয়ার্‌ নিযুক্ত ফৌজদার্‌ (শাসনকর্ত্তা) ঐ প্রাসাদে অবস্থিতি করেন। এখানে বিচারালয়, পুলিস্‌-ষ্টেসন, সৈন্যাবাস, সংস্কৃত-পাঠশালা এবং ইংরাজী কলেজ্‌ আছে। আমরা যখন রাজবাটীর দ্বারে উপস্থিত

হইলাম, তখন সৈন্যদের কাওয়াজ্ হইতেছিল। কিছুক্ষণ কাওয়াজ্ দেখিয়া সংস্কৃতপাঠশালায় উপনীত হইলাম। ঐ বিদ্যালয়ে অন্যূন বত্রিশটি বিদ্যার্থী ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার জ্যোতিষ সাংখ্য বেদান্ত-প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। প্রথমে জ্যোতিষের অধ্যাপক পণ্ডিত নারায়ণজ্যোষীর সহিত বরাহমিহির-সংক্রান্ত অনেক কথোপকথন হইল। তাহার পর, কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত কাশীনারায়ণশাস্ত্রী একটি ছাত্রের দ্বারা আমাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিত কাশীনারায়ণ কাব্যশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তিনি উজ্জয়িনীর অনেক প্রাচীনতত্ত্বের সংবাদ রাখেন। প্রায় এক ঘণ্টাকাল সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার সহিত উজ্জয়িনীর পুরাতত্ত্ব-সংক্রান্ত কথোপকথন হইল। তাহার পর, অধ্যাপকগণের শিষ্টাচারে পরম আপ্যায়িত হইয়া সেস্থান হইতে বহির্গত হইলাম। উজ্জয়িনী-কলেজেও ছাত্রসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ঐ কলেজে বি, এ, ক্ল্যাস পর্য্যন্ত আছে। আগমনকালে একটি কলেজের ছাত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উক্ত ছাত্রটি বিলক্ষণ মেধাবী এবং অনু-সন্ধিৎসু। অতি অল্পসময়ের মধ্যে আমার সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা হইল। তিনি বাসা পর্য্যন্ত আসিয়া আমাকে রাখিয়া গেলেন। ঐ ছাত্রটির মুখে অনেক প্রাচীন কথা শুনিলাম। তিনি কালিদাস এবং বরাহমিহিরের গৃহের স্থান পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু ঐরূপ স্থান নির্দ্দেশে আমার তত শ্রদ্ধা হইল না। কারণ, এত বিপ্লবের পরও উক্ত দুই মনীষীর গৃহের কথা লোকস্মৃতিতে থাকা এক প্রকার অসম্ভব। তদ্ভিন্ন যেখানে উক্ত কবি ও জ্যোতির্ব্বিদের গৃহ ছিল বলিয়া কথিত হয়, সেখানে এখন কোনই প্রাচীন চিহ্ন বিদ্যমান নাই। একটি স্থান লতা-গুল্ম-পরিবৃত এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ। কতক-গুলি প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। অপর যে স্থানটি বরাহ-মিহিরের গৃহ বলিয়া কল্পিত, উহা নিবিড় অরণ্যময়। কোনও ক্ষুদ্র

অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ঐ স্থানে স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। দুইটি স্থানের পরস্পর ব্যবধান অনেক। ঐ ছাত্রটির মুখে আর একটি অদ্ভুত গল্প শুনিলাম। পূর্ব্বে না কি সিদ্ধনাথের ঘাটের সন্নিহিত সরোবরে নাগকন্যাগণ মধ্যে মধ্যে আগমন করিত। উহাদের উপরিভাগ নারীমূর্ত্তি এবং নিম্নভাগ মৎস্যের মত। সিদ্ধনাথ-ঘাটের দক্ষিণ দিকে দূরে একটি প্রান্তর দেখা যায়। ঐ প্রান্তরটি দুই তিন-ক্রোশব্যাপী। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ঐ প্রান্তরই রাজা শূদ্রককর্ত্তৃক মৃচ্ছকটিক-নাটকে বর্ণিত জীর্ণোদ্যান। মৃচ্ছকটিক ঐতিহাসিক নাটক না হইলেও উক্ত নাটকের রচয়িতা ঐ নাটকে তদানীন্তন উজ্জয়িনী রাজধানীর প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সামাজিক ব্যাপারের একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব অন্যান্য নগরীর ন্যায় উজ্জয়িনীতেও রাজা এবং ধনিগণের বায়ু-সেবনার্থ একটি সুবৃহৎ উদ্যান ছিল, উহাই জীর্ণোদ্যান নামে মৃচ্ছকটিক নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জীর্ণোদ্যান কল্পিত নহে, সত্য বস্তু। ঐ উদ্যান মহাকাল স্থানের দক্ষিণদিকে প্রান্তরমধ্যে থাকাই অধিক সম্ভব। কারণ ঐ দিকেই সমতলভূমি বিদ্যমান। অন্যান্যদিকে নদী এবং পর্ব্বত-মালা অবস্থিত সুতরাং বৃহৎ উদ্যানের অবস্থিতি সম্ভবপর নহে। এখন ঐ প্রান্তর-মধ্যে স্থানে স্থানে গগনস্পর্শী তেঁতুল ও আম্র বৃক্ষ সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

উজ্জয়িনীতে অন্যূন তেত্রিশ হাজার লোকের বাস। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ছত্রি বেণিয়া কায়স্থ প্রভৃতি বহুজাতি বিদ্যমান। ব্রাহ্মণেরা নানা-শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁহাদের মধ্যে গুজরাটী ব্রাহ্মণের সংখ্যাই

(১) 'গুর্জ্জররাষ্ট্র' এই সংস্কৃত শব্দ হইতে গুজরাট নাম হইয়াছে। বড়োদা হইতে রাজপুতানার দক্ষিণ পর্য্যন্ত 'গুর্জ্জর দেশ' বিস্তৃত ছিল। ঐ দেশের প্রাচীন অধিবাসী বলিয়া ঐ দেশের ব্রাহ্মণেরা "গুজরাটী ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচিত।

অধিক। কেবল পৌরহিত্য ইঁহাদের উপজীবিকা নহে। অতি অল্পসংখ্যক গুজরাটী ব্রাহ্মণই পুরোহিতের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, অধিকাংশই বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। উজ্জয়িনীবাসী ব্রাহ্মণদের বাণিজ্য-বৃত্তি নূতন নহে। অতি পুরাকাল হইতে ইঁহারা বাণিজ্য-কার্য্যে রত আছেন। মৃচ্ছকটিক-নাটকের নায়ক ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব চারুদত্তের পূর্ব্ব-পুরুষগণ বাণিজ্য দ্বারা বহু ধনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বাণিজ্যপোত সমুদ্রপথে পৃথিবীর নানা জনপদে গমনাগমন করিত। গুজরাটী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ কেহ জমিদারও আছেন কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা বাঙ্গালার ভূম্যধিকারীদের ন্যায় নহে। ইঁহারা অল্প অল্প জমি ক্রয় করেন এবং উহাতে প্রজা-বন্দোবস্ত করিয়া জাত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। গুজরাটী ব্রাহ্মণেরা উদীচ্য নাগর শ্রীমালী দিশাবল-প্রভৃতি চৌরাশীটি থাকে বিভক্ত। উপাধি আচারী, ভট্ট, পাণ্ড্য, রাউল, ঠাকুর এবং ব্যাস। ইঁহারা বিলক্ষণ চতুর এবং কর্ম্মঠ। ব্রাহ্মণদের সন্তান জন্মিলে মরাঠী ধাত্রী নাড়ীচ্ছেদ করে। তরবারি, তীর, কাগজ, কলম ও চৌকী দিয়া ষষ্ঠী মাতার পূজা করা হয়। মনুর ব্যবস্থা অনুসারে ইঁহারা দশ দিন অশৌচ পালন করেন। দ্বাদশ দিনে আত্মীয় কুটুম্ব ভোজন করাইতে হয়। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে নিমন্ত্রিত মহিলারা পুত্রের নামকরণ সম্পন্ন করেন। চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত প্রসূতি বাটীর বাহিরে যাইতে পারেন না। চল্লিশ দিন অতীত হইলে একদিন দিব্য বেশ ভূষা করিয়া আত্মীয় স্ত্রীলোকদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসেন। ইঁহারা পাঁচ মাস হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে পুত্রের চূড়াকরণ করেন এবং বারো বৎসর হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পুত্রের এবং আট বৎসর হইতে পনর বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেন। বিবাহের পূর্ব্বে

পান সুপারি দিয়া আত্মীয় কুটুম্বকে বিবাহ-সম্বন্ধ জানাইয়া দেওয়া হয়। ঐরূপ পান সুপারি বিতরণেব নাম "মাগনী"। গুজরাটী-ব্রাহ্মণ দের মধ্যে গর্ভাধান-সংস্কার নাই। ইঁহারা নিরামিষাশী। বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইঁহারা শঙ্করাচার্য্যের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্। গুজরাটী ব্রাহ্মণদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় একটু বিশেষত্ব আছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার তিন দিন পরে ইঁহারা চিতাভস্মের উপর দুগ্ধ দধি গোময় গোমূত্র ঢালিয়া দিয়া আসেন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা অপদেবতা ডাকিনী প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং তাহা-দিগকে অত্যন্ত ভয় করেন। উজ্জয়িনীতে গুজরাটী ব্রাহ্মণ ব্যতীত ত্রৈলঙ্গী, দেশস্থ, কোঙ্কণস্থ, কনোজিয়া, মৈথিল, শাকদ্বীপী, খাণ্ডেবালা-প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস আছে কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে।

এখানে অনেক গুজরাটী-বেণিয়ার বাস আছে। ইহারা আপনা-দিগকে বৈশ্য বলিয়া পরিচিত করে। বেণিয়াদের অধিকাংশ বাণিজ্য দ্বারা বিলক্ষণ সম্পন্ন হইয়াছে। গুজরাটী বেণিয়ারা প্রাণান্তেও পরের চাকুরী স্বীকার করে না। যে নিতান্ত দরিদ্র সেও কোন ব্যবসায়ীর নিকটে থাকিয়া পরে তাহার সাহায্যে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই সুশ্রী। রমণীরা পরমসুন্দরী। ইহারা দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত যথা;—জৈন ও বৈষ্ণব। পূর্ব্বে বোধ হয় অধিকাংশই জৈন ছিল, পরে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রভাবে অনেকে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। জৈনসম্প্রদায় শ্রাবক নামে অভিহিত। শ্রাবকেরা মৃত ব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধাদি কিছুই করে না। দেহত্যাগের পর দ্বাদশ দিবসে জৈনমন্দিরে গিয়া তীর্থঙ্করগণের উদ্দেশে পুষ্প ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রদান করে। বৈষ্ণবগণ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত। ইহারা

দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের আচারের অনুকরণ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোক দশ সংস্কারের মধ্যে নামকরণ, চূড়াকরণ, বিবাহ ও গর্ভাধান এই চারিটী সংস্কারমাত্র পালন করে। গুজরাটী বেণিয়াদের বিদ্যারম্ভে বড় ঘটা হয়। বালকের হাতে খড়ী দিবার জন্য শুভদিনে ঢাক ঢোল বাজাইয়া বালককে বিদ্যালয়ে লইয়া যায়। সেখানে তাহার তাড়িপাত ও পুস্তকাদি সরস্বতীর নামে পূজা হয়। ঐ সময়ে "ওঁ নমঃ সিদ্ধম্". এই কয়েকটী কথা লেখাইয়া লয়। তাহার পর, শিক্ষককে পান সুপারি এবং টাকা দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদান করিয়া বিদায় করে। বালিকারা কুমারী অবস্থায় মঙ্গলাগৌরীর পূজা করিয়া থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উজ্জয়িনী সন্দর্শন শেষ হইল। ঐ দিনই ইন্দোর যাইবার সঙ্কল্প। মধ্যাহ্ন-কৃত্য সমাপ্ত হইলে পাণ্ডা প্রদর্শক ও শেঠের প্রাপ্য চুকাইয়া দিলাম। শেঠ ব্যবসায়ী বটে কিন্তু উহার সাধুতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বিশেষ প্রশংসনীয়। শেঠের গৃহে থাকিয়া আমি তিলমাত্রও অসুবিধা ভোগ করি নাই। পরিচারিকা অপেক্ষা শেঠপত্নী পাকাদির সময়ে আমার অধিক সাহায্য করিত। শেঠ এত সজ্জন যে, সে বাটীভাড়া ও দ্রব্যাদির মূল্য যাহা গ্রহণ করিল, তাহা আমার নিকট অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়াই মনে হইল। একখানি এক্কা ডাকিয়া সেই গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে ষ্টেশনে গমন করিলাম। বেলা বারোটার সময় গাড়ী ষ্টেসন পরিত্যাগ করিল। সেই দ্রুতগামী শকট হইতে ডানদিকে প্রান্তর মধ্য দিয়া মহাকালের মন্দিরের চূড়া ও অন্যান্য পুরাতন মন্দির এবং প্রাচীন-বৃক্ষলতা-সমাকীর্ণ উজ্জয়িনীর পুণ্যময় দৃশ্য নয়নে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। ঐ

পুরাতন সারস্বত পুণ্যভূমি উজ্জয়িনীকে এত শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল, অধিক দিন এখানে অবস্থান করিতে পারিলাম না ভাবিয়া মনে বড়ই ক্ষোভ হইতে লাগিল। কিন্তু নিয়মিত সময়ের মধ্যে উদ্দিষ্ট স্থানগুলি সন্দর্শন করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিতে হইবে, সুতরাং আর উপায় কি ? দেখিতে দেখিতে পুনরায় ফতেয়াবাদে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। এইবার আমি সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া যে ইন্দোর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছি, তাহাই দেখিবার জন্য পশ্চাতে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলাম। গাড়ী পাইতে আরও একঘণ্টা বিলম্ব হইবে, সুতরাং একটি ছায়াময় বৃক্ষ-মূলে গিয়া বসিলাম। আহাম্মদাবাদের কয়েকটি বস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকটে আসিয়া বসিলেন। ঐ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একজন সংস্কৃতবিৎ ছিলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে মুগ্ধবোধব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। বস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বলিলেন ;—"বোপদেব মহারাষ্ট্রের অধিবাসী, স্বদেশে তাঁহার ব্যাকরণ চলে নাই কিন্তু শুনিতে পাই, বাঙ্গালা দেশে উহার যথেষ্ট সমাদর"। কিছু ক্ষণ পরেই আজমীড় হইতে গাড়ী আসিল। আমি ঐ গাড়ীতে উঠিয়া অপরাহ্ণ তিনটার সময় ইন্দোরে পৌঁছিলাম। ইন্দোর-ষ্টেসনে সুন্দর সুন্দর গাড়ী পাওয়া যায়। বাঙ্গালী দেখিয়া এক গাড়োয়ান্ আমার নিকটে আসিল এবং সে আমাকে তাহার গাড়ীতে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি কোনই অপত্তি করিলাম না, অবিলম্বে সে আমাকে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কোন বিশিষ্ট বাঙ্গালী বাবুর বাসায় পৌঁছাইয়া দিল। (১)

ইন্দোর হোল্‌কার-রাজ্যের রাজধানী এবং একটি সুন্দর নগরী।

(১) ঐ বাঙ্গালী বাবুর নাম শ্রীযুক্ত রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বে উহার নাম ছিল "ইন্দ্রপুর"। প্রাচীন শিল্পলিপিতে ইন্দ্রপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগরীটি কটকী নাম্নী একটি ক্ষীণ-তোয়া স্রোতস্বতীর তীর দেশে অবস্থিত। স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায়—পূর্ব্বকালে ইন্দ্রপুব অতিক্ষুদ্র গ্রামমাত্র ছিল। প্রসিদ্ধা অহল্যা-বাইর সময় ঐ ক্ষুদ্র গ্রাম নগরীতে পরিণত হইয়াছে। অহল্যাবাই হোল্‌কার-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা অসাধারণ যোদ্ধা মলহররাওএর পুত্রবধূ। যে প্রদেশে অধুনা হোল্‌কার-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, পূর্ব্বে ইহা মৎস্য-দেশের একাংশ ছিল। চন্দ্রবংশীয় সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের সময়ে বিরাটরাজ কর্ত্তৃক এই রাজ্য শাসিত হইত। পাণ্ডবেরা এই প্রদেশেই উক্ত বিরাট-রাজের ভবনে ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। তাহার পর, এখানে অসংখ্য রাজবংশের অভ্যুদয় ও বিলয় সংঘটিত হইয়াছে। এক সময়ে এই প্রদেশ মালবের অধিপতিগণের হস্তগত ছিল। এখনও প্রাচীন লোকেরা ইহাকে মালবদেশেরই অন্তর্গত মনে করেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাপথের হিন্দু নরপতি বাজীরাও-পেশ্‌ওয়ার অন্যতম সেনাপতি পূর্ব্বোক্ত মলহররাও, হোল্‌কার এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি ইহা 'হোল্‌কার-রাজ্য' নামেই বিখ্যাত। প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে হোল্‌কার-রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতেছি। দক্ষিণাপথে 'ধন্‌গর' নামক একটি জাতি বাস করে (১)। উহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। উক্ত জাতীয় স্ত্রী পুরুষ উভয়ই বিলক্ষণ বলিষ্ঠ এবং শ্রমসহিষ্ণু। ধন্‌গরেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর নাম 'খুটেগার্'। ইহারা বস্ত্রবয়ন-প্রভৃতি তন্তুবায়ের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম 'হাট্‌গার'।

(১) ছোটনাগপুরে ধান্‌গর বা ধাঙ্গর নামে এক কৃষিজীবী জাতি বাস করে, দক্ষিণাপথের ধন্‌গর জাতির সহিত তাহাদের কোনই সম্পর্ক নাই। এই উভয় জাতির আচার ও সভ্যতায় আকাশ পাতাল প্রভেদ।

হাটগারেরা গো মেষ মহিষ-প্রভৃতি পশু পালন করে এবং মেষের গাত্র হইতে রোম সংগ্রহ করিয়া কম্বল প্রস্তুত করে। উহাদের অনেকে দধি দুগ্ধ প্রভৃতিও বিক্রয় করিয়া থাকে। ধন্‌গর-জাতির তৃতীয় শ্রেণীর নাম 'বার্গে'। বার্গেরা কৃষিজীবী। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা ধন্‌গর জাতির পৌরহিত্য করেন। উহারা কেবল বিবাহ ও শ্রাদ্ধ কার্য্যে পুরোহিতকে আহ্বান করে কিন্তু অন্যান্য কার্য্য কৌলিক রীতি অনুসারে নিজেরাই সম্পন্ন করিয়া থাকে। ধন্‌গরেরা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দেয় এবং ক্ষত্রোচিত দ্বাদশদিন অশৌচ পালন করে। উহারা ভৈরব খাণ্ডোবা ভবানী যেমাই প্রভৃতি দেব দেবীর উপাসক। ধন্‌গর-জাতীয় বিধবারা একাদশী করে। বিজয়া দশমীর দিন হেরম্বের পূজা করা ধন্‌গর জাতির একটা বিশেষ কৌলিক আচার। ধনশালী ধন্‌গরেরা মৃতদেহের দাহ করে এবং অন্যান্য সকলে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া থাকে। কিন্তু ধনীই হউক আর নির্ধনই হউক স্ত্রীজাতির মৃতদেহ ভূতলে প্রোথিত করা এই জাতির চিরাচরিত প্রথা। ধন্‌গরেরা পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মার পূজা করে এবং তাহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠিত রাখে।

মহারাষ্ট্র-প্রদেশের প্রসিদ্ধ পুণা নগরীর সন্নিহিত নীরানদীর তীরে হোল্ নামক একটি পল্লী আছে। ঐ পল্লীতে ধন্‌গর-জাতীয় একটি সামান্য কৃষকের গৃহে মলহররাও জন্ম গ্রহণ করেন। মলহররাও প্রথমে পেশ্‌ওয়ার অধীনে একটি অতিনিম্ন কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে চতুরতা ও কার্য্যদক্ষতাগুণে উক্ত নৃপতির অন্যতম সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শেষে তাঁহার ক্ষমতা এতদূর বাড়িয়াছিল যে, তিনি স্বয়ংই একটি বিস্তৃত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। মলহররাওএর পুত্র খাণ্ডেরাও। এই খাণ্ডেরাওএর পত্নীই জগৎপ্রসিদ্ধা অহল্যাবাই। অহল্যা ভারতবর্ষের প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাদের অন্যতমা। তিনি একটি

সামান্য গৃহস্থের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্য না থাকিলেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন-প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ছিল এবং মুখে এমন একটি লাবণ্য ও প্রফুল্লতা বিরাজ করিত যে, তজ্জন্য সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিত। অহল্যা পিতার আদরের কন্যা। শৈশবে পিতা কর্তৃক বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রত্যহ গ্রাম্য-পাঠশালায় প্রেরিত হইতেন। তিনি গ্রাম্য-পাঠশালায় যে পর্য্যন্ত শিক্ষা হওয়া সম্ভব, তাহা শিখিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই অহল্যার দেহ সুস্থ ও বলিষ্ঠ ছিল। মলহররাও স্বয়ং এই বালিকার লাবণ্য ও স্বভাব সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া স্বীয় পুত্রের বধূরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। বিবাহের পর, অহল্যার স্বামী খাণ্ডেরাও অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। পিতা বিদ্যমানেই তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সহ পত্নীকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া পরলোক গমন করেন। অহল্যা শ্বশুরের অত্যন্ত অনুগতা ও প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তিনি পতিবিয়োগে সহমৃতা হইবার জন্য উদ্যোগ করিলে শ্বশুর মলহররাও অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে উক্ত কর্ম্ম হইতে বিরত হইবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন। অহল্যা শ্বশুরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। মলহররাও ইহলোক পরিত্যাগ করিলে অহল্যার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র মালেরাও রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনি অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন। রাজপদে অভিষেকের পর, নয় মাসের মধ্যেই তাঁহার জীবনলীলা শেষ হয়। এই শোকের সময়ে অহল্যা এক ঘোর বিপদে পতিত হন। তাঁহার একমাত্র কন্যা মুক্তাবাই ভিন্নশ্রেণীস্থ সামন্তের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় কৌলিকবিধি অনুসারে রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। সুতরাং অন্য কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় ঐ সময় হোল্‌কার-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী গঙ্গাধর যশোবন্ত অহল্যাকে দত্তক গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। অহল্যা দত্তক

গ্রহণ করিলে উক্ত দত্তককে নামে মাত্র রাজা করিয়া গঙ্গাধরই সমুদয় রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু অহল্যা অসাধারণ বুদ্ধিমতী, গঙ্গাধরের কূট অভিসন্ধি বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি দত্তক গ্রহণে সম্মত হইলেন না। ইহাতেও গঙ্গাধর ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তদানীন্তন পেশ্‌ওয়া মধুরাওএর পিতৃব্য রাঘোবা দাদার সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া অহল্যাকে রাজ্যচ্যুত করিবার সঙ্কল্প করেন। এই সময় অহল্যার অসাধারণ সাহস বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গঙ্গাধর-কৃত ষড়্‌যন্ত্রের সংবাদ পাইবামাত্র বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট সমুদয় ব্যক্ত করেন এবং কর্ম্মচারীদিগকে কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া মহারাষ্ট্র-রাজ্যের অধিপতি পেশ্‌ওয়া মধুরাওর পত্নী রমাবাইকে একখানি পত্র লেখেন এবং গায়কবাড়্ সিন্ধিয়া-প্রভৃতির নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠান। উক্ত রাজন্যবর্গ তাঁহার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সকল কার্য্য তিনি সংগোপনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এদিকে রাঘোবাদাদা সসৈন্যে হোল্‌কার-রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া অহল্যার আদেশে তাঁহার সেনাপতি তুকোজী রাঘোবাদাদার পথরোধ করিয়া উজ্জয়িনীতে অবস্থান করেন। রাঘোবাদাদা অহল্যার বিনা অনুমতিতে শিপ্রার পরপারে পর্য্যন্ত আসিতে পারেন নাই। অবশেষে অহল্যা একাকী রাঘোবাদাদাকে ইন্দোরে আহ্বান করিয়া আনিয়া উপহার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সসম্মানে পুণায় পাঠাইয়া দেন। এবং নিজের উদারতা-গুণে গঙ্গাধরকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন।

অহল্যা রমণী হইলেও তাঁহার সাহস ও বিক্রমের অভাব ছিল না। তিনি যথার্থ বলিষ্ঠদেহা বীররমণী ছিলেন। সৈন্য পরিচালনার

ভার স্বয়ং গ্রহণ করা উচিত নয় ভাবিয়াই তিনি শ্বশুরের সময়ের বিশ্বাসী সেনানায়ক তুকোজীর উপর উক্ত ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। নচেৎ উক্ত কার্য্যেও তাঁহার যোগ্যতার অভাব ছিলনা। অহল্যা রাজনীতি-প্রয়োগেও অত্যন্ত নিপুণা ছিলেন। তিনি অবসর বুঝিয়া এমন নীতি প্রয়োগ করিতেন যে, অভিজ্ঞ রাজনৈতিকের ও বিস্ময় উৎপন্ন হইত। এই সকল রাজসিক গুণে মণ্ডিতা হইয়াও অহল্যা অসামান্য সাত্ত্বিক-গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করা অবধি দেহত্যাগ পর্য্যন্ত অকাতরে দান ও পরোপকারে সময় যাপন করিয়া গিয়াছেন। অহল্যা যথাবিধি সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া দেবপূজায় বসিতেন। পূজাশেষে কিছুক্ষণ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতেন। ব্রাহ্মণেরা আহারান্তে দক্ষিণা লইয়া গৃহে গমন করিলে স্বয়ং আহার্য্য গ্রহণ করিতেন। ভোজনান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া প্রায় দুইটার সময় রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক রাজসভায় যাইতেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করিতেন। তাহার পর, সায়ং উপাসনা ও জলযোগ শেষ করিয়া রমণীবেশে পুনরায় রাজসভায় যাইতেন। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত রাজকার্য্য চলিত, তাহার পর বিশ্রাম। অহল্যার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি অতিপ্রখর ছিল। তিনি হোল্‌কার-রাজ্য সুদৃঢ় করিবার জন্য কয়েকটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে হোলকার-রাজ্যে কোনই বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। ঐ সময়ে প্রজারা অতিসুখে ও শান্তিতে কাল যাপন করিয়াছিল। অহল্যার কীর্ত্তিকলাপ অনেক। তিনি হিমালয়স্থ কেদারতীর্থে যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি ধর্ম্মশালা ও একটি কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মহীশূর ও মালব প্রদেশে তাঁহার নির্ম্মিত অসংখ্য ধর্ম্মশালা বিদ্যমান। ঐ সকল দেশে তিনি গ্রামে গ্রামে কূপ খনন

করাইয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন। দ্রাবিড়প্রদেশের নানা তীর্থে ও রামেশ্বর সেতুবন্ধে উৎকলের পুরুষোত্তম ধামে বারাণসী প্রয়াগ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থে তাঁহার নির্ম্মিত অসংখ্য দেবালয় ও ধর্ম্মশালা দেখিতে পাওয়া যায়। গয়াধামে অহল্যার অনেক দেবালয় আছে। তন্মধ্যে বিষ্ণুপদ মন্দিরও লাটমন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপদমন্দিরে রামসীতা মূর্ত্তির পার্শ্বে শিবপূজানিরতা অহল্যার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ সকল কীর্ত্তি-কলাপের জন্য অহল্যা মানবী হইয়াও দেবীরূপে পরিণত হইয়াছেন। যাত্রীরা দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজাকালে পাষাণময়ী অহল্যার মস্তকেও গন্ধ পুষ্প অর্পণ করিয়া থাকে। তিনি প্রতিবৎসর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয়-সমূহে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতেন এবং স্বহস্তেও অসংখ্য দরিদ্রকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন। করুণাময়ী অহল্যার সকল প্রাণীর প্রতিই দয়া ছিল। কৃষকেরা শস্যক্ষেত্রে পাখী বসিতে দিত না। ক্ষুধার্ত্ত বিহগমণ্ডলী দলে দলে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ক্ষেত্রের উপরিভাগে পরিভ্রমণ করিত, উহা দেখিয়াও অহল্যার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়াছিল। দয়াবতী অহল্যা কৃষকদের নিকট শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র কিনিয়া লইয়া বিহগদের জন্য ছাড়িয়া দিতেন। এই রূপে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি নানাবিধ পুণ্যকার্য্য দ্বারা সসম্মানে হোল্‌কার-রাজ্য শাসন করিয়া ষাট বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

অহল্যাবাই যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন সেনাপতি তুকোজী ব্যতীত তিনি হোল্‌কার-রাজ্য শাসনের উপযুক্ত পাত্র অন্য কাহাকেও দেখিতে পান না। সুতরাং তাঁহার শ্বশুর মলহররাওএর সহিত তুকোজীর কোন সম্পর্ক না থাকিলেও উপযুক্ত বোধে প্রীতিবশতঃ তাঁহাকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ঐ সময়ে

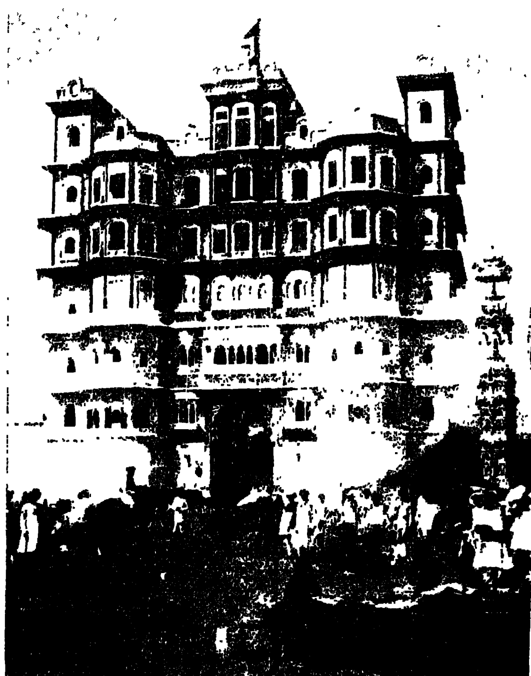
তিনি কৌশলপূর্ব্বক তুকোজীকে "হোল্‌কার" এই রাজসম্মান-সূচক উপাধি প্রদান করাইয়াছিলেন। তুকোজী স্বয়ংও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে অহল্যার উপদেশ ও আদেশ প্রতিপালন করিতেন। রাজ্যেশ্বরী অহল্যার ইচ্ছাক্রমে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রায় "মলহররাওএর পুত্র তুকোজীরাও-হোল্‌কার" এই কথাটি লিখিত হইয়াছিল। অহল্যার মৃত্যুর এক বৎসর পরে তুকোজী-হোল্‌কার সত্তর বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন। তাহার পর, তুকোজী হোলকারের পুত্র যশোবন্তরাও-হোল্‌কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এখন যশোবন্তরাও-হোলকারের পুত্র H. H. The মহারাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর সেওয়াই শিবাজী হোল্‌কার G. C. S. I. মহোদয় হোল্‌কার-রাজ্যের সিংহাসনে বিরাজিত আছেন (১)। ইনি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মিত্র নরপতি। ইন্দোরে ভারত-গবর্মেণ্টের একজন প্রতিনিধি (Political Resident) বাস করেন। হোলকার্-রাজের একটি মন্ত্রিসভা আছে। ঐ সভার সদস্যগণের সাহায্যে উক্ত নৃপতি আপন রাজ্যমধ্যে সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা পরিচালন করিয়া থাকেন। কিন্তু অপরাধীর প্রাণদণ্ড অথবা ঐরূপ কোন গুরুতর কার্য্য হইলে ইংরেজরে-সিডেণ্টের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। হোল্‌কার্-রাজ্যের সৈন্যবিভাগে তিন হাজার একশত নিয়মিত পদাতিক সৈন্য ও দুই হাজার একশত অনিয়মিত পদাতিক সৈন্য আছে। অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা তিন হাজার তিনশত। তন্মধ্যে নিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্য দুই হাজার একশত ও অনিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্য একহাজার দুইশত। এই নরপতির অস্ত্র শস্ত্রের

(১) আমি যখন ইন্দোরে যাই, তখন উপরি লিখিত নরপতি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কয়েক বৎসর গত হইল তিনি বালক পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং শান্তিসুখ উপভোগ করিতেছেন।

মধ্যে কামানের সংখ্যা তিন শত বিরাশীটিমাত্র। তন্মধ্যে সাধারণ কামান তিনশত চল্লিশটি এবং বৃহৎ কামান বিয়াল্লিশটি। এই রাজ্যের আয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল এককোটি ছয় লক্ষ এগার হাজার ছয় শত। এখন উহা অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। মহারাজ হোল্‌কারের সম্মানের নিমিত্ত ইংরেজগবর্মেণ্ট হইতে একুশটি তোপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

ইন্দোরনগরী দুই ভাগে বিভক্ত। কটকী নদীর পশ্চিম তীরে যে অংশ উহাই প্রাচীন ইন্দোর। ঐ দিকেই মহারাজ হোল্‌কারের প্রাসাদ এবং পুরাতন অধিবাসীদের আবাস। নগরটী চতুর্দ্দিকে প্রায় ন্যূনাধিক তিনবর্গ মাইলব্যাপী। ১২ই বৈশাখ প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যা শেষ করিয়া সাত ঘটিকার সময় নগর সন্দর্শনে বাহির হইলাম। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর সেতু পার হইলেই একটি সুবিস্তৃত বাজার নয়নগোচর হইল। এক দিকে সারি সারি দোকানের সম্মুখ ভাগে রাশি রাশি ধান্য কলাই মটর গোধূম প্রভৃতি শস্যের বিপুল সমাবেশ। অপর দিকে কাঁশারী-পটীতে তামা পিতলের বাসন সকল সুন্দর সুসজ্জিত হইয়া আপন আপন শোভা বিস্তার করিতেছে। এ দেশের লোকেরা রঙ্গিল বস্ত্র ভাল বাসে। রমণীরা রঞ্জিত বসন ব্যতীত শাদা কাপড় পরিধান করে না। সুতরাং রঙিলবস্ত্র-বিক্রেতার দোকানের সম্মুখে কৃষক-বধূদের ভারি ভিড়। শাক শব্জীর পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে। দরিদ্র লোকেরা প্রায় ঘাসের বীজ ক্রয় করে। উক্ত তৃণবীজ চূর্ণ করিয়া যে রোটিকা প্রস্তুত হয়, উহাই তাহাদের ক্ষুধা শান্তির উপাদান। স্থানে স্থানে কাঁচা ভুট্টার রাশির পার্শ্বে একটি করিয়া কৃষ্ণকায় পুরুষ বসিয়া আছে। ভুট্টা ক্রয় করা যেন এ দেশের লোকের একটা অবশ্য কর্ত্তব্য। পথিকেরা পর্য্যন্ত গমন কালে দুই চারিটা ভুট্টা পথের সম্বল-স্বরূপ লইয়া যায়।

বাজার অতিক্রম করিলেই রাজবাটী। ভারতবর্ষের অনেক রাজ-ভবন দেখিয়াছি কিন্তু এরূপ প্রাসাদমালা আর কখনও নয়নে পতিত হয় নাই। ইহা পাষাণ বা ইষ্টক-বিনির্ম্মিত নহে, কেবল সারবান্ কাষ্ঠ দ্বারা এই সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকাশ্রেণী নির্ম্মিত। ঐ



ইন্দোরের রাজপ্রাসাদ। (পূর্ব্ব দ্বার)

প্রাসাদমালা প্রদক্ষিণ করিতে হইলে প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। মন্ত্রিসভা, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যালয়, দেবমন্দির, রন্ধনশালা

অন্তঃপুর-মহিলাদের আবাস প্রভৃতি সমুদয়ই এই একমাত্র বাটীতে অবস্থিত। এই বিশাল দারুভবনের নানাস্থানে বহুবিধ অতুলনীয় কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহার নির্ম্মাণ কার্য্যে অসংখ্য শিল্পীর জীবনব্যাপী পরিশ্রম ও বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। প্রাসাদের শোভা অতি মনোহর। উহার উপরিভাগস্থ লোহিত বর্ণের পতাকারাজি দূর হইতে নয়ন আকৃষ্ট করে। কিন্তু এই যে, শোভা ও শিল্পনৈপুণ্য উহা অন্যান্য লৌহ পাষাণ বা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাসাদের তুলনায় একান্তই ক্ষণবিধ্বংসী। বৈশ্বানরের একটু কৃপা হইলেই ঐ সমুদয় মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মরাশিতে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু এই প্রাসাদের সৃষ্টি হইতে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইতেছে, অদ্যাপি ওরূপ কোন দুর্ঘটনা হয় নাই। প্রাসাদমালার রক্ষার নিমিত্ত বহুসংখ্যক প্রহরী নিযুক্ত আছে। বর্ত্তমান মহারাজ ঐ পুরাতন দারুভবনে বাস করেন না। প্রাসাদের উত্তর ভাগে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দুইটি ইষ্টকালয় আছে, উহাই তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ঐ দুইটি অট্টালিকাও পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন এবং বিবিধ পুষ্পবীথিকায় পরিশোভিত। রাজভবন সন্দর্শন শেষ হইলে পূর্ব্বাহ্ণ দশঘটিকার সময় বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

ইন্দোরে শিক্ষার বিস্তার নিতান্ত মন্দ নহে। কিন্তু সংস্কৃত-শিক্ষার তেমন প্রসার নাই। ইন্দোরের মহারাজের একটিও সংস্কৃত-চতুষ্পাঠী নাই। কয়েকটি সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত রাজকীয় বৃত্তি গ্রহণ করিয়া এখানে অবস্থিতি করেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত উমাকান্ত উপাধ্যায় মীমাংসক এবং পণ্ডিত উমাশঙ্কর জ্যোষী জ্যোতির্ব্বিৎ। অপরাহ্ণ তিনটার সময় তাঁহাদের সহিত সংস্কৃত-ভাষায় ইন্দোরের পুরাতত্ত্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা-সংক্রান্ত অনেকক্ষণ কথোপকথন হইল। পণ্ডিতদ্বয় অতি অমায়িক এবং সজ্জন। তাঁহারা সরল ভাবে ঐ স্থানের নানারহস্য

বর্ণন করিলেন। তাহার পর, কলেজ্ দেখিতে গেলাম। এখানকার মহারাজের প্রতিষ্ঠিত রাজকুমার-কলেজ্ অতিপ্রসিদ্ধ। একটি প্রশস্ত ক্ষেত্রে এই কলেজ্‌বাড়ী অবস্থিত। অনেক রাজকুমার এই কলেজে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এখানকার য়ূরোপীয় ও দেশীয় অধ্যাপকগণের বেতন অন্যান্য কলেজের তুলনায় অধিক। ক্রমশঃ কলেজের উন্নতি হইতেছে। ইন্দোরের মহারাজ হিন্দু হইলেও, অনেকটা য়ূরোপীয় সভ্যতার পক্ষপাতী। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তাহার পর, ফরাসীদেশের প্যারী নগরীতে কিছুকাল বাস করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষা বিস্তারে ইঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ। তজ্জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। সংস্কৃত জ্যোতিঃশাস্ত্রেও মহারাজের অত্যন্ত শ্রদ্ধা, নানাদিগ্‌দেশ হইতে সমাগত জ্যোতিষিগণ প্রায়ই মহারাজ কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া থাকেন। ইন্দোর-রাজ রাজধানী অপেক্ষা পল্লীবাস অধিক পছন্দ করেন। ঐ সময়ে তিনি কোনও দূরস্থ পল্লীতে বাস করিতেছিলেন। রাজবাটী হইতে বাসায় ফিরিলাম। সায়ংকালে তদানীন্তন ধারানগরীর অধীশ্বর ভোজবংশীয় রাজার উকীল বাসায় আগমন করিলেন। ধারেশ্বর পীড়িত, চিকিৎসার জন্য ইন্দোরে বাস করিতেছেন। উকীল মহাশয় ধারানগরী-সংক্রান্ত অনেক বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ কিঞ্চিৎ সুস্থ থাকিলে আমি আপনাকে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতাম। তিনি সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান্, আপনার ন্যায় দূরদেশাগত পণ্ডিতকে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইতেন।"

১৩ই রবিবার প্রাতঃকালে স্নানাদি শেষ করিয়া হোল্‌কারের লালবাগ নামক উদ্যান দেখিতে গেলাম। উহা রাজবাটী হইতে

কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। একটি প্রশস্ত রাজপথ অবলম্বন করিয়া যাইতে যাইতে অনেকক্ষণের পর লালবাগে উপস্থিত হইলাম। কি সুন্দর উদ্যান! উহা সন্দর্শন করিয়া নন্দনকাননের কল্পিত চিত্র মনোমধ্যে উদিত হয়। এই কানন বহুদূর-ব্যাপী। মধ্যস্থলে বিমল-বারি-পূর্ণ প্রশস্ত জলাশয় ও মনোহর অট্টালিকা বিদ্যমান। এই উদ্যানে যে কত অসংখ্য প্রকার তরুলতা শোভা পাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কোন স্থানে নানা জাতীয় গোলাপ, কোথায় বা অসংখ্য বেল যূথিকা, স্থান-বিশেষে চামেলী রজনীগন্ধা বিকসিত হইয়া অপূর্ব্ব সুষমা বিস্তার করিতেছে। নানাবর্ণের বৈদেশিক তরুলতার অন্ত নাই। ঐ সকল তরুলতা রোপণে কতই নৈপুণ্য কতই কৌশল প্রকাশিত হইয়াছে। মণ্ডলাকার পুষ্পিত-তরু-শ্রেণীর মধ্যভাগে ফোয়ারা হইতে ছত্রাকারে জলকণা বিকীর্ণ হইয়া দারুণ গ্রীষ্মে দর্শকগণের গাত্রে যেন সুধা বর্ষণ করিতেছে। উদ্যানটি শোভা ও সম্পদে অতুলনীয়। মহারাজ হোল্কার গ্রীষ্মকালে অনেক সময় লালবাগে অবস্থিতি করেন। উদ্যান সন্দর্শনে প্রায় দশটা বাজিয়া গেল, তাহার পর, ঘর্ম্মাক্ত-দেহে বাসায় ফিরিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য ও বিশ্রামাদি করিলাম। কটকী নদীর সেতুর পশ্চিম ভাগের কথা বর্ণিত হইল, এখন পূর্ব্বভাগের বিষয় কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতেছি। এই ভাগের নাম ইন্দোর-ছাউনী। ইহা অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন। ইন্দোরের পলিটিক্যাল্-রেসিডেণ্টের কার্য্যালয় ও তাঁহার আবাস-গৃহ এই দিকে। আমি যে বাসায় ছিলাম উহা ছাউনীতে নূতন সহরে অবস্থিত। বিকালে নূতন সহর দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। হোলকার্-রাজ্যে আমেরিকার খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণের প্রভাব যথেষ্ট। মহারাজ হোল্কার উঁহাদিগকে চিরকালের জন্য বহু পরিমাণ ভূমি দান করিয়াছেন। ঐ সকল ভূমি-খণ্ডে ক্যানেডিয়ান্-মিসন-কলেজ উপাসনার্থ-গির্জ্জা ও খ্রীষ্ট-প্রচারক-

গণের আবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। নবনির্ম্মিত কলেজ্-বাড়ীটি দেখিতে মন্দ নহে, উহাতে পড়া শুনাও উত্তম হয়। কলেজ্ দেখিয়া বাহিরে আসিতেই শ্বেতাঙ্গ শ্বেতশ্মশ্রু প্রবীণ খ্রীষ্টপুরোহিত অত্যন্ত-শিষ্টতা সহকারে আমাদিগকে গির্জ্জার মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া হিন্দী বক্তৃতা শুনিলাম। এখানে দেশীয় খ্রীষ্টানূনরনারীদের অত্যন্ত সমাদর। প্রশস্ত গৃহের মধ্যে অসংখ্য সমুজ্জ্বল চেয়ার্ সুসজ্জিত রহিয়াছে। দারুণ গ্রীষ্মে টানা-পাখারও ব্যবস্থা আছে। সেই দিন রবিবার, বহুদূর হইতে রঙ্গিল-পরিচ্ছদ কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীগণ উপাসনায় যোগ দিতে আসিয়াছে। খ্রীষ্ট-যাজকগণ অতিমিষ্ট ভাষায় তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া যাইতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ সকল ধর্ম্মার্থীকে ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা নিদ্রাদেবীর প্রতিই সমধিক আকৃষ্ট বলিয়া মনে হইল। খ্রীষ্টমন্দির হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া সায়ংকালে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ করিয়া গৃহকর্ত্তার পুত্রদের সহিত হোল্কার-রাজ্য-সংক্রান্ত নানা কথা হইল। এই রাজ্যে প্রায় ১০৫৪২৩৭ সংখ্যক লোকের বসতি আছে। তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটী ব্রাহ্মণ, রাজপুত কায়স্থ বেণিয়া কুন্‌বী ধন্‌গর এবং ভীল জাতির সংখ্যাই অধিক। প্রসঙ্গ-ক্রমে এখানে ভীল জাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

কথিত আছে ;—পুরাকালে মধ্যভারত রাজপুতানা ও দক্ষিণাপথের অনেকাংশ ভীলজাতির অধিকৃত ছিল। পরে আর্য্যজাতির আক্রমণে পরাভূত হইয়া উহাদের অনেকে পর্ব্বত ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আর কেহ কেহ বিজেতাদিগের সংস্রবে ক্রমশঃ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিৎ অনুমান করেন 'রামায়ণ-বর্ণিত বানর ও ভল্লুক, দ্রাবিড়ী অনার্য্য ও

ভীলজাতি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কবি উহাদের যে বিপুল নখ লাঙ্গুলের বর্ণনা করিয়াছেন উহা হাস্যরসোদ্দীপক কল্পনামাত্র।' প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান মহীশূর-রাজ্য ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান কিষ্কিন্ধ্যা নামে উক্ত হইত। উল্লিখিত কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী কৃষ্ণকায় অনার্য্য দ্রাবিড়গণ ঐ দেশ শাসন করিত। ভিল্লি নামক আর একটি অনার্য্যজাতি ও উহাদের সাহচর্য্যে জীবন যাপন করিত। এই উভয় জাতিই সীতার উদ্ধার বিষয়ে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের সাহায্য করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। দ্রাবিড় নামক অনার্য্য জাতির রাজা বালী ও সুগ্রীব এবং নীল হনূমান্ প্রভৃতি যোদ্ধা, নল শিল্পী ও ভিল্লি-জাতীয় জাম্ববান্ মন্ত্রণা-কার্য্যে নিপুণ ছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের সৌন্দর্য্যপ্রিয় মহাকবি দক্ষিণভারতের ঐ মসীকৃষ্ণ অর্দ্ধবর্ব্বর অসাধারণ বলশালী লোকদিগকে বানর ও ভল্লূক নামে অভিহিত করিয়া বিস্ময়রসের অবতারণা করিয়াছেন মাত্র, নচেৎ তাঁহার বর্ণনা পাঠে ঐ সকল জাতির অকপট চরিত্র, অমিত বল, সত্যবাদিতা, পরোপকারে প্রবৃত্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ ব্যতীত পশুত্বের অণুমাত্রও আভাস পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ভিলজাতির পুরাতন বৃত্তান্ত পরিত্যাগ করিয়া এখন আমরা উহাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা বর্ণন করিব। উহারা দৃঢ়কায় ও পরিশ্রমী। ভীলেরা সহজে কাহারও বশ্যতা স্বীকার করে না। কাহারও নিকট নিয়মে বদ্ধ হইয়া কাজ করা অথবা দৈনিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করা উহারা ঘৃণাজনক ও অমর্য্যাদাসূচক মনে করে। বিবাদ বিসম্বাদের বিচারের জন্য উহারা নায়কের নিকট গিয়া অভিযোগ করে। নায়ক ঐ সমুদায়ের মীমাংসা করিয়া দেন। ভীল-জাতীয় কোন প্রধান ব্যক্তি নায়কের পদে নিযুক্ত থাকে। একজন ভিল, নায়কের মন্ত্রীর কার্য্য করে। মন্ত্রীর পদটি বংশানুক্রমিক। ভীলেরা পূর্ব্বে তীর ধনু যষ্টি তরবারি পাষাণখণ্ড-প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধ করিত, এখন

সভ্যজাতিদের সংস্রবে আসিয়া কতকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। উহাদের মধ্যে এমন অনেক শীকারী আছে, যাহারা ভীষণ সিংহ ব্যাঘ্র হস্তিপ্রভৃতি কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। ভীলেরা নৃত্যগীতপ্রিয়। উহাদের কিয়দংশ বৌদ্ধ ও কিয়দংশ হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী। ভীলদের মধ্যে 'ভীলালা' নামক একটী সম্প্রদায় আছে। উহারা রাজপুত হইতে ভীল-জাতীয় রমণীর গর্ভে উৎপন্ন। ভীলালাদের মধ্যে কয়েকটী করদ রাজা আছেন। অন্যান্য ভীলদের অধিকাংশই কৃষক। মহীশূর মেওয়ার্ মালব খান্দেশ গুজরাট আজমীঢ় যশল্মীর বেরেলী বান্দা আমেদনগর পুণা কাঠিয়াবাড় ভুজ কচ্ছ-প্রভৃতি প্রদেশে বহুসংখ্যক ভীল বাস করে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ইন্দোরে এখন বৈদিক ধর্ম্মের তেমন প্রভাব নাই, অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবলতাই অধিক। তন্মধ্যে আর্য্যধর্ম্ম একটি। এখানকার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অধিকাংশই আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বী। এ 'আর্য্যধর্ম্ম' অর্থে সেই পুরাকালের বৈদিক ধর্ম্ম নহে। বাঙ্গালা দেশে যেমন রাজা রামমোহনরায়-প্রবর্ত্তিত 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' এ দেশের আর্য্যধর্ম্মও প্রায় তদ্রূপ। এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহাত্মা দয়ানন্দসরস্বতী। আমরা প্রসঙ্গ-ক্রমে এখানে পণ্ডিত দয়ানন্দসরস্বতীর জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। গুজরাটের কাঠিয়াবাড় ভূভাগের অন্তর্গত মোরবীর রাজার অধীন একটি ক্ষুদ্র নগরে উদীচ্য-ব্রাহ্মণকুলে দয়ানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন কুসীদজীবী ও গ্রাম্যশাসনকর্ত্তা (মাজিষ্ট্রেট্) ছিলেন। দয়ানন্দের পাঁচ বৎসরে বর্ণমালা শিক্ষা ও আট বৎসরে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হয়। তিনি প্রথম সন্ধ্যা বন্দনা শিক্ষা করিয়াই যজুর্ব্বেদ কণ্ঠস্থ করিতে আরম্ভ করেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সমগ্র যজুর্ব্বেদসংহিতা পাঠ সমাপ্ত হয়। তাঁহার

পিতা শৈব ছিলেন, সুতরাং প্রথমে তিনি পূজার নিমিত্ত পিতার সহিত প্রত্যহ শিবমন্দিরে যাইতেন। তাহার পর, দীক্ষা গ্রহণের দিন তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয়। সেই দিন তাঁহাকে সমস্তদিন উপবাসী থাকিতে হইয়াছিল। রাত্রিতে জাগরণের নিমিত্ত দয়ানন্দ পিতার সহিত শিব মন্দিরে গমন করেন। অর্দ্ধরাত্রে মন্দিরের পূজক ও ভৃত্যগণ বাহিরে আসিয়া নিদ্রিত হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁহার পিতাও ঘুমাইয়া পড়েন। ঐ সময় দয়ানন্দ সন্দেহাকুল-চিত্তে শিবের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমেই তাঁহার সংশয় বাড়িতে লাগিল। তিনি পিতাকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন - "পিতৃদেব! এই দেবমূর্ত্তি যে পরমেশ্বর উহা ত আমার ধারণা হইতেছে না। দেখুন ঐ শিবমূর্ত্তির উপর দিয়া মূষিক চলিয়া যাইতেছে, অথচ সর্ব্বশক্তিমান্ কিছু বলিতেছেন না।" তাঁহার পিতা তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নানা যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক অনেক বুঝাইলেন কিন্তু দয়ানন্দের তাহাতে তৃপ্তি হইল না। শ্রান্তি ও ক্ষুধা বোধ হওয়ায় পিতার অনুমতি লইয়া তিনি গৃহে গমন করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই অল্প বয়সে পুত্রের উপবাসাদিতে মাতার ইচ্ছা ছিলনা, কেবল স্বামীর অনুরোধে সম্মত হইয়াছিলেন। এখন পুত্রকে গৃহে আগত দেখিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে আহারাদি প্রদান করিলেন। তাহার পর, দয়ানন্দের পিতা দয়ানন্দকে ব্রত-ভঙ্গের পাপ বুঝাইতে বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু দয়ানন্দের তাহা ধারণা হইল না। তিনি আত্মমত গোপন রাখিয়া বিদ্যোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিলেন। দয়ানন্দ, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড নিঘণ্টু নিরুক্ত এবং পূর্ব্ব-মীমাংসা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর, তাঁহার চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া ভগিনী এবং এক খুল্লতাতের মৃত্যু হয়। ঐ শোকের সময়ে তিনি মৃত্যু ও মুক্তির বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন।

এদিকে দয়ানন্দের বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। তাঁহার

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং পিতার বহু যত্ন-সত্ত্বেও বিবাহ করিলেন না। তিনি একদিন পিতার অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিলেন। কিছুদিন ভ্রমণের পর, শৈলনামক স্থানে লালা ভকতরামনামক এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রয় করিলেন। দীক্ষাকালে তাঁহার "শুদ্ধচৈতন্য" নাম হয়। তাহার পর,আহম্মদাবাদ প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বারাণসীধামে গমন করেন। সেখানে প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তত্রত্য সচ্চিদানন্দপরমহংস তাঁহাকে নর্ম্মদাতীরস্থ চাণোর-কন্যালীতে যোগশিক্ষার্থ গমনের পরামর্শ প্রদান করেন। দয়ানন্দ ঐ পরামর্শ অনুসারে সেখানে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য দীক্ষিতগণের সহিত পরিচিত হন এবং কিছুকাল সেখানে বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অল্পবয়স বলিয়া প্রথমতঃ দীক্ষিতগণ তাঁহাকে যোগশাস্ত্রের উপদেশ দানে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া পরমানন্দপরমহংস নামক এক উদাসীন তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন এবং সাম্প্রদায়িক নিয়মানুসারে তাঁহাকে গৈরিক-বসন ও দণ্ড কমণ্ডলু গ্রহণ করিতে হইল। এই স্থানেই তাঁহার 'শুদ্ধচৈতন্যস্বামী' নামের পরিবর্ত্তে 'দয়ানন্দসরস্বতী' নাম হইল। তাহার পর, তিনি যোগ-বিদ্যার অবশিষ্ট গুপ্ত বিষয় শিক্ষার নিমিত্ত রাজপুতনার অন্তর্গত অর্ব্বুদ-পর্ব্বতে কিছু কাল অবস্থিতি করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দয়ানন্দ হরিদ্বারের মহামেলায় উপস্থিত হন। হরিদ্বারে কিছু কাল অবস্থানের পর 'তাইদি' নামক স্থানে গমন করেন। উক্ত স্থানে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রবলতা ও মাংসাহারী ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত বিরক্তি জন্মে। তাহার পর, তিনি কাশ্মীর রাজ্যের শ্রীনগরে গমন করিয়া কেদার ঘাটে এক মন্দিরে বাস করেন এবং ঐ স্থানে গঙ্গাগিরি নামক একজন দার্শনিক সন্ন্যাসীর

নিকট কিছুকাল দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন। তাহার পর, ঐ স্থান হইতে রুদ্রপ্রয়াগ গুপ্তকাশী-প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া নর্ম্মদার উৎপত্তি-স্থান অমরকণ্টক পর্ব্বতে উপস্থিত হন।

দয়ানন্দ শেষ দশায় দুগ্ধ ও অন্ন ব্যতীত অন্য কিছু আহার করিতেন না। সন্ন্যাসিগণের ন্যায় তাঁহার দেহ ক্ষীণ বা কৃশ ছিল না। তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত স্থূল সুন্দর ও বিলক্ষণ সবল ছিল। একজন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত বলিয়াছিলেন;—"দয়ানন্দ পাঁচজন মল্লের বল ও পাঁচজন পণ্ডিতের বিদ্যা লাভ করিয়াছেন।" দয়ানন্দ মূর্ত্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। তিনি স্বীয় মত প্রচারের নিমিত্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন। দয়ানন্দ যেখানে যাইতেন সেখানেই 'আর্য্য-সমাজ' নামক সমিতি স্থাপন করিতেন। তিনি স্বয়ং ঋগ্বেদের এক ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ঐ ভাষ্যে মূর্ত্তিপূজা-প্রতিপাদক ঋক্-গুলির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করাই দয়ানন্দের ঐ ভাষ্য প্রণয়নের উদ্দেশ্য কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র সমাদৃত হয় নাই। দয়ানন্দ এক সময় কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এখানে অধিকাংশ সময় সংস্কৃত-ভাষায় কথোপকথন করিতেন এবং হিন্দী ভাষায় উত্তম বক্তৃতা দিতেন। তাঁহার ভাষা সরল ও সতেজ ছিল। বম্বে নগরের আরব-সাগরের তীরে দয়ানন্দের একটি আশ্রম ছিল। তিনি কথোপকথনকালে বলিতেন; "পুরাণে দেবদেবীর মহিমাপ্রকাশক যে সকল গল্প আছে, উহা পুরাণকারদের স্বকপোলকল্পিত, সুতরাং সত্য নহে।" তিনি যখন প্রথম বম্বে প্রদেশে গমন করেন, তখন একটি অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল। দয়ানন্দ পুণা ষ্টেসনে আসিয়া দেখিতে পাইলেন—বহুলোক তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আছে। কতকগুলি লোক হাতীর উপর হাওদা দিয়া তাহাতে করিয়া লইতে আসিয়াছে এবং তাঁহার বিদ্বেষীরা একটি গর্দ্দভ

সাজাইয়া আনিয়াছে। দয়ানন্দ হস্তী কিংবা গর্দ্দভ কিছুইতেই আরোহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন "সহস্র সহস্র লোক পদব্রজে যাইতেছে, আমি কেন পারিব না? উচ্চ বাহনে আরোহণ করিয়া কেহ বড়লোক হইতে পারে না, তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সমুন্নত বৃক্ষবাসী কাকেরাও বিশেষ সম্মানের পাত্র হইত।" দয়ানন্দ যোগমার্গের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি লাহোর নগরে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন;—"প্রাণায়াম দ্বারা যোগমার্গ অবলম্বন ব্যতীত ব্রহ্ম লাভের অন্য উপায় নাই। যাহারা যোগের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহারা ধর্ম্মমন্দিরের বাহিরে ভ্রমণ করিতেছে।" দয়ানন্দ উনষাট্ বৎসর বয়সে আজমীঢ় নগরে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার কৃত গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে 'সত্যার্থপ্রকাশ' ও 'ঋগ্বেদ ভাষ্য' বিশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। আজকাল ভারতবর্ষে দয়ানন্দ-প্রবর্ত্তিত আর্য্যসমাজীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। আজমীঢ় যোধপুর বম্বে পুণা লাহোর প্রভৃতি স্থানে বহু সংখ্যক শিক্ষিত গণ্য মান্য লোক আর্য্যধর্ম্মের নিয়ম অনুসারে চলিয়া থাকেন। ইন্দোরে ও একটি আর্য্য-সমাজ আছে। পণ্ডিত বৃকোদরশাস্ত্রী উহার ধর্ম্মোপদেষ্টা। গৃহকর্ত্তার বৈঠকখানায় দয়ানন্দের একখানি তৈলচিত্র দেখিলাম, কি সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি! দেখিলে যথার্থই মহাপুরুষ বলিয়া অনুমিত হয়।

১৭ই বৈশাখ সোমবার দেড়টার সময় রাজপুতানা মালব-রেল-পথের ইন্দোর ষ্টেসনে বাষ্পশকটে আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় ফতেয়াবাদ জংসন অতিক্রম করিয়া রতলাম অভিমুখে চলিলাম। ফতেয়াবাদ জংসন অতিক্রম করিলেই একটি ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর বক্ষের উপর দিয়া গাড়ী যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম নদীটির নাম 'গম্ভীরা'। কালিদাস মেঘদূতে লিখিয়াছেন—"গম্ভীরার জল

প্রিয়বন্ধুর চিত্তের ন্যায় প্রসন্ন” (১)। প্রকৃত পক্ষেও তাহাই। সেই কাচবৎ স্বচ্ছ জলধারা প্রান্তরের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে বহিতেছে, উহাতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে বাষ্পশকট চম্বল-সেতুর সন্নিহিত হইল। ঐ সেতু-সংলগ্ন ষ্টেসনের নামও চম্বল। চম্বল অতিপ্রাচীন নদী। পুরাণ ও কাব্যে এই নদী চর্ম্মণ্বতী নামে আখ্যাত। পৌরাণিকগণের মতে রাজা রন্তিদেবের গোমেধ যজ্ঞের আহুতি হইতে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা এখন যে দেশের মধ্য দিয়া যাইতেছি, প্রাচীনকালে এই দেশ ‘দশার্ণ’ নামে আখ্যাত হইত। দশার্ণ দেশের রাজধানী ছিল বিদিশা। মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্‌গণের প্রধান সেনাপতি পুষ্পমিত্র প্রভুদিগকে পরাজিত করিয়া স্বীয় পুত্র অগ্নিমিত্রকে সাম্রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক বিদিশা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত করেন (২)। অদ্যাপি বিদিশার নষ্টাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহার বর্ত্তমান নাম ‘ভিল্‌শা’। ভিল্‌শায় রাজপুতানা-মালব রেলপথের একটি ষ্টেসন আছে। গাড়ী যখন ফতেয়াবাদ ষ্টেসনে থামে সেই সময়ে এক ব্রাহ্মণ ও একটি ব্রাহ্মণমহিলা আমাদের গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী বিধবা সুতরাং অলঙ্কারবিহীনা, মস্তক মুণ্ডিত, পরিধানে গৈরিক-রঞ্জিত চওড়া লালপেড়ে শাড়ী (এ দেশের বিধবারা পেড়ে কাপড় পরিয়া থাকেন) কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী এবং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। বয়স ত্রিশ কিংবা বত্রিশের ন্যূন নহে। এ বয়সেও বালিকার ন্যায় সরলপ্রকৃতি। বেশ সংস্কৃত জানেন। একটী সন্ন্যাসীর সহিত অনর্গল সংস্কৃত-ভাষায় কথোপকথন করিতেছিলেন। আমি গম্ভীরা ও চর্ম্মন্বতী নদীর

(১) গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিত শ্চেতসীব প্রসন্নে,
ছায়াত্মাপি প্রকৃতি-সুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশং। (মেঘদূতম্)

(২) কালিদাসকৃত—“মালবিকাগ্নিমিত্র” নাটক পাঠ করুন।

প্রসঙ্গে কালিদাসের কবিতার কথা উল্লেখ করিতেই তিনি ঐ দুই নদী-সংক্রান্ত একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। আমি শ্লোকটি লিখিয়া লইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি সম্মুখের বেঞ্চী হইতে উঠিয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন এবং ধীরে ধীরে শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। আমি 'পকেট্‌বুকে' শ্লোকটি লিখিয়া লইলাম। তাহার পর, নানাবিধ প্রসঙ্গ উত্থিত হইল। সংস্কৃতভাষায় মহিলাটীর বিশেষ অধিকার আছে। উঁহার দিব্য উচ্চারণ, অসঙ্কোচ ভাব, স্বচ্ছ অন্তঃকরণ এবং সর্ব্বোপরি বিনয়মধুর ব্যবহার বিশেষ প্রশংসনীয় (১)। আমি ঐ বিদুষী রমণীর সহিত পরিচিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। দেখিতে দেখিতে বাষ্পশকট বড়নগর ষ্টেসনে পৌঁছিল। বড়নগর মহারাজ সিন্ধিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটি জেলার হেড্‌-কোয়াটার্‌। স্থানটি অতিপ্রাচীন। এখানে পুরাকালের নির্ম্মিত অনেক দেবমন্দির জলাশয় ও অট্টালিকা আছে। ষ্টেসন হইতে রাজ-প্রাসাদের চূড়াস্থিত লোহিত-পতাকারাজি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ঐ সময় কোন রাজকর্ম্মচারীকে লইবার জন্য বিচিত্র-আস্তরণে সুসজ্জিত একটি ভীমকায় হস্তী ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিল। বিদুষী ব্রাহ্মণ-মহিলা সঙ্গী সহ ঐ ষ্টেসনে অবতরণ করিলেন। তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ;—"শ্রীমন্তোঽপি কৃপয়া অত্র অবতরন্তু, অত্রাপি পরিব্রাজকানাং দৃষ্টিরম্যাণি বহূনি দ্রষ্টব্যানি বিদ্যন্তে(২)"। আমি উত্তরে বলিলাম ;—"অত্রভবত্যাঃ সাদরমভ্যর্থনয়া কৃতার্থোঽস্মি পরং নির্দ্দিষ্ট-

(১) প্রিয়প্রায়া বৃত্তির্বিনয়মধুরো বাচি নিয়মঃ,
প্রকৃত্যা কল্যাণী মতিরনবগীতঃ পরিচয়ঃ।
পুরো বা পশ্চাদ্বা তদিদমবিপর্য্যাসিতরসং
রহস্যং সাধূনামনুপধি-বিশুদ্ধং বিজয়তে॥ (ভবভূতিঃ)

(২) শ্রীমান্ কৃপা করিয়া এখানে অবতরণ করুন, এখানেও ভ্রমণকারীদের দৃষ্টি-রম্য বহু পদার্থ আছে।

সময়েন ঈপ্সিত-প্রদেশান্ প্রবিলোক্য ময়া স্বগৃহং প্রতিগন্তব্যং, তেনহি কালাতিক্রম-শঙ্কয়া অত্র অবতরিতুমক্ষমস্তৎ ক্ষমতাং মামনুকম্পয়া ভগবতী" (২)। ব্রাহ্মণমহিলা বোধ হয় 'ভগবতী' সম্বোধনে ঈষৎ হাস্য করিয়া নামিয়া গেলেন। আমি তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের নিমিত্ত উঠিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলাম। কিছুক্ষণ পরেই সেই বিমলতোয়া স্রোতস্বতীর তীরবর্ত্তী মনোরম ষ্টেসন পরিত্যাগপূর্ব্বক বাষ্পশকট দ্রুতবেগে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইল। এ প্রদেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, উভয়দিকের দূরব্যাপী প্রান্তর কেবল শ্যামল-শস্যশ্রেণী-পরিশোভিত। আরোহীদিগের নিকট শুনিলাম—এই দেশটি তিনটি দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত। পাশাপাশি তিনখানি করিয়া গ্রামের কোন খানি বড়োদার গায়কবারের, কোন খানি ইন্দোরের হোলকারের, কোন খানি বা গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ার দ্বারা শাসিত হয়। দিবা অবসানপ্রায়, ঐ সময় উভয় পার্শ্বস্থ শস্যক্ষেত্রের শোভা অতিশয় মনোরম বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্য দিয়া শকটশ্রেণী দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে উহার মন্থরগতি দেখিয়াই মনে হইল, আমরা কোন বড় ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। দেখিতে দেখিতে গাড়ী রতলাম জংসনে আসিয়া দাঁড়াইল।

সূর্য্য অস্তগত হইবার কিছু পূর্ব্বে বহু সংখ্যক যাত্রীর সহিত ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। যে বাঙ্গালী বাবুর বাসায় রাত্রিতে অবস্থানের কথা ছিল, তিনি ষ্টেসন ছাড়িয়া সহরে গিয়া বাস করিতেছেন। বাজারে তিন চারিটি মুদীর দোকানে অনুসন্ধান করিলাম। সেই

(২) মাননীয়ার সাদর অভ্যর্থনায় কৃতার্থ হইলাম কিন্তু নিয়মিত সময়ের মধ্যে আমাকে অভিলষিত স্থান গুলি সন্দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিতে হইবে, তজ্জন্য কাল-অতিক্রমের আশঙ্কায় এখানে অবতরণ করিতে অক্ষম। অতএব মাননীয়া অনুকম্পা করিয়া আমায় ক্ষমা করুন।

রাত্রির জন্য এক টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া দিতে চাহিলাম কিন্তু তাহারা "পরদেশীকে" স্থান দিতে রাজি হইল না। অগত্যা এক মুটের মাথায় জিনিসপত্র দিয়া সহরে যাইবার পথে রতলামের মহারাজের প্রতিষ্ঠিত পান্থশালায় উপস্থিত হইলাম। পান্থশালার দ্বারে এক কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় জমাদার বসিয়া আছে। তাহার গুম্ফরাজি-বিরাজিত মুখ ও আরক্ত নয়নদ্বয় দেখিয়া মনটা তত প্রসন্ন হইল না। জমাদার বলিল "ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখুন যদি থাকিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে নাম ধাম লিখিয়া লইতেছি।" প্রবেশ করিয়া আমার চক্ষুঃ স্থির হইল। পান্থশালাটি আম্রকাননের মধ্যে অবস্থিত সুতরাং পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বায়ু ও আলোকের অভাবে ঘরগুলি নিতান্ত স্যাত্‌সেঁতে ও দুর্গন্ধময়। উঠানে গ্রাম্যকুক্কুট বিচরণ করিতেছে। এক দিকে বারান্দায় কতকগুলি বন্য-স্ত্রীপুরুষ অন্ধকারে বসিয়া ভুট্টা চিবাইতেছে। পথেই ভারবাহীর মুখে শুনিয়াছিলাম 'সময়ে সময়ে অনেক 'বদ্‌মায়েস্‌' পথিক সাজিয়া এখানে আসিয়া রাত্রি যাপন করে এবং সুযোগ পাইলেই প্রবাসী পান্থদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া চলিয়া যায়।' আমি সেই মুহূর্ত্তেই ঐ পান্থশালা ত্যাগ করিবার জন্য বাহিরে আসিলাম। জমিদার বলিল "হাঁ বাবু সাহেব! আপনাদের কি এরূপ যায়গায় থাকা চলে।" প্রকৃত কথা ঐ সকল সরাইতে ইংরেজ-রাজ্যের লোককে রাখিতে উহারা বড় ইতস্ততঃ করে। কারণ ব্রিটিস্‌-গবর্মেণ্টের প্রজার উপর কোনরূপ অত্যাচার হইলে দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তাদিগকে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হয়। কাজেই উহারা যতদূর সম্ভব পরিহার (avoid) করিতে চেষ্টা করে। আবার ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিলাম। ঐ সময় রাজপুতানার দিক্‌ হইতে আর একখানি গাড়ী আসিয়া ষ্টেসনে পৌঁছিল। সকলে স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। একজন এক্কাওয়ালা আমাকে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিল। এক্কার নিকটে

গিয়া দেখি একটি গৌরাঙ্গী প্রবীণ-বয়স্কা মহিলা একার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। ক্ষুদ্র একায় ঐরূপ স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা স্থূলাঙ্গীর পার্শ্বে বসিয়া যাওয়া কোন ভদ্রলোকের পক্ষে অসম্ভব। আমি বলিলাম "তোমার একায় স্থান কোথায়?" একাওয়ালা বলিল "আসুন বসাইয়া দিতেছি"। আমি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ফিরিয়া যাইতেই মহিলাটি ধীরে ধীরে হিন্দীতে বলিলেন "কেন ফিরিয়া যাইতেছ বাছা! এখানে পড়িয়া থাকিলে কষ্ট পাইবে, তুমি আমার ছেলের বয়সী, আমার পাশে বসিয়া যাইবে তাহাতে দোষ কি?" সেই নিরুপায় অবস্থায় একজন অপরিচিতা প্রবীণা মহিলার মুখে স্নেহপূর্ণ পুত্র সম্বোধন শুনিয়া আমি অতিশয় আশ্বস্ত হইলাম এবং সেই সহৃদয়া মাতৃমূর্ত্তির পার্শ্বে সঙ্কুচিত-ভাবে বসিয়া অবিলম্বে সহরে পৌঁছিলাম। একাওয়ালা বণিক্-পল্লীর একটি বাটীর দ্বারে উক্ত মহিলাকে নামাইয়া দিয়া আমাকে বাঙ্গালী বাবুর বাসায় পৌঁছাইয়া দিল। উপস্থিত হইয়াই শুনিলাম 'গৃহকর্ত্তা মফস্বলে আছেন কিন্তু দৈবক্রমে তাঁহার একটি বাঙ্গালী কর্ম্মচারী ঐ রাত্রির জন্য বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে আপ্যায়িত হইয়া ঐ স্থানে নিরাপদে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে রতলাম নগরী সন্দর্শনার্থ বাহির হইলাম। ষ্টেশনে যাইবার রাস্তার পার্শ্বেই রতলামের মহারাজের প্রাসাদ-দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রাজ-ভবন উদ্যান ও জলাশয় সকল অতি মনোহর এবং আধুনিক স্থাপত্য-বিদ্যাবিশারদগণের নির্ম্মাণ-কৌশলের পরিচায়ক।

মালব প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে রতলাম রাজ্য অবস্থিত। প্রসিদ্ধ রাঠোরকুল হইতে এই রতলাম-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যোধপুরাধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা মল্ল-দেবের বংশে মহাবীর রতন-সিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীশ্বর সাজিহানের পক্ষ অবলম্বন

পূর্ব্বক কয়েকটি সংগ্রামে সবিশেষ পরাক্রম প্রকাশ করায় সম্রাট্ পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই প্রদেশে একটি বিস্তৃত জায়গীর প্রদান করেন। সেই জায়গীর হইতেই বর্ত্তমান রাজ্যের সৃষ্টি। রতলামের মহারাজ এখন গোয়ালিয়রের মহারাজ সিন্ধিয়ার করদ। এই রাজ্যের পরিমাণ ১২০০ বর্গমাইল্। ইহাতে প্রায় ১২৫০০০ লোক বাস করে। অধীবাসীদের সমস্তই প্রায় হিন্দু। রতলাম রাজ্যে নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রাজপুত কায়স্থ বেণিয়া নবশাক ও বহুবিধ পার্ব্বত্য জাতি বাস করে। এ প্রদেশের স্বাস্থ্য অতি উত্তম, ভূমিও বিলক্ষণ উর্ব্বরা। রাজ্যের আয় পূর্ব্বে প্রায় একুশ লক্ষ টাকা ছিল, এখন উহা অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে মহারাজ সিন্ধিয়া রতলাম রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ অথবা রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করায় রতলামের মহারাজ গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়াকে বার্ষিক ৮৪০০০ টাকা দিতে সম্মত হন। এখন ইংরেজ-গবর্মেণ্টের হস্ত দিয়া মহারাজ, সিন্ধিয়াকে ঐ কর প্রদান করিয়া থাকেন। রতলামে একজন পলিটিকাল্ এজেণ্ট বাস করেন এবং একটি মন্ত্রিসভা আছে। মহারাজ উক্ত সভার সদস্যগণের সাহায্যে রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। রতলামের সৈন্যবিভাগে পাঁচটী কামান ৫৮ জন গোলন্দাজ ২৮ জন অশ্বারোহী এবং ৩০০ পদাতি সৈন্য আছে। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রতনসিংহের বংশোদ্ভূত মহারাজ যশোবন্ত সিংহের পুত্র H. H. রাজা সার্ রণজিৎ সিংহ K. C. I. E. মহোদয় রতলামের সিংহাসনে বিরাজিত আছেন। রাজপুতনার অন্তর্গত আলোয়ারের মহারাজ মঙ্গলসিংহ রতলামের রাজকুমারীর পাণি গ্রহণ করেন। এই রাজবংশের সম্মানার্থ ইংরেজগবর্মেণ্ট হইতে ১৩টি তোপ নির্দ্দিষ্ট আছে। নগর সন্দর্শন শেষ হইলে নয়টার মধ্যে

স্নান ও মধ্যাহ্নকৃত্য শেষ করিয়া একা ডাকিয়া দশটার সময় পুনরায় ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনটি নগর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত। উহা রাজপুতনা-মালব-রেলপথের একটি প্রধান ষ্টেসন। এখান হইতে রতলাম-গোধ্‌রা-রেলশাখা বোম্বাই অভিমুখে গিয়াছে। ষ্টেসন-গৃহ ও প্লাটফরম্‌ অতিপ্রশস্ত। পুষ্প-বীথিকার মধ্যে সুন্দর সুন্দর বাঙ্গলো শোভা পাইতেছে। বাজারটি তত ভাল নহে, কিন্তু উন্নতিশীল। রতলাম-রাজ্যে অহিফেন উৎপন্ন হয়। অন্যান্য কৃষিরও বিলক্ষণ প্রসার। ঐ স্থানের লোক-সমাগম দেখিয়া মনে হইল, অল্পদিনের মধ্যেই রতলাম একটী বাণিজ্য-প্রধান নগরে পরিণত হইবে।

তিন চারিটি স্থানে টিকিট বিক্রীত হয়। আমি যথাসময়ে এক-খানি টিকিট লইয়া রতলাম গোধ্‌রাশাখা-রেলপথের সুসজ্জিত গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। ঐ রেলপথটি রাজপুতানা-মালব রেলপথ অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রশস্ত। গাড়ীগুলি বড় এবং নূতন। উহার জানালা সকল নূতন রঙের কাচে নির্ম্মিত হওয়ায় অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল। নানাদেশীয় আরোহী লইয়া ১০॥ টার সময় ঐ শকটমালা ধীরে ধীরে ষ্টেসন পরিত্যাগ করিল। আমাদের গাড়ীতে মথুরার কয়েকটি ভদ্র-লোক ছিলেন, তাঁহারা নিয়ত বাঙ্গালীর সহিত মিশিয়া বাঙ্গালীর ভাষা ও ভাবভঙ্গীতে বিলক্ষণ অভ্যস্ত হইয়াছেন। মথুরাবাসিগণ ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় আমার সহিত গল্প করিতে করিতে চলিলেন, মধ্যভারতের লোকেরা অবাক্‌ হইয়া রহিল। এদেশে অপেক্ষাকৃত অল্পদিন বাঙ্গালীর সমাগম হইয়াছে, সুতরাং ইহারা এখনও বাঙ্গালীর ভাষা ও ব্যবহারের সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত হইতে পারে নাই। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বাষ্পশকট শালবনে প্রবেশ করিল। সেই শালবন মধ্যবর্ত্তী রেলপথের উভয় পার্শ্বে গুল্মবহুল ক্ষেত্রে কৃষ্ণসার মৃগ চরিতেছিল, তাহারা গাড়ীর

শব্দে ইতস্ততঃ উল্লম্ফন করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল। আরোহিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণসারের ক্রীড়া দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কিছুক্ষণ পরেই বাষ্পশকট পার্ব্বত্যপথ দিয়া ধাবিত হইতে লাগিল। রেলপথের দুই দিকে অনন্ত পর্ব্বতমালা, লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। এদিকে সূর্য্যকিরণও প্রখরতর হইয়া উঠিল। গ্রাম নগর ষ্টেসন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত-শ্রেণী।

বহুক্ষণ পরে পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র ষ্টেসনে গাড়ী থামিল; সম্ভবতঃ উহার দশবিশ ক্রোশ দূরে কোন গ্রাম থাকিতে পারে। দুই তিনটি স্ত্রীপুরুষ গাড়ী হইতে নামিয়া সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইতে হইতে সেই উত্তপ্ত পর্ব্বতমালার গাত্র বাহিয়া সরু পথে পর্ব্বতোপরি উঠিতে লাগিল। আমাদের গাড়ীর অনতিদূরে একখানি মহিষের গাড়ী লাগিয়াছিল। উহা হইতে একটি স্থূলাঙ্গী গৃহস্থ-মহিলা সন্তান ক্রোড়ে করিয়া বৃদ্ধ ভৃত্য ও পরিচারিকার সহিত আমাদের গাড়ীতে সম্মুখের বেঞ্চিতে আসিয়া বসিলেন। মহিলাটী সম্ভবতঃ কোন ধনীর গৃহিণী হইবেন, তজ্জন্য তাঁহার গাত্রের স্বর্ণাভরণগুলির পরিমাণ ও আকার অতিবিপুল। উহাতে শিল্পনৈপুণ্যের লেশমাত্র নাই, কেবল বড় বড় সুবর্ণখণ্ড পিটিয়া অলঙ্কার নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। মহিলাটি গাড়ীতে উঠিয়াই একটু বিস্মিতভাবে সম্মুখের বেঞ্চীতে দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার পরিচারিকার কাণে অতিমৃদুস্বরে কি যেন বলিলেন। পরিচারিকা বেচারী অত্যন্ত বর্ব্বর, সে কোন কথাই বলিতে সাহস করিল না, কেবল ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া সম্মুখের বেঞ্চীর দিকে তাকাইতে লাগিল। পার্শ্ববর্ত্তিনী আর একটি মহিলা আমাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া হিন্দীতে বলিলেন;—"মহারাজ! পাগড়ী মাথায় দিয়া বসো!" চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম সকল

আরোহীর মস্তকেই পাগড়ী কিংবা টুপী একটা কিছু আছে একমাত্র আমিই মস্তকাবরণ-শূন্য। তখন বুঝিতে পারিলাম, আমিই ইঁহাদের লক্ষ্যস্থল. সুতরাং বলিতে হইল, "আমার পাগড়ী নাই।" মহিলারা বিস্ময়ে অভিভূত. পুরুষের পাগড়ী নাই, সে কি কথা! তাঁহারা উহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। আবার পূর্ব্বোক্ত মহিলা ধনিগৃহিণীর পক্ষ হইয়া বলিলেন "তোমার পাগড়ী কি পড়িয়া গিয়াছে?" আমি উত্তর করিলাম—"আমার পাগড়ী ছিল না।" মধ্যভারতবাসিনীরা আরও সন্দিগ্ধ হইলেন, তাঁহারা ভাবিলেন. আমি তাঁহাদের কাছে চাতুরী করিতেছি। ঐ রমণী পুনরায় কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন;—"তোমার পাগড়ী তুমি বেচিয়া খাইয়াছ?" মথুরাবাসী সঙ্গীটি বলিলেন "পাগড়ী বেচিয়া খাওয়া হিন্দুস্থানীদের একটা গাল, নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় রমণীরা আপনার প্রতি ঐ গালি প্রয়োগ করিল। তা হো'ক্. আপনি আপনার জাতীয়-পরিচ্ছদ (national dress) পরিত্যাগ করিবেন কেন?" আমি বুঝিতে পারিলাম, ইহারা নিতান্ত পল্লীবাসিনী, কখনও বৈদেশিক লোকের সংস্রবে আসে নাই, বোধ হয় এই প্রথম বাষ্পশকটারোহণ, সুতরাং চিরাচরিত সংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া গালি দিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তাহার পর, আমি বিনীত-ভাবে বুঝাইয়া বলিলাম "সর্ব্বদা কোন মস্তকাবরণ ব্যবহার করা বাঙ্গালীদের প্রথা নহে, অতএব আমি স্বেচ্ছাক্রমে অনাবৃত-মস্তক হই নাই, উহাতে আপনারা বিরক্ত হইবেন না।" নবাগতা বধূ পূর্ব্বোক্ত মহিলার কাণে কাণে কি বলিলেন। তিনি আবার আমাকে বলিলেন "তোমার গায়ে চাদর আছে, উহা মাথায় জড়াইয়াও ত বসিতে পার?" এক গৈরিক-বসন উদাসীন গাড়ীতে ছিলেন। তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন,—"বাবু! বাইজী উত্তম পরামর্শ দিয়াছেন।" আমি উদাসীনের কথার

উত্তরে জিজ্ঞাসা করিলাম "স্বামীজী! পাগড়ী মাথায় দিয়া বসিলে কিছু পুণ্য-সঞ্চয় হইতে পারে? তাহা হইলে না হয় দেই।" উদাসীন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন;—"তোমার যাহা ইচ্ছা কর, উগারাশরে বিরাজ কর, তোমরা যখন নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহাদিতে যাও, তখন কুটুম্বমহিলারা তোমাদের লেঙ্গাশির দেখে?" আমি বলিলাম "হাঁ দেখে!" এই বার উদাসীন ও মহিলারা নিরস্ত হইলেন। তখন আমার মনে একটা বিরুদ্ধ চিন্তার উদয় হইল, ভাবিলাম উহাদিগকে যাহাই বলিনা কেন, কিন্তু পৃথিবীতে সমস্ত সভ্যজাতিরই কোন না কোন আকারের মস্তকাবরণ আছে, বাঙ্গালীরও যে পূর্ব্বকালে মস্তকাবরণ ছিল, যজ্ঞকালে মস্তকে নূতন গামছা জড়াইয়া যজ্ঞ করাই তাহার প্রমাণ। অতএব কতকাল পূর্ব্বে কোন্ দেবতার অভিসম্পাতে বাঙ্গালী উষ্ণীষ-শূন্য হইয়াছে বিশেষ ভাবে তাহার অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

কিছুক্ষণ পরেই ভৈরবগড় ষ্টেশনে গিয়া গাড়ী থামিল। অনতিদূরে মহীসাগর নামক একটি অনতিপ্রশস্ত নদ বিমল সলিল বক্ষে করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। তৃষ্ণার্ত্ত আরোহিগণ সস্পৃহ-নয়নে নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল কিন্তু ঐ ষ্টেশনে অতি অল্প সময় গাড়ী থামে, সুতরাং কেহই নামিয়া জলপান করিতে পারিল না। কয়েকটি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া শেষ বেলায় বাষ্পশকট দোহদ ষ্টেশনে গিয়া উপনীত হইল। আহা কি সুন্দর দৃষ্টিরম্য স্থান! চতুর্দ্দিকে অনাবৃত প্রান্তর, মধ্যে মধ্যে পুষ্পোদ্যান-শোভিত আবাসবাটী। এখানে সমুদয়ই প্রায় বেলাতী খোলার ঘর কিন্তু নির্ম্মাণ-কৌশলে অতিসুন্দর দেখাইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িল। এই বার শকট অতিদ্রুতবেগে চলিল। যখন আমরা আনন্দ-জংসনে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ। চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ

তরুরাজি স্থানটির গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করিয়া শোভা পাইতেছে। ষ্টেশনটি কঙ্করযুক্ত বালুকাময় স্থানে অবস্থিত। ষ্টেশনের অনতিদূরে দুইটি অতি বড় ইঁদারা। উহা হইতে চরখীকলে নিয়ত জল তোলা হইতেছে। ষ্টেশনটি নিরীক্ষণ করিয়া একটি প্রদর্শনী বলিয়া মনে হইল। সারি সারি মিষ্টান্নের দোকানে কেবল লোকের কলরব; ফেরিওয়ালারা আলোক হস্তে চীৎকার করিয়া আরোহীদিগের ব্যস্ততা বৃদ্ধি করিতেছে। গাড়ী হইতে নামিয়া শুনিলাম আমাদের গাড়ী আসিতে এখনও এক ঘণ্টা বিলম্ব। সঙ্গীদের সহিত শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট একটি সুবৃহৎ আম্রতরুর মূলে গিয়া বসিলাম। গৌরাঙ্গী ব্রাহ্মণ-বালিকারা—'ব্রাহ্মণাচা পানীয়া' 'ব্রাহ্মণাচা পানীয়া' এইরূপ রব করিতে করিতে জল বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। আমাদিগকে কলাকন্ (এক প্রকার মিষ্টান্ন) কিনিতে দেখিয়াই একটি বালিকা ছুটিয়া আসিল। বালিকার বয়স ত্রয়োদশ বৎসরের অধিক নহে কিন্তু নিয়ত ষ্টেসনে জল বিক্রয় করায় চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কাঁকাল হইতে জলপূর্ণ নূতন কলশীটি নামাইয়া প্রথম একভাণ্ড জল দিল, আমি উহা দ্বারা হাত পা ধুইয়া লইলাম, দ্বিতীয় ভাণ্ড চাহিতেই ভ্রু ঘোঁচাইয়া গুজরাটী ভাষায় বলিল "প্রত্যেক ভাণ্ডের মূল্য এক পয়সা" আমি কোন কথা না বলিয়া দ্বিতীয় ভাণ্ড দ্বারা মুখ ধোয়া গামছা ভিঁজান এবং গা পোঁছা শেষ করিলাম। তাহার পর, পানার্থ তৃতীয় ভাণ্ড গ্রহণ করিলে বালিকা যেন একটু সন্দিহান হইয়া রহিল। ও দেশের লোকে এক ভাঁড়ের অধিক কিনিল না. আমি একেবারে তিন ভাঁড় লইলাম। বালিকা ভাবিতে লাগিল 'তিন ভাঁড়ের ঠিক মূল্য দিবে কি?' বহুদূর হইতে যেমন আনন্দ জংসনের জলের প্রশংসা শুনিয়া পিপাসিত-হৃদয়ে আসিয়াছিলাম, জলপান করিয়া তেমনি পরিতৃপ্ত হইলাম। আনন্দের জল অতি স্বচ্ছ

শীতল এবং মধুর, যেন অমৃত। জলপান শেষ হইলে চারিটি পয়সা বালিকার হাতে দিলাম। বালিকা ঈষৎ হাস্যমুখে একটা পয়সা আমার সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া কলস কাঁকালে তুলিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দিল্লী হইতে বোম্বাইগামী বাষ্প-শকট বলদৃপ্ত হস্তি-যূথের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল। এই সুদীর্ঘ শকটমালায় শতাধিক গাড়ী সংযোজিত ছিল। এখানে রতলাম-গোধরা-রেলপথ বড়োদা বোম্বাই-সেণ্ট্রাল-ইণ্ডিয়া রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই বার আমরা বড়োদা-বোম্বাই-সেণ্ট্রাল-ইণ্ডিয়া রেলপথের প্লাট্‌ফরমে গিয়া গাড়ী খুঁজিতে আরম্ভ করিলাম। দিল্লী হইতে সমস্ত পথ লোক লইতে লইতে আসিয়াছে, সুতরাং প্রায় গাড়ীই পরিপূর্ণ। তাহার উপর আনন্দ জংসনের জনসঙ্ঘ। ভারবাহীটি বিলক্ষণ চতুর, সে বহু অনুসন্ধান করিয়া একটি গাড়ীতে তুলিয়া দিল। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল আনন্দ জংসনে গাড়ী থামে। ঐ সময় লোকের কলরবে কানে তালা লাগিতে লাগিল। শকটমালা ষ্টেসন ত্যাগ করিলে যেন একটা মহাশান্তি পাইলাম। তাহার পর, সহযাত্রিগণের সহিত আলাপ পরিচয় হইল। ঐ গাড়ীতে শিক্ষিত ভিন্ন অন্য লোক একটিও ছিল না। আরোহিগণ যোধপুরের অধিবাসী, সকলেই বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা মারোয়ারী ভাষায় অতিবিনীতভাবে বলিলেন;—"মহাশয়! আপনি শিক্ষকতা করেন, আমরা এখনও ছাত্র, যদি গল্প কিংবা কথা বার্ত্তায় কোন বেয়াদবী হয় মাপ করিবেন"। তাহার পর, বিদ্যার্থিগণ মারোয়ারি ভাষায় একটি প্রহসনের অভিনয় আরম্ভ করিলেন। সে অভিনয়ের রসমাধুর্য্য লিখিয়া বুঝাইবার শক্তি নাই। তাঁহাদের অঙ্গসঞ্চালন মুখ-চোখের ভঙ্গী সর্ব্বোপরি মারোয়ারী ভাষার শব্দ-বৈচিত্র্যে আমি মুগ্ধ হইলাম। এক এক বার সেই

কৌতুকাবহ বক্তৃতা শুনিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে দম বন্ধ হইতে লাগিল। যখন বড়োদা-ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিল, তখন রাত্রি বারোটা। আমি যোধপুরী বন্ধুদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। দেশীয় রাজ্যের সহরগুলিতে গভীর রাত্রিতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। একটি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাঁহার দৌহিত্রীর সহিত পান্থশালায় যাইতেছিলেন, আমি ভারবাহী সহ তাঁহাদের সঙ্গী হইলাম। একরূপ নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি কাটিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইলে একখানি গাড়ী ডাকিয়া বড়োদা সহর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় দুই মাইল দূরে। বড়োদার রাজকীয় সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ (Principal) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজারাম কাশীনাথ শাস্ত্রী—মহাশয় আমাকে কলেজে সমুপস্থিত দেখিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। সেখানে কলেজ্-প্রাঙ্গণের ধারাযন্ত্র-নিঃসৃত জলে স্নানাদি শেষ করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে এক মঠের অধিকারী কোন অধ্যাপকের সহিত তাঁহার মঠে (দেবালয়ে) গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

এই বড়োদা নগরী যে প্রদেশে অবস্থিত ইহাই প্রাচীন গুর্জ্জর রাজ্য। 'গুর্জ্জর-রাষ্ট্র' শব্দের অপভ্রংশে এই প্রদেশ গুজরাট্ নামে অভিহিত (১)। গুজরাট্ বলিলে এখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তরাংশ সমুদ্রতীরবর্ত্তী বহুদূর পর্য্যন্ত বুঝায় কিন্তু পুরাকালে গুর্জ্জর (গুজরাট্) রাজ্যের সীমা এত বিস্তৃত ছিল না। বর্ত্তমান বড়োদা নগরী ও ইহার

(১) পঞ্জাবের অন্তর্গত রাওলপিণ্ডি জেলার পূর্ব্বপ্রান্তে এক গুজরাট্ প্রদেশ আছে, এই গুর্জ্জররাষ্ট্র হইতে ঐ প্রদেশ সম্পূর্ণ পৃথক্।

চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কিয়দংশ গুজরাট্ নামে অভিহিত হইত। পুরাকাল হইতে গুর্জ্জর প্রদেশে বহুসংখ্যক নৃপতি শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন চীন-পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙ গুর্জ্জর রাজ্যে আগমন করেন, তখন বলমের নামক স্থানে ইহার রাজধানী ছিল। একটি অল্পবয়স্ক ক্ষত্রিয় নরপতি গুর্জ্জরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই রাজ্যে চাপোৎকট বংশীয় রাজগণের অভ্যুদয় হয়। উক্ত বংশীয় বনরাজ অনহিলপত্তনে রাজধানী স্থাপন করেন। ৯৯৮ বিক্রমসংবতে গুর্জ্জর-রাজ্য চৌলুক্য-রাজগণের হস্তগত হয়। ১৩০০ বিক্রম সংবতে বাঘেলা-বংশীয় বিশালদেব গুর্জ্জরের অধিকার লাভ করেন। উহার কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী পরে উক্ত রাজ্য পাঠানগণের শাসনাধীন হয়। পাঠানেরা অনেক দিন গুর্জ্জর প্রদেশে আধিপত্য করিয়া হীনবল হইলে দিল্লীর মোগল সম্রাটেরা ঐ জনপদ অধিকার করেন। মোগলসাম্রাজ্যের শেষ ভাগে গুর্জ্জর মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তগত হয়। এখনও মহারাষ্ট্রীয়গণই এই রাজ্য শাসন করিতেছেন। গায়কবাড়-বংশীয় নৃপতিগণ এখন গুর্জ্জর প্রদেশের প্রভু। আমরা প্রসঙ্গক্রমে এখানে গায়কবাড়বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বিবৃত করিতেছি।

মহারাষ্ট্র-প্রদেশে মরাঠা নামক একটি জাতি বাস করে। উহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ঐ জাতির মধ্যে যাহারা কুলবন্ত-মরাঠে (কুলীন মরাঠা) বলিয়া পরিচিত, তাহারা এখন ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া থাকে। মরাঠাজাতি খর্ব্বকায় বলিষ্ঠ সমরপ্রিয় বুদ্ধিমান্ ও স্বাধীনতা-প্রয়াসী। শ্রদ্ধা, চিত্তের দৃঢ়তা, শ্রমশক্তি, আতিথেয়তা, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি মরাঠা চরিত্রের বিশেষত্ব। মরাঠাজাতি উপবীত ধারণ করে এবং বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী। শিশোদিয়, পওয়ার, ভোঁশলে, শিন্দে, শালুঙ্কে, চৌহান, মোরে, গায়কবাড় প্রভৃতি ৯৫টি কুল

মরাঠাজাতির মধ্যে বংশ-মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন যে সকল মরাঠা কৃষিজীবী ও ব্রাত্যভাবাপন্ন তাহারা সাধারণতঃ কুন্‌বী নামে পরিচিত। কুন্‌বীরা যৌবনপ্রাপ্তি না ঘটিলে কন্যার বিবাহ দেয় না এবং উহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। প্রথমোক্ত উপবীতধারী মরাঠারা কুন্‌বী-মরাঠার কন্যার পাণি গ্রহণ করে কিন্তু কোন কুন্‌বী-মরাঠাকে কন্যা দান করে না। কুন্‌বী-মরাঠারা ধনবান্ এবং ক্ষমতাশালী হইলে আপনাদিগকে "কুলবন্ত মরাঠে" বলিয়া পরিচিত করে। বড়োদার গায়কবাড়-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দমাজী প্রথমোক্ত কুলবন্ত-মরাঠা-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। "গায়কবাড়্" তাঁহার কুলোপাধি। তিনি প্রথমে মহারাষ্ট্র-রাজ সাহুর অধীনে সৈনিক-বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। বালাপুরের যুদ্ধে দমাজী অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করেন। উহাতে সেনাপতি খণ্ডেরাও-ধাবারাই অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদোন্নতির নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে রাজা সাহু দমাজীকে সহযোগী সেনাপতির পদ ও "সমসের বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। দমাজীর পরলোক গমনের পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পিলাজীরাও গায়কবাড়্-পদে অভিষিক্ত হন কিছুকাল পরে পূর্ব্বোক্ত খণ্ডেরাওর পুত্র ত্র্যম্বকরাও এবং পিলাজী উভয়ে মিলিত হইয়া অন্যান্য মহারাষ্ট্র-সামন্তদিগের সহিত পেশবার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ঐ যুদ্ধে ত্র্যম্বকরাও পেশবা কর্ত্তৃক পরাজিত এবং নিহত হন। পেশবা অবস্থা বিবেচনায় সমস্ত ক্রোধ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ত্র্যম্বকের শিশু পুত্র যশোবন্ত রাওকে পিতৃপদে নিযুক্ত করিয়া পিলাজীকে পূর্ব্বের সেই সহযোগী সেনাপতির পদ প্রত্যর্পণ করেন এবং এই উপলক্ষে তাঁহাকে "সেনখাস্ খেল্" উপাধি ও প্রদত্ত হয়। গুজরাটের রাজস্বের অর্দ্ধাংশ পেশবাকে অর্পণ করিতে হইবে এই অঙ্গীকারে যশোবন্তরাওকে গুজরাটের সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করেন।

দিল্লীর সম্রাট্ ঐ প্রদেশের কয়েকটি রাজ্যের কর পেশবাকে প্রদান করিতেন। তিনি পিলাজীকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া ঐ প্রদেশর শাসন-ভার যোধপুররাজ অভয়সিংহের হস্তে অর্পণ করিলেন। ইহাতে পিলাজী ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং তাঁহার সেনাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অনেক স্থান অধিকার করিয়া লয়েন। অভয়সিংহ সম্মুখ যুদ্ধে পিলাজীকে পরাজিত করিতে না পারিয়া গোপনে দস্যুর সাহায্যে তাঁহার হত্যা সংসাধন করেন। পিলাজীর মরণে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় দমাজী গায়কবাড়্-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এ দিকে সেনাপতি যশোবন্তরাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও কার্য্যভার বহনে অসমর্থ হওয়ায় গায়কবাড়্-বংশের উপরই গুজরাটের শাসন-ভার অর্পিত হয়। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে পিলাজীর ভ্রাতা মহাজী বড়োদানগরী অধিকার করিয়া লয়েন, তদবধি-বড়োদানগরীতেই গায়কবাড় বংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত আছে। বড়োদার প্রাচীন সংস্কৃত নাম "বটোদরপত্তন" উহার অপভ্রংশে ঐ নগরী এখন "বড়োদা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

তারাবাই যখন আপন পৌত্র সেতারার রাজাকে বালাজী বাজিরাও-পেশবার অধীনতা হইতে মুক্ত করেন, তখন দমাজী গায়কবাড্ তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনায় পেশবা ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক দমাজীকে ধরিয়া আনিয়া বন্দীকৃত করেন। শেষে দমাজী গুজ্রাটের বাকী রাজস্ব পনর লক্ষ টাকা প্রদানে স্বীকৃত হইলে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। দমাজীর পিতা পিলাজী কাঠিয়াবাড়-প্রদেশের বহু স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দমাজীর মুক্তির পর বৎসর পেশবা উহার কিয়দংশ গ্রহণ করেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি তারিখে আহ্মাদশাহ আবদালির সহিত পাণিপথে যে যুদ্ধ হয়, উহাতে মহারাষ্ট্রীয়দের পক্ষে দমাজী স্বীয় সৈন্য লইয়া ঐ সংগ্রামে বিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত সময়ে

অসংখ্য মহারাষ্ট্র-বীর ধরাশায়ী হইয়াছিল। দমাজী হতাবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। সেই অবধি তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ রাজ্যরক্ষায় মনোযোগী হন। তিনি দুই তিনটি স্থান ব্যতীত সমস্ত গুজরাট্ রাজ্যে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করেন এবং এদরের রাঠোরবংশীয় রাজাদিগকে কর দানে বাধ্য করেন। এইরূপে দমাজী স্বীয় পরাক্রম-বলে দক্ষিণভারতে এক জন শৌর্য্যশালী ভূপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হন।

কিছুদিন পরে পেশবা মধুরাওর সেনাপতি রঘুনাথরাও (রাঘব) প্রভুর বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন। দমাজী রঘুনাথরাওর সহায়তার জন্য স্বীয় পুত্র গোবিন্দরাওকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল কিন্তু শেষে রঘুনাথরাও (রাঘব) পরাস্ত হইলেন। পেশবা গোবিন্দরাওকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এই ঘটনায় দমাজীকে ৫২৫০০০ টাকা প্রদান করিয়া পেশবার সহিত সন্ধি করিতে হইল। আরও তিনি শান্তির সময়ে ৩০০০ এবং যুদ্ধের সময় ৪০০০ অশ্বারোহী সৈন্য প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দমাজীর মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথমার গর্ভে গোবিন্দরাও, দ্বিতীয়ার গর্ভে সভাজীরাও এবং ফতেসিংহ আর তৃতীয়ার গর্ভে মাণিকজী জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত পুত্রগণের মধ্যে দ্বিতীয়ার গর্ভজাত সভাজীরাও বয়োজ্যেষ্ঠ। পিতার মৃত্যুকালে প্রথমার গর্ভজাত গোবিন্দরাও বন্দীভাবে পুণায় ছিলেন। তিনি সেখানে পেশবা মধুরাওকে বহুমূল্য উপঢৌকনে পরিতুষ্ট করিয়া এবং পূর্ব্বকৃত সন্ধি অনুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া মধুরাওর নিকট হইতে নিজের নামে রাজ্য-শাসনের অনুমতি এবং "সেনখাস্ খেল" উপাধি গ্রহণ করিলেন। এ দিকে ফতেসিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নির্ব্বোধ সভাজীকে বড়োদার সিংহাসনে স্থাপন করিয়া

রাজকার্য্য পরিচালনার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং পেশবার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত পুণায় যাত্রা করিলেন। ঐ সময় পেশবা মধুরাওর বংশধরগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। পেশবা লোভ-পরবশ হইয়া সভাজীর অধিকার স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে "সেন্‌খাস্‌খেল" উপাধিপ্রদান করিয়া ফতেসিংহকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিলেন। এই ঘটনায় গোবিন্দরাওর সহিত ফতেসিংহের বিবাদের সূত্রপাত হইল। ফতেসিংহ পেশবা মধুরাওকে জানাইলেন যে গোবিন্দরাও সম্ভবতঃ যুদ্ধের উদ্যোগ করিবেন। সুতরাং যে সকল সৈন্য পেশবার অধীনে রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে গুজরাটে রাখিলে ভাল হয়; আর সেই সৈন্যের ক্ষতিপূরণার্থ তিনি ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। কারণ, ফতেসিংহ পেশবার অভিসন্ধি বেশ বুঝিয়াছিলেন, তিনি ভাবিলেন পেশবা এখন যেরূপ ব্যবহারই করুন না কেন, কিন্তু সুযোগ পাইলে হয়ত কোন সময়ে আমাকেই আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিবেন। তিনি ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের বোম্বাই-গবর্মেণ্টের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু বিলাতের কোর্ট-অব্‌ডিরেক্টারেরা সে প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তবে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি ভরোচের রাজস্ব সম্বন্ধে একটি সন্ধি হইল।

এদিকে নারায়ণরাওর প্রাণবিনাশের পর রাঘব পেশবা হইলেন। আবার গোবিন্দরাওকে 'সেন্‌খাস্‌খেল্' উপাধি প্রদত্ত হইল। এ বার গোবিন্দরাওর সাহস বাড়িয়া গেল, তিনি ফতেসিংহের নিকট হইতে রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য গুজরাট্‌ যাত্রা করিলেন এবং অবিলম্বে বড়োদা নগরী অবরোধ করিলেন। রাঘব, নরোত্তমদাস্‌ নামক এক ব্যক্তিকে গোবিন্দরাওর পক্ষে সুরাটের দক্ষিণপ্রদেশের রাজস্ব আদায় করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ফতেসিংহ আসিয়া

তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। তাহাতে পেশবারাঘব কুপিত হইয়া গোবিন্দরাওর সহিত অবরোধে যোগ দিলেন। এদিকে ফতেসিংহ হোলকার এবং সিন্ধিয়ার সৈন্য লইয়া রাঘবের সৈন্যদিগকে অক্রমণ করিলেন। রাঘব পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। গোবিন্দরাও এবং খণ্ডেরাও প্রভৃতিও পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। শেষে রাঘব ইংরাজ-গমের্ণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি ফতেসিংহের সহিত একটি সন্ধি হয়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর ফতেসিংহের মৃত্যু হইলে দমাজীর অপর পুত্র মাণিকজী রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সভাজীর নামে রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে সভাজীর মৃত্যু হইল, পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দরাও গায়কবাড় বড়োদার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গোবিন্দরাওর মৃত্যু হয়। গোবিন্দরাওর একাদশটি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে সাতটী গূঢ়জ। গোবিন্দরাওর জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দরাও বড়োদার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার তেমন বুদ্ধি ছিল না, সুতরাং গোবিন্দ-রাওর গূঢ়জ পুত্র কণোজীরাও রাজ্যের সকল ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বড়োদা-রাজ্যের পূর্ব্বতন মন্ত্রী রাওজী আপ্পাজী আনন্দরাওর সহায়তার নিমিত্ত কণোজীরাওর হস্ত হইতে রাজকীয় মুদ্রা (শিলমোহর) বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। উভয় পক্ষে মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল। রাওজীর পক্ষে তাঁহার ভ্রাতা বাবাজী ছিলেন। তাঁহার অধীনে গুজরাটি অশ্বারোহী সৈন্যদল ও সাতহাজার আরব সেনা ছিল। সেই সময় মঙ্গলপারিখ ও সামুএলবিচর নামে দুইজন সরকার অধিক সুদে টাকা সরবরাহ করিয়া ঐ সেনাদলকে প্রতিপালন করিত। সেনারা বেতন পাইলে তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিত। সুতরাং সেনাগণ সরকারদিগের অত্যন্ত বশীভূত ছিল।

উক্ত দুইজন সরকার বাবাজীর পক্ষে থাকায় আনন্দরাওর পক্ষই প্রবল হইল। এদিকে কণোজীর পক্ষও নিতান্ত সহায়শূন্য ছিল না। তাঁহার পিতৃব্য মলহররাও করির নামক স্থানের জায়গীরদার ছিলেন। কণোজী রাজ্য পাইলে তাঁহার বাকী রাজস্বের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে এবং ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট হইতে কর গ্রহণ করা হইবে না এইরূপ অঙ্গীকার করিলে মলহর তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে সেনা সংগ্রহ করিয়া সহসা বড়োদা নগরী আক্রমণ করিলেন। রাওজী অনন্যোপায় হইয়া আনন্দরাওর পক্ষে বোম্বাইয়ের ইংরেজ-গবর্মেণ্টকে বলিয়া পাঠাইলেন যে মলহররাওর বিপক্ষ হইয়া যদি ইংরাজেরা আনন্দরাওর সাহায্য করেন, তাহা হইলে আনন্দরাও পাঁচ দল ইংরাজ-সেনার ব্যয় যোগাইতে প্রস্তুত আছেন।

বোম্বাইএর শাসনকর্ত্তা ডন্‌কান সাহেব ভারত গবর্মেণ্টের অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন কিন্তু অনেক অপেক্ষা করিয়াও কোন মতামত পাইলেন না। শেষে মেজর-আলেক্‌জাণ্ডার্ ওয়াকারকে সেনাপতি পদে নিয়োগ করিয়া ষোলশত সৈন্য সহ বড়োদায় প্রেরণ করিলেন। তাহাকে বলিয়া দিলেন প্রথমে মীমাংসার চেষ্টা করিবে. তাহাতে সুবিধা না হইলে রাওজীর সহায় হইয়া মলহররাওর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে। মলহররাও অবস্থা বুঝিয়া প্রথমতঃ যেন ভীত হইয়াছেন, এইরূপ ভাব দেখাইলেন। কেবল মীমাংসার কথা উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময়ে সহসা ইংরেজ-সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহাকেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে হইল। ঐ যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের পঞ্চাশ জন সেনা নিহত হয়। এদিকে মলহররাও গোপনে বাবাজীর অনেক সৈন্য ভাঙ্গাইয়া লইতে লাগিলেন। ওয়াকার্‌সাহেব দেখিলেন এত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান থাকা উচিত নয়। তিনি বোম্বাইতে সংবাদ দিলেন। বোম্বাই-

গবর্মেণ্ট আরও কতকগুলি সৈন্য সহ সার্ উইলিয়ম্ ক্লার্কসাহেবকে বড়োদায় পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বড়োদায় উপস্থিত হইয়াই মলহররাওকে আক্রমণ করিলেন। মলহররাও নিরুপায় হইয়া আত্ম সমর্পণ করিলেন। ইংরেজগবর্মেণ্ট. ওয়াকার্ সাহেবকে বড়োদার পলিটিকেল্-এজেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। স্থির হইল—'মলহররাও নেরিয়েদ নামক স্থানে বাস করিবেন এবং মাসিক একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা বৃত্তি পাইবেন। যদি ভাল ব্যবহার করেন তাহা হইলে বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে। কণোজী বড়োদায় বন্দীভাবে রহিলেন। আনন্দরাও ইংরেজ-গবর্মেণ্টের একদল সেনা রাখিবেন আর সুরাটও চৌরাশী জেলার চৌথ ইংরেজগবর্মেণ্টকে প্রদান করিবেন। রাওজী আপ্পাজী আজীবন মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত থাকিবেন এবং ইংরেজগবর্মেণ্ট তাঁহার পুত্র ভ্রাতা ভ্রাতুস্পুত্র ভাগিনেয় ও বন্ধু বান্ধবদিগের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিবেন।'

এদিকে বড়োদা-রাজকোষের অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইল। মন্ত্রী রাওজী আপ্পাজী তাহার সুশৃঙ্খলা বিধান করিতে সমর্থ হইলেন না, সুতরাং ইংরেজগবর্মেণ্টের সাহায্য লইয়া কার্য্য করিতে হইল। ঐ সময় গায়কবাড়বংশীয় গণপত্ রাও এবং মুরারিরাও আনন্দরাওর বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শেষে আপ্পাজীর প্রেরিত সৈন্যগণের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়া ধাররাজ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। দেখিতে দেখিতে বড়োদায় আর এক নূতন বিভ্রাট উপস্থিত হইল। আরব দেশীয় সৈন্যগণ বহুদিন বেতন না পাওয়ায় নগর মধ্যে যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিল। বহু চেষ্টায়ও তাহাদের দমন করিতে পারা গেল না। তাহার পর, কি প্রকারে তাহাদিগকে শাসন করা যায় এইরূপ পরামর্শ চলিতে লাগিল। আরবেরা ভাবিল, 'তাহাদিগকে অচিরে বড়োদা

হইতে নিষ্কাশিত করিবার মন্ত্রণা হইতেছে।' সুতরাং আর তাহারা কালক্ষেপ না করিয়া গায়কবাড় আনন্দরাওকে বন্দী করিল এবং কণোজীকে মুক্ত করিয়া দিল। ঐ সময় মলহররাও পূর্ব্ব-কথিত নেরিয়াদ নামক স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। চতুর্দ্দিকে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পলিটিকেল্-এজেণ্ট প্রথম মিষ্ট কথায় আরব-দিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। শেষে বোম্বাই হইতে ইংরাজ-সৈন্য আনাইয়া বড়োদা অবরোধ করিলেন। আরবেরা গৃহের অভ্যন্তর হইতে বন্দুক ছুড়িয়া অনেক ইংরেজসৈন্য বিনাশ করিল। কিন্তু অধিক দিন ঐ অবস্থায় কার্য্য করিতে পারিল না, দশ দিনের পর আরবেরা নিজেই প্রস্তাব করিল,—"আমাদের প্রাপ্য অর্থ পাইলে আমরা দেশত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি"। তাহাদের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ প্রায় সতর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। রাজকোষে এত অর্থ নাই, সুতরাং ইষ্টইণ্ডিয়া-কোম্পানী স্বয়ং অর্দ্ধেক ঋণ দিলেন এবং প্রতিভূ হইয়া অন্যান্য কুঠিয়াল-দিগের নিকট হইতে অপর অর্দ্ধেক ঋণ দেওয়াইলেন। অধিকাংশ আরব-সেনা বাকী বেতন পাইয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ঐ সময় বড়োদা হইতে কণোজী পলায়ন করিলেন এবং বহু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইংরেজ-সেনানী হোম্‌সের অসাধারণ পরাক্রমে পরাজিত হইলেন। তাঁহার মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। শেষে বিশ্বাসঘাতকতা করায় ইংরেজগবর্মেণ্ট তাঁহাকে মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। কিছু দিন পরে সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার সহকারী মলহররাও নেরিয়াদ নামক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেনাপতি বাবাজীর সৈন্য তাঁহাকে ধরিয়া ইংরেজের হস্তে অর্পণ করিল। ইংরেজেরা তাঁহাকে বোম্বাই-দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন, সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইংরেজরাজের সাহায্যে আনন্দরাও গায়কবাড় বড়োদার সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাওজী আপ্পাজী মন্ত্রী, বাবাজী সেনাপতি এবং লেপ্‌টেনেণ্টকর্ণেল্ ওয়াকার ইংরেজপক্ষে রেসিডেণ্ট বা পলিটিকেল্-এজেণ্ট রহিলেন। তখন রাজ্যের আয় যাহা, ব্যয় তদপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং ঋণ পরিশোধের কোন উপায় ছিল না। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগবর্মেণ্ট গায়কবাড়ের সহিত একটি নূতন সন্ধি করিলেন। পূর্ব্বে গায়কবাড়কে দুই সহস্র সৈন্য রাখিতে হইত, নূতন সন্ধি অনুসারে তাঁহাকে তিন সহস্র পদাতিক ও এক দল গোলন্দাজ সৈন্য রাখিতে হইল। ঐ সকল সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিদূন বারো লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি বিলি করা হইল। তদ্ভিন্ন ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত তিনটি প্রদেশ, সুরাটের চৌথ ও প্রায় তেরো লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ইংরেজ-গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পিত হইল। সন্ধির দুই বৎসর পরে ইংরেজগবর্মেণ্ট দেখিলেন, সৈন্য রক্ষার্থ যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে ব্যয় সঙ্কুলন হইতেছে না। তখন গায়কবাড় আরও প্রায় দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল, ঋণ কিছুমাত্র কমে নাই, বরং সুদ বাড়িয়া যাইতেছে। সন্ধিতে কোন পক্ষেরই সুবিধা হয় নাই। ইংরেজ গবর্মেণ্ট সম্পত্তি পাইয়া সৈন্যের খরচ কুলাইতে পারিতেছেন না, গায়কবাড়েরও ঋণপরিশোধ হইতেছে না। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে রেসিডেণ্ট মেজর্ ওয়াকার কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করায় কাপ্তেন রিভেট্‌কার্ণাক রেসিডেণ্ট হইলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই-গবর্মেণ্ট প্রস্তাব করিলেন—'গায়কবাড় এক কোটি টাকা প্রদান করুন, তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি ছাড়িয়া দেওয়া হউক'। কিন্তু গবর্ণর্‌জেনেরল্ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বড়োদা-রাজ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হওয়ায় রাজস্ব আদায়ের বিশেষ অসুবিধা হইল। ঋণ ক্রমেই বাড়িয়া

যাইতে লাগিল। পর বৎসর পেশবাকে লইয়া এক গোলযোগ উপস্থিত হইল ইতিপূর্ব্বে আহাম্মদাবাদ ও কাঠিয়াবাড় প্রদেশে সাড়ে চারি লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি কয়েক বৎসরের জন্য পেশবাকে দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্টকাল শেষ হইলে পেশবা পুনরায় তাহা লেখা পড়া করিয়া লইতে চাহেন। গায়কবাড়ের পক্ষ হইতে বলা হয় যে পেশবা গায়কবাড়ের অধিকৃত ভরোচের খাজনা দেন নাই। তিনি গায়কবাড়কে না বলিয়া ঐ খাজনা ইংরেজগবর্মেণ্টকে দিয়াছেন। উভয় পক্ষের হিসাব নিকাশ করিবার জন্য বড়োদা-রাজ্যের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী গঙ্গাধরশাস্ত্রী পুণায় প্রেরিত হইলেন। গায়কবাড় পেশবার চরিত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টকে মধ্যস্থ করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট গঙ্গাধরশাস্ত্রীর রক্ষার জন্য দায়ী হন তথাপি গঙ্গাধর নিহত হইলেন। ইংরেজগবর্মেণ্ট ঐ সংবাদ শ্রুতমাত্র অপরাধী ত্র্যম্বকজী অংগ্রিয়াকে তাঁহাদের হস্তে প্রদানের নিমিত্ত পেশবাকে বলিয়া পাঠাইলেন। পেশবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ত্র্যম্বককে ধরিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ত্র্যম্বকজী রক্ষীদিগের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক পেশবার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইংরেজগবর্মেণ্ট ও নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহারা ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পুণা অবরোধ করিলেন। পেশবা ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ইংরেজপক্ষীয় এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবের প্রস্তাবমত সন্ধি হইয়া গেল। এত দিন পেশবা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অগ্রণী বলিয়া গণ্য ছিলেন। এই বার তিনি সেই সম্মান হইতে বঞ্চিত হইলেন। স্থির হইল—তাঁহার সমস্ত দাবি দাওয়া পরিশোধের জন্য বার্ষিক চারিলক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। তিনি আর গায়কবাড়-রাজ্যে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

পেশবার সহিত সন্ধি হইয়া গেলে গায়কবাড়ের সহিত ইংরেজ-গবর্মেণ্টের নিম্নলিখিত নিয়মে আর একটি সন্ধি হইল। কো ঃ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে উভয়পক্ষ উভয়পক্ষকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিবেন। গায়কবাড়ের তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ইংরেজের অধীনে থাকিবে। উভয়পক্ষ উভয়পক্ষের বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। ইংরেজগবর্মেণ্ট গায়কবাড়ের সহায়তার জন্য সৈন্যসংখ্যা আরও বাড়াইবেন। তাহাদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ গায়কবাড় ইংরেজগবর্মেণ্টকে গুজরাটের অংশবিশেষ ছাড়িয়া দিবেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর আনন্দরাওর মৃত্যু হয়। তৎপূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা ফতেসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল। ইনি বারো বৎসরকাল রাজকার্য্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। ফতেসিংহের মৃত্যু হইলে শিবাজীরাও সেই কার্য্য করিতেন। আনন্দ রাওর মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পুত্র থাকিতেও এই শিবাজীরাও রাজা হইয়া বসিলেন।

আনন্দরাও নির্ব্বোধ ছিলেন বলিয়া ইংরেজ গবর্মেণ্ট সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন কিন্তু শিবাজীরাও বুদ্ধিমান্ তাঁহার সময়ে সেরূপ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় নাই। তবে রেসিডেণ্ট যেরূপ ছিলেন সেই রূপই রহিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইর গবর্ণর্ এলফিন্ষ্টোন্ সাহেব বড়োদায় আসিয়া সর্ব্ববিষয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য নূতন বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। কতকগুলি নূতন নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু শিবাজীরাও তাহার কোন নিয়মই রক্ষা করিতে পারিলেন না। ক্রমেই ঋণ বাড়িতে লাগিল। অধিকন্তু ব্রিটিশ-গবর্মেণ্ট রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপনের সময়ে যাহাদিগকে অভয় দান করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এলফিন্ষ্টোন্ সাহেবের পর, সার্ জন্‌মেলকম্ বোম্বাইর গবর্ণর্ হন। তিনি শিবাজীকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন, কোন ফল হইল না। তাহার

পর, ইংরেজগবর্মেণ্ট রাজ্যের কোন কোন অংশ অধিকার করিয়া লইলেন। শিবাজী তাহা ও গ্রাহ্য করিলেন না। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লেয়ার্ বড়োদায় গিয়া গায়কবাড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্থির হইল—গায়কবাড় মহাজনদিগের ঋণ পরিশোধ কবিবেন এবং তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিবেন না। আর অশ্বারোহী সেনাদলের বেতন সময়মত দিবেন। ঐরূপ অঙ্গীকার প্রতিপালনের প্রতিভূ-স্বরূপ দশলক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখিলেন। কিন্তু শিবাজীর পক্ষে অঙ্গীকার প্রতিপালন করা কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি নানা বিষয়ে ইংরেজগবর্মেণ্টের পরামর্শের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহার পর, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অপরকে রাজ্য দিবার ভয় দেখান হইল, তাহাতেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। শেষে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট যখন সাতারার রাজা প্রতাপসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, তখন শিবাজী কি ভাবিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই সময় ইংরেজগবর্মেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া রাজ্যের যে অংশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়িয়া দিলেন এবং তৎপূর্ব্বে প্রতিভূস্বরূপ যে দশলক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাহাও প্রত্যর্পণ করিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর শিবাজীর মৃত্যু হয়। তাহার পর, তৎপুত্র গণপৎরাও রাজা হইলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে গণপৎরাও পরলোক গমন করেন। তাঁহার কোন সন্তান না থাকায় তঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খণ্ডেরাও সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুদিন পরে সিপাহি-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ঐ সময় খণ্ডেরাও যথাশক্তি ইংরেজরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ শান্তির পর, ইংরেজরাজ তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। পূর্ব্বতন সন্ধি অনুসারে গুজরাট-অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যয় স্বরূপ বার্ষিক যে তিন লক্ষ টাকা দিতে হইত, তাহা হইতে তাঁহাকে

অব্যাহতি দেওয়া হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ্চ ইংরাজগবর্মেণ্ট তাঁহাকে যে সনন্দ প্রদান করেন, তাহাতে গায়কবাড়্-রাজবংশের পুত্র অভাবে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয় এবং সেই সনন্দে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে His Highness বলিয়া সম্বোধন করেন। শেষে তিনি G. C. S. I. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নবেম্বর খণ্ডেরাও পরলোক গমন করেন।

খণ্ডেরাও পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা মলহররাও গায়কবাড় বড়োদার সিংহাসনে আরোহণ করেন। খণ্ডেরাওর বিধবা পত্নী যমুনাবাই তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ইংরেজগবর্মেণ্ট মলহররাওকে বলিয়া রাখিলেন 'যদি যমুনাবাইর গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মে তবে তিনিই রাজ্য পাইবেন।' কয়েক মাস পরে যমুনাবাই একটী কন্যা প্রসব করিলেন। সুতরাং মলহররাও নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে লাগিলেন। মলহররাও পূর্ব্বে খণ্ডেরাওর প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কারাবাস হয়। তাহার পর, কারাগৃহ হইতে একেবারে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এরূপ লোকের দ্বারা যে সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে এরূপ আশা কেহই করেন নাই। ফলেও তাহাই হইল। কিছুদিন পরে প্রজারা বিরক্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ইংরেজরাজের নিকট আবেদন করিল। ইংরেজগবর্মেণ্ট ঐ বিষয়ের অনুসন্ধানের নিমিত্ত এক কমিশন্ বসাইলেন। কমিশন্ আবেদনে উল্লিখিত অভিযোগ ব্যতীত রাজনীতি রাজস্ব এবং বিচার প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া এক মন্তব্য প্রেরণ করিলেন। উক্ত মন্তব্য পাঠ করিয়া লর্ডনর্থব্রুক্ মলহররাওকে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন সংস্কারের সময় দিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন—ঐ সময়ের মধ্যে যদি তিনি সুবন্দোবস্ত করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইবে। ১৮৭৫

খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ-রেসিডেণ্ট কর্ণেল্ ফেয়ারকে বিষ-প্রয়োগের চেষ্টার সংবাদ প্রচারিত হইল। অনুসন্ধানে মলহররাওর প্রতিই সন্দেহ হইল। গবর্ণর্ জেনারাল্ লর্ড নর্থব্রুক্ ঘোষণা করিলেন—'গায়কবাড়ের বিরুদ্ধে যখন সন্দেহ, তখন তাহার অনুসন্ধানের জন্য একটি আদালত বসিবে। যতদিন আদালতের বিচারে তিনি নির্দোষ প্রতিপন্ন না হন, তত দিন তিনি রাজ্য-শাসন করিতে পারিবেন না। তাঁহার স্থানে স্বয়ং ইংরেজগবর্মেণ্ট ঐ ভার গ্রহণ করিবেন। মলহররাও নিজের দোষ ক্ষালনের নিমিত্ত আদালতে প্রমাণাদি উপস্থিত করিবেন।'

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, গোয়ালিয়রের মহারাজ, জয়পুরের মহারাজ, মহীশূরের চিফকমিশনার্, সার্ দিনকরাও (গোয়ালিয়রের মন্ত্রী) ও পঞ্জাবের কমিশনার্ এই কয়েকজন বসিয়া আদালতে গায়কবাড়ের বিচার করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী এই আদালত বসে! বিচারকগণ মলহররাওর দোষ সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। তিন জন তাঁহাকে দোষী ও তিন জন নির্দোষ স্থির করেন। কিন্তু ইংরেজগবর্মেণ্ট তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনের অনুপযোগী বিবেচনা করেন এবং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রেল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দেন। খণ্ডেরাও সিপাহি-বিদ্রোহের সময় ইংরাজগবর্মেণ্টের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্মানের নিমিত্ত তাঁহার পত্নী যমুনাবাইকে একটি দত্তক গ্রহণ করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। তদনুসারে তিনি পিলাজীরাওর পুত্র দমাজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপ রাওর বংশীয় সয়াজী (সভাজী) রাওকে মনোনীত করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মে সয়াজী গায়কবাড় দ্বাদশ বৎসর বয়সে বড়োদার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইন্দোরের হোল্কারের মন্ত্রী সুবিখ্যাত সার্ টি মাধবরাও K. C. S. I. বড়োদার মন্ত্রি-পদে নিযুক্ত হইলেন।

এলিয়ট সাহেবকে নবীন নরপতির শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল। বালক সয়াজী যখন গ্রাম্য বালকদের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইতেন, তখন কেহই জানিত না যে, এই শিশুর ললাটে সিংহাসন প্রাপ্তির কথা লেখা আছে কিন্তু নিয়ন্তার এমনি অপূর্ব্ব নিয়ম যে, দেখিতে দেখিতে সমুদয় সম্পন্ন হইয়া গেল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই নবেম্বর যখন প্রিন্সঅব্ ওয়েলস্ (বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা, মৃত সপ্তম এড্ওয়ার্ড) বোম্বাই নগরে অর্ণবযান হইতে অবতরণ করেন, তখন বালক গায়কবাড় সেখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ১৯শে নবেম্বর যুবরাজ (প্রিন্সঅব্ওয়েলেস্) বড়োদায় গমন করিয়া গায়কবাড়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। যাঁহারা যুবরাজের সহিত আসিয়াছিলেন তাঁহারা এই নবাভিষিক্ত বালক গায়কবাড়ের গাম্ভীর্য্য ও রাজোচিত ব্যবহার সন্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীতে যে দরবার হয়, তাহাতে বালক সয়াজী গায়কবাড় উপস্থিত ছিলেন। দরবার হইতে তিনি "ফরজন্দ ই-খাস-দৌলত ইংলিসিয়া" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যমুনাবাইকে C. I. E. (ভারতমুকুট) উপাধি দেওয়া হয়। সয়াজী গায়কবাড় পরে যথাক্রমে K. C. S. I. এবং G. C. S, I, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় রাজন্যগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত ও আদর্শচরিত্র নরপতি। মহারাজ গায়কবাড় ইংরাজরাজ্যে আগমন করিলে তাঁহার সম্মানের নিমিত্ত একুশটি তোপ ছোড়া হয়। সৌরাষ্ট্র (কাঠিয়াবাড়) প্রদেশস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের বহুসংখ্যক রাজপুত রাজা বড়োদার মহারাজের করদ। তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যে প্রজাগণের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা, তাঁহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই,কেবল বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট কর গায়কবাড়কে প্রদান করেন। পূর্ব্বে গায়কবাড়ের সৈনিকগণ

কর আদায় করিতে যাইতেন, তাহাতে সময়ে সময়ে অশান্তি উপস্থিত হইত। এখন ইংরেজ-গবর্মেণ্ট মধ্যস্থ হওয়ায় সে অশান্তির সম্ভাবনা দূরীভূত হইয়াছে। রাজন্যবর্গ ইংরেজগবর্মেণ্টের হস্তে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করেন। গায়কবাড় ইংরেজরাজের নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হিন্দুর মহাতীর্থ সমুদ্রবেষ্টিত দ্বারকানগরী মহারাজ গায়কবাড়ের শাসনাধীন সৌরাষ্ট্ররাজ্যের অন্তর্গত। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ গায়কবাড়ের রাজ্যের বার্ষিক আয় ছিল ১৬৭৭৩৪৮০ (এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ তেয়াত্তর হাজার চারিশত আশী টাকা) কেহ কেহ বলেন "এখন রাজ্যের আয় উহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে।"

মহারাজ গায়কবাড়ের চারিটি সুদৃঢ় দুর্গ আছে। তন্মধ্যে শোণগড় ও শালের নামক দুইটি পার্ব্বত্য দুর্গ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শোণগড় সুরাটনগরের ৭৩ মাইল পূর্ব্বে তাপ্তী নদীর কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে নৌসরী জেলার মধ্যে অবস্থিত। এক সময়ে ঐস্থানে মহারাজ গায়কবাড়ের রাজধানী ছিল। উহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। শোণগড় দুর্গটি অতিশয় দুর্ভেদ্য। তাপ্তী নদীর তীরবর্ত্তী ওয়াজপুর দুর্গ এবং মলহর-দুর্গও অল্প শক্তিসম্পন্ন নহে। উক্ত চারিটি দুর্গই সুশিক্ষিত সৈন্যদ্বারা সংরক্ষিত। মহারাজের সৈন্যগণের মধ্যে দুইটি আগ্নেয়াস্ত্রধারী সৈন্যদল আছে। উহার প্রত্যেক দলে ৪২টি কামান, ১৫৪ জন বন্দুকধারী সৈন্য বিদ্যমান। উক্ত কামানসমূহের দুইটি সুবর্ণ ও দুইটি রৌপ্যদ্বারা নির্ম্মিত। এতদ্ভিন্ন ৪৪৭ জন নিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্য আছে। নিয়মিত পদাতিক সৈন্যের যে ছয়টি দল আছে, উহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৫০১৬ জন লোক অবস্থান করে। উহাদের দুইটি দল দেশীয় সৈন্যদ্বারাও অপর চারিটি য়ুরোপীয় সৈন্যদ্বারা গঠিত। ঐ সকল নিয়মিত সৈন্য ব্যতীত কতকগুলি অনিয়মিত সৈন্য আছে।

যে কোন সময়ে আহ্বান করিলেই তাহারা যুদ্ধ কার্য্যে যোগদান করিতে পারে। উহাদের সংখ্যা ৬২৩৭ তন্মধ্যে অশ্বারোহী ৪৪১০ অবশিষ্ট পদাতি ১৮২৭; ঐ সকল সৈন্য-পরিপোষণে মহারাজের কিঞ্চিদুন অর্দ্ধকোটি টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে।

মহারাজের একটি মন্ত্রিসভা আছে। উহা কতিপয় সদস্যের দ্বারা গঠিত। বিশেষ বিশেষ বিভাগের কার্য্য-পরিদর্শনের জন্য বিশেষ বিশেষ সদস্যের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। তদ্ভিন্ন রাজস্ব শান্তিরক্ষা শিক্ষা পূর্ত্তকার্য্য বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যবিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগেই পৃথক্ পৃথক্ সেক্রেটারি ও কর্ম্মচারিবর্গ নিযুক্ত আছেন। বড়োদা নগরীতে একটি উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণ আছে। সাধারণ লোকে উহাকে 'বরিষ্ট-আদালত' (হাইকোর্ট) বলিয়া থাকে। উক্ত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা চিফ্‌জষ্টিসের বেতন মাসিক ২২৫০৲ টাকা, দ্বিতীয় জজের বেতন ৩৮০০৲ টাকা। আর চারিজন বিভাগীয় জজ্ আছেন। বড়োদা নগরীর জন্য একজন জজ্, একজন সহযোগী জজ্ ও একজন সহকারী জজ্ নিযুক্ত আছেন। প্রধান বিচারপতি অপরাধীকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য কারাগৃহে প্রেরণ ত্রিশ বেত্রাঘাত এবং যে কোন সংখ্যক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। উহার অতিরিক্ত কোন দণ্ড দিতে হইলে মহারাজের আদেশ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। বিভাগীয় জজ্‌গণ অপরাধীকে সাত বৎসরের জন্য কারাগৃহে প্রেরণ ও ত্রিশ বেত্রাঘাতের আদেশ করিতে পারেন। বড়োদার সর্দ্দারকোর্ট বা বিশেষবিচারালয়টি কেবল রাজবংশীয়গণের ও রাজবংশসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিযোগের মীমাংসার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। গায়কবাড়-রাজ্য কয়েকটি জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক জেলায় মাজিষ্ট্রেট্ জজ্ ও মুন্সেফগণ শাসন ও বিচারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বড়োদা নগরের উপকণ্ঠে একজন ইংরেজ-রেসিডেণ্ট

বাস করেন। রাজ্যসংক্রান্ত কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে হয়। গায়কবাড়-রাজ্যে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২১৮৫০০৫, তন্মধ্যে হিন্দু ১৯৫৪৩৯০, জৈন ৪৬৭১৮, পার্সী ৮১১৮, মুসলমান ১৭৪৯৮০ খ্রীষ্টান ৭৭১ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ২৮ জন মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা উল্লিখিত সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

গায়কবাড়-রাজ্য দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। পূর্ব্বে খণ্ডেরাও গায়কবাড়ের রাজ্যকালে সংস্কৃত শিক্ষায় প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইত, এখন সংস্কৃত-শিক্ষার ব্যয় কথঞ্চিৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে বটে কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষায় বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। বড়োদা নগরীর রাজকীয় সংস্কৃতপাঠশালাটি চকমিলান বৃহৎ দ্বিতল বাটীতে অবস্থিত। পাঠশালার অঙ্গনে মন্দিরের বারান্দায় শিবলিঙ্গ এবং অন্যান্য দেবমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। পাঠশালার সর্ব্বাধিকারী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজারামকাশীনাথ শাস্ত্রী। শাস্ত্রী মহাশয় দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁহার অধীন আরও বহু অধ্যাপক আছেন। পাঠশালায় বেদ, উপনিষদ্, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্ব্বমীমাংসা, বেদান্ত, জ্যোতিষ স্মৃতি পুরাণ আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি অধীত হইয়া থাকে। বারাণসী রাজকীয়-কলেজের (Queen's college) ন্যায় অধ্যাপকগণ ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে সতরঞ্চের উপর ক্ষুদ্র গালিচায় তাকিয়া ঠেস দিয়া অধ্যাপনা করেন। বিদ্যার্থিগণ অধ্যাপকের সম্মুখে মণ্ডলী করিয়া বসিয়া পাঠ শ্রবণ করে। এখানকার সংস্কৃতপাঠশালার বিশেষত্ব এই যে, সংস্কৃতশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্থী-দিগকে একঘণ্টা করিয়া ইংরাজী-সাহিত্য পড়িতে হয়। বর্ত্তমান মহারাজের ইচ্ছা এই যে, প্রত্যেক সংস্কৃতবিদ্যার্থীই ইংরাজী-ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ইংরাজী শিক্ষা করে। তিনি

বলেন ;—"ইরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি ব্যতীত সংস্কৃতবিদ্যার উচ্চভাব অপরের হৃদয়ঙ্গম করাইবার ক্ষমতা জন্মে না।" তজ্জন্য কয়েক বৎসর গত হইল এই নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সংস্কৃত-পাঠশালার অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় প্রত্যেক শ্রেণীতে লইয়া গিয়া আমাকে সংস্কৃত অধ্যাপনা প্রদর্শন করিলেন। অধ্যক্ষ মহোদয় যেমন বিদ্বান্ তেমনি বিনয়ী এবং উন্নতমনাঃ; তাঁহার এবং অন্যান্য অধ্যাপক-গণের মধুর ব্যবহারে আমি পরম আপ্যায়িত হইলাম। বড়োদায় আজকাল ইংরাজী ও শিল্প-শিক্ষার অত্যন্ত প্রচার। বর্ত্তমান মহারাজ কিছুকাল পূর্ব্বে এখানে একটি কলেজ্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ কলেজে এম্, এ, পর্য্যন্ত পড়া হয়। কলেজ্‌টি বোম্বাইবিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। এতদ্ভিন্ন শিল্প-শিক্ষার নিমিত্ত এই রাজ্যে কতিপয় শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজের আদেশে প্রতিবৎসরই গায়কবাড় রাজ্যের নগর গ্রাম ও পল্লীসমূহে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সংপ্রতি ঐ রাজ্যের প্রজাগণের নিম্নশিক্ষা অবশ্য গ্রহণীয় বলিয়া আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

১৯শে বৈশাখ অপরাহ্ন দুইটার সময় পূর্ব্বোক্ত রাজারামশাস্ত্রী মহাশয়ের বাসায় গমন করিলাম। আমি যে পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, শাস্ত্রী মহাশয়ও সেই পল্লীস্থ কোন একটী বৃহৎ মঠে অবস্থান করেন। মহারাষ্ট্র-প্রদেশে কথকগণ "হরিদাস" নামে আখ্যাত। ঐ সময় একজন হরিদাস ঐ দেবালয়ের প্রশস্ত নাটমন্দিরে পুরাণব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন। প্রায় দুইশত পুরসুন্দরী প্রফুল্লপদ্মরাজির ন্যায় হরিদাস মহাশয়কে ঘিরিয়া বসিয়া পুরাণব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন। মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রমহিলারা সকলেই অল্প বিস্তর লেখা পড়া জানেন। তঁহাদের মধ্যে রীতিমত বিদুষী রমণীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। একটী অল্পবয়স্কা শিক্ষিতা মহিলা, হরিদাস মহাশয়ের

বর্ণিত পুরাণকথার মধ্যে একটী প্রশ্ন করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় কৌতূহলী হইয়া নীরবে আমাদিগকে ঐ বিতর্ক শুনিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা সোৎসুকচিত্তে অনেকক্ষণ পৌরাণিক বিচার শুনিলাম। হরিদাস মহাশয় বহুদর্শিতা প্রকটনের জন্যই হউক, অথবা ভ্রমক্রমেই হউক, এক যুগের ঘটনার মধ্যে পরবর্ত্তী যুগের ঘটনার গোঁজা মিল দিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু কোন সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া শেষে আমতা আমতা করিতে লাগিলেন। অপরা বিদুষী অগ্রসর হইয়া ঐ ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিলে কুলবধূদের মধ্যে একটী হাসির তরঙ্গ বহিয়া গেল। পুনরায় হরিদাস মহাশয়ের যথাপূর্ব্ব পুরাণ-ব্যাখ্যা চলিতে লাগিল। তাহার পর, শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে কিছুকাল বড়োদায় থাকিতে এবং তত্রত্য বার্ষিক সংস্কৃতপরীক্ষা দিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রাবণমাস পর্য্যন্ত বড়োদা নগরীতে অবস্থান করা আমার পক্ষে অসম্ভব জানিয়া শেষে আমাকে পুণা নগরীতে পরীক্ষা দিবার জন্য উপদেশ দিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "বঙ্গদেশে যেমন নবদ্বীপ, আর্য্যাবর্ত্তে যেমন কাশী, দক্ষিণাপথে সেই রূপ পুণা একটী বিদ্বজ্জন-সমাজ। তুমি যখন এত দূরে আসিয়াছ, অতএব উক্ত স্থানে পরীক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। আমি তাঁহার আদেশ পালনে স্বীকৃত হইলে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। আমি আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের অনেক পণ্ডিত দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজারাম-কাশীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় উদারচিত্ত ব্যক্তি অতি অল্পই আছেন। শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃতভাষায় আমাকে একখানি প্রশংসাপত্র দিলেন। (১) আমি উহা লইয়া সায়ংকালে দেবমন্দিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

(১) বঙ্গদেশান্তর্গত নবদ্বীপনিবাসিনঃ শ্রীশরচ্চন্দ্রশর্ম্মাণো বিবিধদেশান্ পর্য্যটন্তঃ শ্রীবড়োদারাজধানীমলঙ্কুর্ব্বণা মন্নিবাসস্থানং দৈবাৎ প্রাপ্তাস্তেন • চিরমৈভির্গীর্ব্বাণ-

২০ শে জ্যৈষ্ঠ ৯টার সময় বড়োদার সৈনিক-কার্য্যালয়ে গমন করিলাম। ঐ বাড়ীটী নগরের মধ্যভাগে পুরাতন রাজবাটীর সন্নিহিত। উক্ত বৃহৎ বাটীর তেতলায় সেনাপতির কার্য্যালয়। প্রধান সেনাপতি আনন্দরাও মহোদয় বড়োদার বর্ত্তমান মহারাজ সয়াজীগায়কবাড় মহোদয়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা। মহারাজের পরিচিত কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি মহারাজের নামে আমার পরিচয়জ্ঞাপক একখানি পত্র দিয়াছিলেন। আমি বড়োদায় আসিয়াই শুনিলাম, মহারাজ তিন চারি দিন হইল, গ্রীষ্মযাপনের নিমিত্ত নীলগিরিতে প্রস্থান করিয়াছেন। আমি পত্রখানি ফিরাইয়া লইয়া যাইব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু বড়োদার শাস্ত্রি-বন্ধুগণ মহারাজের ভ্রাতার হস্তে উহা প্রদান করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। সেই পত্রখানি দেওয়াই সৈনিক-কার্য্যালয়ে গমনের উদ্দেশ্য। প্রধান দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী বিদ্যমান। তাহাদের হস্তে পত্রখানি অর্পণ করিবামাত্র নিম্নতলের একজন পদাতিক ছুটিয়া গিয়া উহা সৈনিক-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ের হস্তে দিল এবং তাঁহার আদেশে একটী উৎকৃষ্ট গৃহে লইয়া গিয়া একখানি চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিল। যথাসময়ে আমি আহূত হইলাম। সেনাপতি মহাশয়ের চারিদিকে চারি জন সহকারীর

ভাষয়ালাপঃ সমভবৎ তত্রৈতেষাং নৈপুণ্যমবলোক্য বঙ্গা অপি সংস্কৃত-ভাষায়াং নিপুণা ভবন্তীত্যানন্দঃ সমজনীত্যেব কেবলং ন কিন্তু কলিকাতা রাজাধান্যা গবর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত কলেজনাম্নি বিদ্যালয়ে উপাধিপরীক্ষাং দত্বা প্রশংসাপত্রমাসাদিতবন্তঃ তেনচৈমে পঞ্চকাব্যাদৌ তথা প্রসিদ্ধতরাভিজ্ঞানশকুন্তলপ্রমুখনানাবিধনাটকেষু তথৈবচ মন্বাদি-স্মৃতিশাস্ত্রেষ্বপি কৃতপ্রযত্না ইতি নিশ্চিনুমঃ। অথৈতেষাং কুলশীলানুবর্ত্তনাদিকমবলোক্যেদং প্রতিষ্ঠাপত্রং দত্তমিতি শম্। সং ১৯৫২ বৈশাখে সিতপক্ষে নবম্যাং ভৃগৌ লেখো ব্যলেখি।

রাজারামকাশীনাথ শাস্ত্রী।

বড়োদারাজধানীস্থ সংস্কৃতপাঠশালাসর্ব্বাধিকারী।

কার্য্যালয়। মধ্যভাগে একটী গৃহে সেনাপতি একখানি উজ্জ্বল কেদারায় বসিয়া আছেন। আগন্তুকদের জন্য সম্মুখে একখানি উৎকৃষ্ট চেয়ার্ রক্ষিত হইয়াছে। আমি প্রবেশ করিবামাত্র তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া প্রণিপাত করিলেন এবং বসিতে অনুরোধ করিলেন। আমি আশীর্ব্বচন উচ্চারণ পূর্ব্বক বসিলে অতিবিনীতভাবে আলাপ আরম্ভ করিলেন। যে সময় আহ্বান করা হয়, তখনই সাক্ষাৎ-কারার্থীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া হয়, কোন্ ভাষায় কথোপকথন হইবে। আমি পূর্ব্বেই সংস্কৃত কিংবা হিন্দীতে আলাপ করিব বলিয়াছিলাম। তদনুসারে সেনাপতি মহাশয় আমার সহিত হিন্দীতে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। সেনাপতি অতীব উদারচরিত তঁহাকে দেখিলে যেন একটী মূর্ত্তিমান্ বিনয় বলিয়া বোধ হয়। ঐশ্বর্য্যের গৌরব কিংবা ক্ষমতার অভিমান কিছুমাত্র তঁহাতে লক্ষিত হইল না। আমি এক জন দূরতর প্রদেশের অধিবাসী হইলেও চিরপরিচিতের ন্যায় আমার সহিত সম্ভাষণ করিলেন। আমি কোথায় আছি এবং আহারাদির কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, আমি তাঁহার তত্ত্বাবধানে কোন স্থানে অবস্থিতি করি কিন্তু আমি বড়োদায় অধিক দিন থাকিতে পারিব না সুতরাং ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন তত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইল না। তাহার পর, তিনি বলিলেন "মহারাজ অল্প দিন হইল নীলগিরিতে গিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে আসিলেই সাক্ষাৎ হইত। যাহা হউক, বড়োদা ত্যাগের পূর্ব্বে অবশ্য যেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করা হয়"। আমি তাঁহার অনুরোধ পালন করিব, অঙ্গীকার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। আসার সময় সংস্কৃতপরীক্ষা-সমূহের সম্পাদক (Registrar) শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল মোড়ে বি, এ, মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-শিক্ষার একটি বিশেষত্ব এই, যে, উক্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্, এ, কিংবা বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিরাও সংস্কৃত ভাষায় একরূপ মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

২১শে বৈশাখ রাজারামকাশীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে মহারাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মণিভাইর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত রাজকীয় নূতন কার্য্যালয়ে গমন করিলাম। নূতন কার্য্যালয়টী রাজবাটী হইতে দূরে অবস্থিত। এই বাড়ী উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর বিস্তৃত। চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃক্ষশ্রেণী, দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী বিদ্যমান। মন্ত্রিসভা, রাজস্ব-কার্য্যালয়, জজ্ কোর্ট, হাইকোর্ট বা বরিষ্ঠ-আদালত প্রভৃতি ঐ সুদৃশ্য অট্টালিকা-শ্রেণীতে অবস্থিত। সেখানেও রীতিমত ব্যবহারাজীব (উকীল) আছেন। তাঁহারা জজকোর্ট ও হাইকোর্ট ব্যতীত কখন কখন মন্ত্রিসভায় গিয়া ও অর্থী প্রত্যর্থীর পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। এখানে হিন্দু জৈন মুসলমান খৃষ্টান এবং কতকগুলি পার্শী কর্ম্মচারী আছেন। মহারাজ তাঁহার রাজ্যের সকলশ্রেণীর প্রজার মধ্য হইতেই গুণানুসারে সমভাবে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এই অট্টালিকার ত্রিতলের ঠিক মধ্যভাগে প্রধান মন্ত্রীর বসিবার স্থান। উক্ত গৃহের বাহিরে সাক্ষাৎকারার্থীদের জন্য কয়েকখানি চেয়ার্ রাখা হইয়াছে। আমি গিয়া কিছুকাল অপেক্ষা করার পর আহূত হইলাম। মন্ত্রিবর পূর্ব্বেই শাস্ত্রী মহাশয়ের লোকের নিকট আমার পরিচয় অবগত হইয়াছিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। প্রায় দশ মিনিট কাল কথোপকথন হইল। মণিভাই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ইনি বোম্বাই-হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল মহারাজ-গায়কবাড়ের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। তাহার পর, অমাত্য-প্রবরের শিষ্টতাপূর্ণ ব্যবহারে আপ্যায়িত হইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। আগমনকালে

বড়োদা-কলেজের পারস্যভাষার প্রোফেসর্ মুন্সী ফরিদ্‌উদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হইল। মুন্সীজী কৃতবিদ্য ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁহার স্বাভাবিক শিষ্ট ব্যবহার দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মুন্সীজীর জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ। প্রায় পনরো ষোল বৎসর হইল বড়োদায় অবস্থান করিতেছেন। মুন্সীজী পারস্যভাষায় লিখিত গায়কবাড়রাজ্যের ইতিহাসের ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন।

২২শে বৈশাখ অপরাহ্নে পূর্ব্বোক্ত রাজারামশাস্ত্রী মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে বড়োদা-হাইকোর্টের দ্বিতীয় জজ পণ্ডিত সার্ঙ্গপাণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। জজ্ বাহাদুরের বাসা শাস্ত্রী মহাশয়ের বাসস্থলীর সন্নিহিত। পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত আমার বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের কথোপকথন হইয়াছিল। আমি নামটী লিখিয়া পাঠাইলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রেরিত লোক আসিয়া আমাকে উপরে লইয়া গেল। উপরি ভাগে উঠিয়া দেখিলাম বিচারপতি তাঁহার শয়ন-গৃহের সম্মুখস্থ সুসজ্জিত একটী গৃহে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ গৃহেই তাঁহার দুইটী প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা অধ্যয়নে নিরত আছেন। আমি উপস্থিত হইবামাত্র তিনি সুললিত সংস্কৃত-ভাষায় অভ্যর্থনা, স্বাগত-প্রশ্ন ও বসিতে অনুরোধ কবিলেন। আমি বসিলে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল কথোপকথন হইল। পণ্ডিত সার্ঙ্গপাণি কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণকুল-সম্ভূত। তিনি মারাঠী সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি। এতদ্ভিন্ন ব্যবহার-শাস্ত্রে দক্ষতার জন্যও তাঁহার সবিশেষ খ্যাতি আছে। পণ্ডিতবরের আকৃতি খর্ব্ব এবং দেহ বেশ সুগঠিত। বর্ণ এত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ যে, দেখিলে মনে হয় শরীর হইতে কান্তি উছলিয়া পড়িতেছে। তাঁহার আকৃতি যেমন সুন্দর, কথা বলিবার পদ্ধতি তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। পণ্ডিত সার্ঙ্গপাণি রীতিশুদ্ধ সরল সংস্কৃতে ধীরে ধীরে মনের ভাব প্রকাশ করেন। কন্যা দুইটীও

বেশ সুশীলা এবং বুদ্ধিমতী। তাঁহারা অতিনম্রভাবে বসিয়া আমাদের সংস্কৃতে কথোপকথন শুনিয়া আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন।

২৩শে বৈশাখ প্রাতঃকালে স্নানান্তে বিট্টলমন্দির স্বামিনারায়ণের মন্দির খাণ্ডোবামন্দির প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া বড়োদার পুরাতন রাজবাটী দেখিবার জন্য গমন করিলাম। সহরের মাঝখানে এক দেশ জুড়িয়া রাজবাটী। উহাতে কাষ্ঠময় অনেক অট্টালিকাশ্রেণী বিদ্যমান। কোনটী চারিতলা, কোনটি ছয়তলা, কোনটী সাততলা। ঐ সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণে কতই যে কাষ্ঠের প্রয়োজন হইয়াছিল, উহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। উহার কোন বাটীতে রাজকীয় পারিবারিক দেবমন্দির, কোন বাটীতে রাজমহিলারা ও তাঁহাদেয় আত্মীয়ারা বাস করেন। কোনটীতে রাজমহিলাদের স্ব স্ব জায়গীরের কর্ম্মচারিগণের কার্য্যালয়। একটীতে শিক্ষাবিভাগসংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ বসেন। উহার মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটী অট্টালিকাশ্রেণীর উচ্চতা ও গৃহসংখ্যা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। উহাতে এতই কার্য্যালয় ও কর্ম্মচারী অবস্থান করে যে, গণিয়া সংখ্যা করা যায় না। ঐ বাটীতে পুরাতন দপ্তরের যত বড় বড় কর্ম্মচারীর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যালয় বিদ্যমান। পূর্ব্বাহ্ন দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঐ বাটীতে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় অসংখ্য কার্য্যার্থীর সমাগম হইয়া থাকে। ঐ বাটীতে প্রবেশের দ্বারও অসংখ্য। প্রত্যেক দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী বিদ্যমান। আমি পুরাতন রাজবাটী ঘুরিয়া দেখিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের কামান দেখিতে গেলাম। স্বর্ণনির্ম্মিত ও রৌপ্যনির্ম্মিত বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন উহার আকার ক্ষুদ্র। প্রকৃত পক্ষে উহা সাধারণ লৌহের কামান অপেক্ষাও বড় বোধ হইল। দুইটী কামান স্বর্ণনির্ম্মিত ও দুইটী রৌপ্য-নির্ম্মিত। ঐ কামানসমূহের নির্ম্মাণে বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। বড়োদা নগরীর পূর্ব্ব সীমায় একটী সৈন্যাবাস আছে।

ঐ সৈন্যাবাসে দেশীয় সৈন্যগণ বাস করে। উহার কিঞ্চিৎ দূরে উত্তর দিকে মহারাজের প্রতিষ্ঠিত অভিনব সূতার কলে বড়োদা-রাজ্যের উৎকৃষ্ট তুলা-রাশি সূত্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে। আমি ঐ সকল স্থান সন্দর্শন করিয়া ১১ ঘটিকার সময় বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।



লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ।

ঐ দিন অপরাহ্নে বড়োদা নগরীর সৌন্দর্য্যের প্রধান নিকেতন লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইলাম।

রাজকীয় নূতন কার্য্যালয়ের নিকট দিয়া দক্ষিণাভিমুখে কিঞ্চিদূন অর্দ্ধ মাইল গমন করিলে রাজপথের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রান্তর-মধ্যে উপরি উক্ত সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া বহুক্ষণ সেই অভ্রস্পর্শিনী রাজপুরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম। বস্তুতঃ ঐ দৃষ্টিরম্য প্রাসাদমালার যিনি প্রথম কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয় যে কিরূপ অপূর্ব্ব কবিত্বময় তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্বর্গবাসী না হইলে কেহ অমরাবতীস্থ বৈজয়ন্ত ধামের সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। যাঁহারা মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া শ্বেতদ্বীপের জনপদসমূহে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই ইংলণ্ড ও প্যারিস্ নগরীর প্রাসাদ-নিচয়ের সহিত এই সৌধ-শোভার তারতম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ভারতবর্ষই আমাদের একমাত্র গম্যস্থল। এই মহাদেশের যতদূর নিরীক্ষণ করিয়াছি, তন্মধ্যে এরূপ রম্যতম প্রাসাদ আর কখনও নয়নগোচর করি নাই। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার যে সকল কৃতী সন্তান কর্ম্মফলে ইংলণ্ডে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, এই প্রাসাদ তাঁহাদেরই স্থাপত্যবিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ দেখিলে মনে হয়, কে যেন অলৌকিক কান্তিময়ী স্বর্গপুরীর একখণ্ড আনিয়া এখানে স্থাপন করিয়া গিয়াছে। অথবা ইহার মেঘস্পর্শী চূড়াসকল নভোমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া ত্রিদশালয়কেও উপহাস করিতেছে। এই প্রাসাদমালা আয়তনে অল্প নহে, প্রান্তরের একাংশ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। উহার সমুদয় ভাগ সুদৃঢ় লৌহ-রাশি দ্বারা নির্ম্মিত। গৃহের মধ্যভাগস্থ সোপানশ্রেণী উৎকৃষ্ট মর্ম্মর-পাষাণে মণ্ডিত। উপরে উঠিবার সময় দর্শকের সমস্ত অবয়ব স্বচ্ছ মর্ম্মর-প্রস্তরে প্রতিবিম্বিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে। এই মনোহর সৌধমালার উপরি ভাগে স্নানাগার, গৃহি শ্রামহ, শয়নমন্দির, ক্রীড়াভবন প্রভৃতি অতি

প্রশস্ত এবং পরিপাটীর সহিত সুসজ্জিত। মনোজ্ঞ গৃহগুলি বহুমূল্য প্রস্তর, নানাদেশের চিত্রিত ছবি, শোভাময়ী শয্যা, রমণীয় আসন ও নানাজাতীয় মণি-মাণিক্য-হীরকে সংশোভিত হইয়া যার পর নাই সুষমা বিস্তার করিতেছে। মহারাজের প্রথমা মহিষী লক্ষ্মীবাই বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন। দৈহিক সৌন্দর্য্য ভিন্ন তাঁহার অন্তঃকরণের সৌন্দর্য্য আরও অধিক ছিল। তিনি অল্পবয়সেই দয়া-দাক্ষিণ্য-গুণে প্রজাবর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি প্রাচীন রাজকর্ম্মচারিগণ ও প্রজারা তাঁহার করুণা ও বদান্যতার কথা উল্লেখ করিয়া অশ্রুপাত করে। উক্ত রাজ্ঞী পতিও দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। মহারাজও পুত্রদ্বয়ের সহিত পূর্ব্বমহিষী এবং বর্ত্তমান মহিষী চিম্‌নাবাইর তৈলচিত্রিত ছবি ঐ প্রাসাদে বিদ্যমান আছে। ঐ প্রাসাদের একতলায় পুস্তকাগার। সুন্দর আলমায়রায় সংস্কৃত গ্রীক লাটিন্ হিব্রু পার্সী উর্দ্দূ জর্ম্মন্ ফ্রেঞ্চ ইংরেজী মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-ভূখণ্ডের নানাভাষার অসংখ্য পুস্তক স্বর্ণমণ্ডিত-আবরণ-বিশিষ্ট হইয়া শোভা পাইতেছে। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে পুষ্পিত তরু লতিকা সকল শ্রেণীবদ্ধরূপে রোপিত হইয়াছে। রাজপথ হইতে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রবেশের দ্বারদেশে সশস্ত্র প্রহরী সকল বিদ্যমান। ঐ প্রাসাদ সন্দর্শন করিতে হইলে অনুমতিপত্র (pass) লইতে হয়। স্বয়ং মহারাজ ও তাঁহার দুই তিনটী প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট অনুমতিপত্র পাওয়া যায়।

২৪শে বৈশাখ অপরাহ্ণ চারি ঘটিকান্তে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় বড়োদা নগরীর নব পরিচিত বন্ধুগণ উপস্থিত হইলেন। জলের কলের অনতিদূরে মাধবী-কুঞ্জের পার্শ্বস্থ ভূভাগ জলসিক্ত করিয়া কয়েকখানি খাটিয়া পাতা হইল। একে একে আসিয়া সকলে ঐ স্থানে সমবেত হইলেন। বন্ধুগণ সকলেই প্রায় শাস্ত্রবিৎ, তাঁহাদের সহিত আমি প্রতিদিন তিন চারি ঘণ্টা সংস্কৃতভাষার আলোচনা করিয়া বিশেষ

আমোদ অনুভব করিতাম। ঐ বন্ধুসমাজে চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ বৎসরের বালক হইতে সপ্ততি অশীতিবৎসরবয়স্ক বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আছেন। এক সঙ্গে শাস্ত্রালোচনার বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করা কাহারই পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। বালকগণ আপন মনে সুমধুর স্বরে কালিদাসের সুধাসিক্ত কবিতা সকল আবৃত্তি করিত। যুবকগণ মধ্যে মধ্যে উহার কোন একটী কবিতার ভাব ও রচনা-কৌশল অবলম্বন করিয়া আমার সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। দুই তিন জনে এক পার্শ্বে এক খাটিয়াতে বসিয়া প্রাচীনন্যায়ের কথা লইয়া ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহাদের কথায় সকলে যোগ দিতে পারিতেন না কিন্তু যখন বেদান্তের কথা উঠিত, তখন সকলেই সমবেত হইয়া উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইত। ঐ মঠে একটী প্রাচীন শাস্ত্রী থাকেন, তাঁহার প্রকৃত নাম কি জানিনা, কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। কারণ তাঁহার শান্তিময় জীবনের পবিত্র আচরণ নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া আমি সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভরে অবনত থাকিতাম। মঠে সমবেত বন্ধুগণের মধ্যে অধিকাংশই দেশস্থ ব্রাহ্মণ, সুতরাং ঐ কোঙ্কণস্থব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত বৃদ্ধ শাস্ত্রীকে সকলেই কোঙ্কণস্থ-শাস্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। প্রায় সপ্ততি-বৎসরবয়স্ক ঐ কোঙ্কণস্থ-শাস্ত্রীর শরীরের বর্ণ সুপক্ক রসাল-ফলের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ। মস্তকে শুভ্রকেশ এবং বার্দ্ধক্যেও উজ্জ্বল দন্তপংক্তি আননচ্যুত হয় নাই। তিনি প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া স্নান সন্ধ্যা বেদ-পাঠ ও নিত্য-হোম শেষ করিয়া গ্রামে গমন করেন এবং যে দিন যেখানে নিমন্ত্রণ থাকে, সেখানে বেদপাঠ করেন। বেদ পাঠান্তে দক্ষিণা গ্রহণ-পূর্ব্বক মাধ্যাহ্নিক আহার সমাপ্ত করিয়া সায়ংকালে পুনরায় মঠে আগমন করেন। যে দিন কোন স্থানে নিমন্ত্রণ না থাকে, সে দিন মঠেই আহার করেন। দুই তিন দিন কোন স্থান হইতে নিমন্ত্রণ না আসিলে কোঙ্কণস্থ-শাস্ত্রী স্নান সন্ধ্যাদি শেষ করিয়া

যদৃচ্ছাক্রমে স্বয়ংই কোন গ্রামে গমন করেন। ধার্ম্মিক গৃহস্থেরা শাস্ত্রীর আগমন অবগত হইয়া নিজগৃহে বেদ পাঠের অনুষ্ঠান করে। ঐ নিরীহ ব্রাহ্মণ বড়োদানগরী-সংলগ্ন এক পল্লীতে কোন সম্পন্ন ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। গৃহিণী অধিকাংশ সময় পুত্র পুত্রবধূ কন্যা প্রভৃতির সহিত পিতৃগৃহে অবস্থান করেন। ব্রাহ্মণ কদাচিৎ শ্বশুরালয়ে গমন করেন। একদিন ব্রাহ্মণের শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণী, পুত্র ও পত্রবধূর সহিত দেখিতে আসিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূ সাক্ষাৎ করিয়াই প্রতিগমন করিলেন। ব্রাহ্মণী দুই দিন মঠে অবস্থান করিয়া স্বামীর শুশ্রূষা করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণীর বয়স প্রায় আটচল্লিশ বৎসর হইবে। আকৃতি দেখিলে যেন একটী দেবী মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। দেবতাবোধে রমণীদের যেরূপ স্বামীর সেবা কর্ত্তব্য, তিনি ঠিক তাহাই করেন। পূজার আয়োজন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বামীর অগ্রে দণ্ডায়মান হইতেন। স্বামী পূজা করিতে বসিলে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতেন। আহার প্রস্তুত করিয়া আবার যুক্তকরে স্বামীর অগ্রে উপস্থিত, স্বামী আহারে বসিলে পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতেন। স্বামীর নিদ্রাবেশ হইলে শয়ন করিতেন। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ-মহিলারা অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করেন না কিন্তু তথাপি ঐ ব্রাহ্মণমহিলার কেমন সলজ্জভাব! স্বামীর প্রতি ভক্তিপরায়ণতা দেখিয়া মনে হইত, তিনি যেন কোন জীবন্ত দেবতার অর্চ্চনে প্রবৃত্ত আছেন। আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অনেকেই গৃহিণীকে প্রমোদগৃহের সঙ্গিনী করিতে ভাল বাসেন কিন্তু আমার বোধ হয় ঐরূপ পবিত্র ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যেরূপ শান্তিদায়ক, অন্য কিছুতেই সেরূপ শান্তির আশা করা যাইতে পারে না। বৃদ্ধশাস্ত্রীর সমগ্র ঋগ্বেদ কণ্ঠস্থ। সাধারণতঃ তিনি চৌকীর একপার্শ্বে নিতান্ত নিরীহভাবে বসিয়া থাকিতেন।

যেই কেহ বেদ-পাঠ শুনিতে ইচ্ছা করিতেন, তখনি উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরে বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিতেন। সেই বৈদিক শব্দের পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ কালে পৃথক্ পৃথক্ হস্তভঙ্গী ও অঙ্গসঞ্চালনের সহিত সুমধুর বেদধ্বনি উত্থিত হইলে বন্ধুসমাজ নিস্তব্ধ হইয়া মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় উহা শ্রবণ করিতেন। বৃদ্ধশাস্ত্রীর কিছুমাত্র আলস্য নাই। আমরা যখনই বেদের যে অংশ শুনিতে অভিলাষ করিতাম, তখনি হৃষ্টান্তঃকরণে তিনি উহা আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এক দিন আমরা সোমযাগের মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করিলাম, শাস্ত্রী তৎক্ষণাৎ সোমমন্য ইত্যাদি মন্ত্র আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন (১)। কোঙ্কণস্থ-শাস্ত্রী বলিলেন "তিনি কয়টী সোমযাগে উপস্থিত ছিলেন এবং সোমরস পান করিয়াছেন।" তিনি আরও বলিলেন "সোমলতা দুর্লভ হইলেও একান্ত অপ্রাপ্য নহে। হিমালয় বিন্ধ্য মলয় সহ্য-প্রভৃতি শৈলরাজি সর্ব্ববিধ বনৌষধির আকর। ঐ সকল পর্ব্বতে অদ্যাপি সোমলতার অভাব হয় নাই।" উহার মধ্যে একটী মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু বলিলেন "সোমলতা না পাইলেও সোমযাগের ব্যাঘাত হয় না। এ বিষয়ে শ্রুতি আছে;—যদি সোম না পাওয়া যায়, তবে তাহার পরিবর্ত্তে পুতিকা গ্রহণ করিতে পারি"(২)। তাহার পর, আমরা নানা কথায় জ্যোৎস্না-সমুদ্ভাসিত গ্রীষ্মরজনীর প্রথম ভাগ অতিবাহিত করিয়া আহারান্তে শয়ন করিতে গেলাম।

২৫শে বৈশাখ অপরাহ্নে মহারাজের নূতন উদ্যান সন্দর্শনের কথা। বড়োদা নগরীর দেশীয়পল্লী ত্যাগ করিয়া রেলপথের দিকে যে প্রশস্ত রাজপথ গিয়াছে। ঐ রাজপথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রায় এক মাইল

(১) সোমমন্ত উপাসদৎ পাতবে চম্বোঃ সুতন্। করংভমন্য ইচ্ছতি ॥২॥

(ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৫৪ সূক্ত)

(২) যদি সোমং ন বিন্দেত তর্হি পুতিকামালভেয়ম্ ইতি শ্রুতিঃ।

গমন করিলে রাজকীয় উদ্যান, য়ূরোপীয় সৈন্যাবাস, রেসিডেণ্টের বাসভবন এবং ইংরেজীভাবাপন্ন দেশীয় রাজকর্ম্মচারীদের বাঙ্গলো সকল দৃষ্টিগোচর হইল। রাজকীয় উদ্যানটি প্রশস্ত। উহার মধ্যে শ্রেণীবদ্ধভাবে নানাবিধ মনোহর পুষ্প-বৃক্ষ ও অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোজ্ঞ লতিকা সকল সযত্নে রোপিত ও পরিপালিত হইয়া থাকে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ সময়ে ঐ উদ্যানে একটিও তরু কিংবা লতা সতেজ দেখিলাম না, দারুণ গ্রীষ্মে সমুদয়ই যেন তাপদগ্ধ ও শ্রীহীন বলিয়া বোধ হইল। অনন্তর নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া সায়ংকালে বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

২৮শে বৈশাখ মঠের অধিকারি-অধ্যাপকের পুত্রের অন্নাশন। ঐ উপলক্ষে পূর্ব্বদিন হইতে অনেক ব্রাহ্মণ-মহিলা মঠে সমবেত হইয়া নানা প্রকার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বাহ্নেই অন্নাশন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় পুত্রটীকে শিবিকায় করিয়া ঘুরাইয়া আনা হইল। অধ্যাপক স্বীয় গৃহিণী ও আত্মীয়-মহিলাগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া একটী পীঁড়ির উপর উপবেশনপূর্ব্বক পুত্রের মুখে দেবপ্রসাদ (অন্ন) প্রদান করিলেন। যখন পুত্রটী যুগপৎ মস্যাধার লেখনী ও রৌপ্য মুদ্রা ধরিল, তখন সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা নিতান্ত কৃশাঙ্গী ষোড়শী অধ্যাপক-বধূর নেত্রদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। আত্মীয় মহিলারা চতুর্দ্দিক্ হইতে ধান্য দূর্ব্বা দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। অন্নাশনের সমুদয় ব্যাপারই প্রায় বঙ্গদেশের ন্যায় হইল, কেবল আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ করিতে দেখিলাম না। বোধ হয়, উপনয়নের সময়ে উঁহাদের বংশে নামকরণ অন্নাশন প্রভৃতি সংস্কারের বৈদিক আচার সম্পন্ন হইয়া থাকে। কতকগুলি ব্রাহ্মণমহিলা রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকেরা বাঙ্গালী রমণী অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী। পুরুষদের প্রায় কিছুই দেখিতে হয় না, গৃহিণীরাই

সমুদয় নির্ব্বাহ করেন। বাঙ্গালা দেশের কুলবধূদের মধ্যে অদ্যাপি রন্ধন-কার্য্যে নিপুণা শ্রমপটু রমণীর একান্ত অভাব হয় নাই ; তথাপি তাঁহাদের কোন কোন বিষয়ে কার্য্যে ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করিবার প্রতিবন্ধক আছে। বাঙ্গালী বধূদের বদন সর্ব্বদা অবগুণ্ঠনে আবৃত রাখিতে হয়, পুরুষদের সাক্ষাতে তাঁহারা বাহির হইতে পারেন না, অধিকন্তু বস্ত্র পরিধানের রীতি যেরূপ, তাহাতে দ্রুত কোন কার্য্য করা দুরূহ। মহারাষ্ট্রীয়-মহিলারা অবগুণ্ঠনমুক্ত-বদনে দেখিয়া শুনিয়া সমুদয় সম্পন্ন করিতে পারেন এবং কাছা থাকায় চক্ষের পলক না পড়িতে পড়িতে দ্রুত কাঠের সিঁড়ী বাহিয়া উপর নীচে যাতায়াত করেন। গোপ-প্রভৃতির নিকট হইতে দধি ও অন্যান্য দ্রব্য তাঁহারা স্বয়ংই গ্রহণ করেন। স্বাধীনপ্রকৃতি মহারাষ্ট্র-মহিলাদের তাহাতে কোন আপত্তিই নাই। ভোজনের প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আহারের স্থান করা লইল। বৃহৎ নাটমন্দির-মধ্যে সমসূত্র-পাতে প্রথমে আসনগুলি সাজান হইল। পংক্তি-গুলি এত সোজা হইল যে, সূত্রপাত দ্বারা পরীক্ষা করিলেও কোন ইতর বিশেষ লক্ষিত হইত কিনা সন্দেহ। তাহার পর, আসনগুলির সম্মুখে যথাক্রমে একখানি করিয়া বৃহৎ শালপাতা পাতা হইল। অনন্তর, পুরন্ধ্রীগণ পিত্তলের কয়েকটি চোঙ্গা বাহির করিলেন। উহার দুই দিকে সূত্র ঝুলান। ঐ চোঙ্গার গায়ে লতা ও ফুলকাটা ছিদ্র এবং ভিতর নানাবর্ণের গুঁড়ায় পূর্ণ। তাঁহারা অতি নিপুণ-ভাবে পাতের একপার্শ্বে চোঙ্গাটী গড়াইয়া দিয়া সূতো ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, আর পাতের চতুর্দ্দিক্ নানাবর্ণ বিচিত্র-লতা-পত্র-পুষ্পে শোভান্বিত হইয়া উঠিল। প্রত্যেক আসনের বামপার্শ্বে পিত্তলের পিলসুজের উপর অগুরু চন্দন ও ঘৃতে সৌরভান্বিত মসৃণ প্রদীপ সকল জ্বলিতে লাগিল। একটি বধূ প্রত্যেক পাতে কর্পূরের ন্যায় শুভ্র এক হাতা কম্বিয়া অন্ন রাখিয়া গেলেন। অপর দুই তিনটী অল্পবয়স্কা বধূ

কোমল হস্তে অন্নগুলি গুছাইয়া মাজিয়া রাখিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার পর, প্রায় ত্রিশ চল্লিশ প্রকার ব্যঞ্জন অতি অল্প অল্প পরিমাণে পাতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পরিবেশন করা হইল। পাতের পার্শ্বে কয়েকটী করিয়া মেটে খুড়ী রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উহার তিনটীতে তিন প্রকারের ডাউল ও অপর গুলির কোনটীতে দধি, কোনটীতে লাড্ডু, কোনটীতে কলাকন্ (সন্দেশ) ও অন্যান্য মিষ্টান্ন প্রদত্ত হইল। যখন পাতা সাজান শেষ হইল, তখন গৃহিণীরা সকলেই একে একে আসিয়া দেখিয়া গেলেন। এমন কি রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা রমণীরা পর্য্যন্ত সুসজ্জিত পত্রগুলি সন্দর্শনের সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। প্রকৃত পক্ষেও তখন ভোজন-স্থানের এক অপূর্ব্ব শোভা হইল। ব্রাহ্মণেরা কার্পাস-সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া গরদের ধুতি পরিয়া স্ব স্ব জলপাত্র সহ ভোজন স্থানে আগমন করিলেন। অন্ন নিবেদিত হইবার পূর্ব্বে একবার ঘৃত প্রদত্ত হইল। তাহার পর, সকলে সমস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভোজনে ব্যাপৃত হইলে চারি পাঁচটী বধূ বৃহৎ বৃহৎ সুকোমল রোটিকা ও কুশীর ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র হাতার সাহায্যে সুগন্ধ গব্যঘৃত পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা ঘৃতকে "তুপ্" বলেন। বধূরা ভোজনারম্ভের অব্যবহিত পরে এত তুপ পরিবেশন করিতে লাগিলেন যে, বোধ হইল যেন তুপের এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। বঙ্গদেশ হইলে কার্য্যকর্ত্তা কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করিতেন কিন্তু এদেশে সে নিয়ম নাই। কার্য্যকর্ত্তা নিজেও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সহিত ভোজনে বসিয়া গেলেন। কিন্তু তজ্জন্য কোন বিষয়ে ক্রটী হইল না। আদর আপ্যায়নের ভার গৃহিণীদের উপরে। তাঁহারা ভোজন-সামগ্রী লইয়া প্রত্যেক ভোক্তার নিকটে গিয়া বিশেষ আদর সহকারে অনুরোধ করিয়া ভোজন করাইতে লাগিলেন। ক্রমেই পরিবেশন-কারিণীর

সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। নবপরিণীতা দশমবর্ষীয়া বালিকা বধূ হইতে প্রবীণা গৃহিণীরা পর্য্যন্ত নানা দ্রব্য লইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। ভোক্তাদের হস্ত ও রসনার সংযোগে যে অব্যক্ত শব্দ উত্থিত হইতেছিল, উহা পরিবেশনকারিণীদের অলঙ্কারের "ঝুন্ ঝুন্" রবের সহিত মিশিয়া এক অপূর্ব্ব ধ্বনি উৎপাদন করিল। ঐ দেশের নিয়মানুসারে ভোক্তা যতক্ষণ "পূরে পূরে" বলেন, ততক্ষণ পরিবেশনকারিণীরা ক্ষান্ত হন না। কারণ "পূরে" শব্দের অর্থ যথেষ্ট, একেবারে অনিচ্ছা প্রকাশ নহে। আর যখন ভোক্তা "না কো না কো" বলিয়া পাতের উপর উপুড় হইয়া পড়েন, তখন পরিবেশনকারিণী বিরত হন। যে সকল ভাগ্যবান্ যুবার শ্যালিকারা পরিবেশনে ব্যাপৃত, তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। তাঁহারা "নাকো নাকো" বলিয়া পাতের উপর "ব্যাঘ্রঝম্প" প্রদান করিয়াও অব্যাহতি পাইলেন না, তাঁহাদের পৃষ্ঠোপরি হাস্যমুখাদের হস্ত হইতে লড্ডু-চূর্ণ ও দধিবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। এ দেশের গৃহিণীদের কোন কপটতা নাই, যে দ্রব্যটী ভাল হইয়াছে, উহা তাঁহারা নিজেই বলিয়া দিয়া ভোক্তার উদর পূরণের সহায়তা করেন। মহারাষ্ট্রীর ভোজন-সামগ্রী বঙ্গদেশের ন্যায় না হইলেও নিতান্ত মন্দ নহে। ব্যঞ্জনগুলির অধিকাংশই অম্ল ঝাল তিক্ত লবণ ও ঘৃতের আধিক্যপ্রযুক্ত রসনাপ্রিয়। এইরূপে দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া নানাবিধ অভুক্তপুর্ব্ব উপাদেয় দ্রব্য দ্বারা জঠরাগ্নির অর্চ্চনা করিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলাম।

তাহার পর, হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে মুখশুদ্ধি করিয়া বড়োদা হইতে বোম্বাই অভিমুখে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি দুই দিন পূর্ব্বেই বড়োদা ত্যাগ করিতাম কিন্তু কেবল অধ্যাপক-পুত্রের অন্নাশন সন্দর্শনের নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এখন অন্নাশন হইয়া গেল আর বড়োদায় থাকার প্রয়োজন নাই,

সুতরাং শাস্ত্রি-বন্ধুদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া একটী ভারবাহী সহ অবিলম্বে ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যেমন ইন্দোর হইতে তত্রত্য টাকশালের কয়টী রৌপ্যমুদ্রা লইয়াছিলাম, সেইরূপ যাত্রাকালে এখান হইতেও রাজকীয় টাকশালের কয়টী রজতমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া লইলাম। ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখি, তখনও ট্রেন্ আসিতে বিলম্ব আছে। পূর্ব্বদিন পূর্ব্বোক্ত শঙ্করলাল মোড়ে বি, এ, মহোদয়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করায় তিনি বলিয়াছিলেন "সেনাপতি মহাশয় সৈন্যাবাস পরিদর্শনের নিমিত্ত মফস্বলে ভ্রমণ করিতেছেন, তিনি না আসা পর্য্যন্ত আপনার বড়োদা ত্যাগ করা উচিত নহে। যদি নিতান্তই যাওয়া আবশ্যক মনে করেন, তবে নৌসরীতে নামিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন। অদ্য যে সরকারী পত্র আসিয়াছে, উহা পাঠে জানা গেল, তিনি গতকল্য নৌসরী পৌঁছিয়াছেন"। অগত্যা তাঁহার কথায় সম্মত হইয়াছিলাম। অপরাহ্ন ২॥০ টার সময় বড়োদা-ষ্টেশন হইতে ট্রেন্ ছাড়িল। বড়োদা নগরী অতিক্রম করিলেই বিশ্বামিত্র নদের উপরিভাগ হইতে গগনস্পর্শী দেবমন্দির সমুন্নত প্রাসাদমালা ও বিবিধ উদ্যান-সমন্বিত বড়োদা নগরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নয়নপথে পতিত হইল।

ক্রমে গমন করিতে করিতে অপরাহ্ণে বাষ্প-শকট ভরোচ্ নামক ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। কথিত আছে;—পুরাকালে এই স্থানে ভৃগুমুনির আশ্রম ছিল, তজ্জন্য উহার নামান্তর 'ভৃগুক্ষেত্র'। অদ্যাপি ভার্গব-গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা ঐ দেশে বসতি করিতেছেন। ক্ষেত্রটি অতিপ্রাচীন। মৎস্যপুরাণের মতে এই স্থল 'ভরুকচ্ছ' নামে অভিহিত। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় উহার 'ভরোচ্ছ' নাম দৃষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টলেমি এই ভরুকচ্ছ নগরীকে 'বারিগজ' নামে বর্ণন করিয়াছেন। কচ্ছ শব্দের অর্থ জলসন্নিহিত স্থান,

ভৃগু শব্দের অপভ্রংশ ভরু। অতএব ভৃগুর অধিষ্ঠিত কচ্ছ বা বেলাভূমি বলিয়া উহার ভৃগুকচ্ছ বা ভরুকচ্ছ নাম হয়। বৃহৎসংহিতাকার আরও কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করিয়া উহার ভরোচ্ছ নামকরণ করেন। কালক্রমে উহা আরও সংক্ষিপ্ততর হইয়া 'ভরোচ্' সংজ্ঞায় পরিণত হইয়াছে। ঐ প্রদেশের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ। পূর্ব্বকালে সমুদ্র ও নর্ম্মদার সঙ্গম-স্থলে ভরুকচ্ছ নগরী বিরাজিত ছিল। এখন ঐ নগরীর নিকট হইতে সমুদ্র অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। ভরুকচ্ছ গুর্জ্জরের অন্তর্গত। পূর্ব্বকালে গুর্জ্জরের দদ্দবংশীয় নরপতিগণ ঐ জনপদ শাসন করিতেন। অনন্তর ৩৩০ শকে (৪০৮ খ্রীঃ) উহা বলভীরাজ চতুর্থ ধ্রুবসেনের শাসনাধীন হয়। ভট্টিকাব্যপ্রণেতা মহাকবি ভট্টি ঐ সেনবংশীয় নরপতিগণের গৃহশিক্ষক ছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীতে যখন চীনদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙ্ ভারতভ্রমণে আগমন করেন, তখন ভরুকচ্ছে দশটি বৌদ্ধসঙ্ঘারাম দশটি বৌদ্ধমন্দির ও তিনশত বৌদ্ধভিক্ষু দেখিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অনহিলবাড়পতি সিদ্ধরাজ জয়সিংহ নর্ম্মদার বেগ হইতে ঐই নগরীকে রক্ষা করিবার জন্য উন্নত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। নদীতীরে ঐ প্রাচীরের উচ্চতা চল্লিশ ফিট্ ছিল। এখন স্থানে স্থানে উহার সামান্য চিহ্ন বিদ্যমান আছে। মুসলমান-রাজত্বের সময় ঐ নগরীর অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ বাণিজ্যার্থ এখানে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। এখনও ভৃগুক্ষেত্রে পনরটি তীর্থক্ষেত্র বিদ্যমান। তন্মধ্যে হিন্দুদিগের এগারটি ও মুসলনান্দিগের চারিটি। হিন্দু-তীর্থের মধ্যে ভৃগুর আশ্রম, গঙ্গানাথ-মহাদেব, অম্বাজী মাতা, পিঙ্গলেশ্বর মহাদেব, বহুচারাজী মাতা, সিন্ধু-বাই মাতার মন্দির, কবীরস্থান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পারসীকগণ এখানে আসিয়া বাস করেন। এক সময় ভরোচের

তন্তুবায়গণের নির্ম্মিত বস্ত্রের অতিশয় প্রসিদ্ধি ছিল। এখনও ভরোচ একটী বিখ্যাত বাণিজ্য-স্থান। এখানকার কার্পাস-বস্ত্র লৌহ কাষ্ঠ সুপারি গুড় চাউল প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ নানাস্থানে নীত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও অভাব নাই। ধনী পারসী ও হিন্দুগণের অত্যুচ্চ সৌধমালায় নর্ম্মদাতীর অত্যন্ত মনোহর দেখায়। পূর্ব্বে ঐ প্রদেশের নর্ম্মদাভক্ত হিন্দুগণের বিশ্বাস ছিল, বেগবতী নর্ম্মদাকে কেহ সেতু দ্বারা শৃঙ্খলিত করিতে সমর্থ হইবে না। গ্রেটইণ্ডিয়ান্‌-পেনস্থলা-রেলকোম্পানির প্রথম উদ্যম বিফল হওয়ায় লোকের উক্ত ধারণা আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল কিন্তু ইংরেজ-স্থপতিগণ ভগ্নোৎসাহ হইবার পাত্র নহেন। তাঁহারা অধ্যবসায়-প্রভাবে ভরোচের নিকটে নর্ম্মদাবক্ষে একটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়া লোকের ঐ সংস্কার দূর করিয়াছেন। বাষ্পশকট ষ্টেসন ত্যাগ করিলে আমরা উক্ত সেতুর উপরিভাগ হইতে নর্ম্মদা-তীরস্থ ভরোচ নগরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে সুরাট্‌ অভিমুখে চলিলাম। রেল্‌পথের উভয় পার্শ্বে কেবল প্রান্তর তালবন ও মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতমালা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

ঠিক সায়ংকালে সুরাট ষ্টেসনে বাষ্প-শকট থামিল। সুরাটের প্রাচীন নাম সুরাষ্ট্রনগরী। ষ্টেসনের অনতিদূরে তাপীনদীর তীরে বর্ত্তমান সুরাষ্ট্রনগরী অবস্থিত। পূর্ব্বে ঐ নগরী উচ্চপ্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, এখনও স্থানে স্থানে উহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ নগরী পুরাকাল হইতে বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পারসীকেরা সুরাটে আসিয়া বাস করেন। পূর্ব্বকালে সুরাটে অর্ণবযান নির্ম্মিত হইত। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-বণিকেরা ঐ স্থানে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। সুরাষ্ট্রনগরীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। উহার সমীপবর্ত্তিনী তাপীনদীর নামান্তর

তপতী। ঐ নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে নানা উপাখ্যান আছে। স্কন্দপুরাণও মৎস্থপুরাণের-মতে ঐ নদী বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উৎপন্না (১)। মধ্য প্রদেশের বেতুল জেলায় মূলতাই নগরে একটী তীর্থ আছে। অনেকে ঐ তীর্থকেই তাপীর উৎপত্তি স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাপী মূলতাই হইতে প্রবলবেগে বহির্গত হইয়া সাতপুরানামক গিরিশৃঙ্গ ভেদ করিয়া খান্দেশ জেলার উচ্চভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পর, সুরাট জেলায় উপস্থিত হইলে উহা হইতে কতিপয় শাখানদী বহির্গত হইয়াছে। ঐ সকল শাখানদীর মধ্যে পূর্ণা অরুণাবতী ও গোমতী-প্রভৃতি প্রসিদ্ধা। তাপী নদীর উৎপত্তি স্থান হইতে সঙ্গম স্থল সমুদ্র পর্য্যন্ত উভয়তীর বিবিধবৈচিত্র্যময়। কোন স্থানে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা, কোথায় ও শ্যামল শস্যক্ষেত্র, স্থানে স্থানে গিরিশৃঙ্গ-বেষ্টিত দুর্গম অরণ্যানী। কোন কোন অংশ লোকালয়-শূন্য সম্পূর্ণ বিজন। মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘর ভীলের বাস আছে। তাপীর সঙ্কীর্ণপথের নাম হরণফাল (হরিণলম্ফ)। একটী সহযাত্রী বলিলেন "হরিণ যেমন উল্লম্ফন করিতে করিতে গমন করে, এই নদীর প্রবাহ ও অল্পপরিসর গিরিপথে সেই রূপ উল্লম্ফন করিতে করিতে আগমন করিয়াছে"। সুরাট হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে গিয়া তাপী সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাপীর উভয়তীরে একশত আটটী শিবমন্দির বিদ্যমান। স্কন্দপুরাণের তাপীখণ্ডে ঐ সকল লিঙ্গরূপী মহাদেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ঐ সকল লিঙ্গের মধ্যে চ্যবনক্ষেত্রে সুজাতীশ্বর পুরূরবাক্ষেত্রে নরবাহনলিঙ্গ, বশিষ্ঠক্ষেত্রে মুচুকুন্দেশ্বর, অরুন্ধতীবনে জামদগ্নেশ্বর, শরভঙ্গ-ক্ষেত্রে উজ্জ্বলেশ্বর-

(১) তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা ক্ষিপ্রাচ ঋষভা নদী।
বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাস্তাঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ॥
মৎস্যপুরাণ ১১২।২৭।

প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। যেখানে তাপী সমুদ্রজলে প্রবেশ করিয়াছেন, সেখানে ও বারিতাপ্য নামক একটী পুণ্যতীর্থ বিদ্যমান। এখন তাপী "তাপ্তী নামে আখ্যাত এবং বারিতাপ্য "বারি আব" নামে প্রসিদ্ধ। সুরাটনগরীটিও বিলক্ষণ সুদৃশ্য। এখানে উচ্চচূড়া-বিশিষ্ট বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের শ্রীনাথজীর মন্দির আছে। ইংরেজ-পল্লীতে অনেক ইংরেজের বাস। তদ্ভিন্ন ক্লক্‌টাওয়ার্ (ঘটিকাস্তম্ভ) ভিক্টোরিয়া-উদ্যান দাতব্য-ঔষধালয় ইংরেজীবিদ্যালয় প্রভৃতি অনেক আধুনিক দর্শনীয় বিষয় পর্য্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সুরাটনগরী ত্যাগ করিয়া পুনরায় বাষ্পশকট দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইল এবং অনেক প্রান্তর নদ নদী গ্রাম অতিক্রম পূর্ব্বক প্রায় রাত্রি দশঘটিকার সময় নৌসরী ষ্টেসনে পৌঁছিল। নৌসরী একটী অতি প্রাচীন নগরী। গ্রীক্-ঐতিহাসিক টলেমির গ্রন্থে ঐ নগরীর উল্লেখ আছে। এখন নৌসরী মহারাজ গায়কবাড়ের রাজ্যের অন্তর্গত। এখানে মহারাজের নিযুক্ত মাজিষ্ট্রেট্ জজ মুন্সেফ এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ বাস করেন। মহারাজ গায়কবাড়ের নৌসরীস্থিত সেনানিবাস, তিনটি রাজভবন ও উদ্যান সকল বিশেষ দৃষ্টিরম্য। ষ্টেসনটী অতি ক্ষুদ্র, ঐ স্থানে ষ্টেসনমাষ্টারের ক্ষুদ্রতম আবাস ও তিন চারি খানি মুদীর দোকানমাত্র বিদ্যমান। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আসিষ্টাণ্ট-ষ্টেসনমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "বড়োদা হইতে আসিতেছেন ভাবনা কি? ডাকবাঙ্গালায় গিয়া থাকুন।" রেলপথের পূর্ব্বপার্শ্বে উদ্যানের মধ্যে মহারাজের নির্ম্মিত একটী সুন্দর ডাকবাঙ্গালা আছে। গিয়া দেখি, এক মৃগয়াবিহারী শ্বেতাঙ্গ সঙ্গিনী ও অনুচরগণ সহ সেখানে অবস্থিতি করিতেছেন। দ্বারদেশে দ্বারবানের মুখে শুনিলাম সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। মুদীদিগকে এক টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া অঙ্গীকার করিলাম, কিন্তু তাহারা

পরদেশীকে স্থান দিল না। অনেক বলিয়া কহিয়া এক পদাতিকপুত্রের নিকট ব্যাগটী দিয়া সেই তালবন-সমাচ্ছন্ন প্রান্তর অতিক্রমপূর্ব্বক রাত্রি বারোটার কিছু পূর্ব্বে সহরে পৌঁছিলাম। গভীর রজনী, রাজপথে সারিসারি খাটিয়ায় গৃহস্থদম্পতিগণ নিদ্রাবিষ্ট। আমাদিগকে দেখিয়া কোন পণ্যশালার বারান্দা হইতে এক সারমেয় উত্তেজিত-স্বরে ডাকিয়া উঠিল। কোনরূপে তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। রাজবাটীর প্রধান দ্বারে আলোক জ্বলিতেছে এবং যমদূতের ন্যায় চারি জন প্রহরী কোমরে তরবারি আঁটিয়া বন্দূক স্কন্ধে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা আমাকে উপস্থিত দেখিয়া বিনীতভাবে বলিল "ইহা রাজকীয় কার্য্যালয়, এখানে সেনাপতি অবস্থান করেন না। এই গভীর রাত্রিতে শিবালয় কিংবা পান্থশালা ব্যতীত থাকিবার অন্য স্থান মিলিবে না।" ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সন্নিহিত শিবালয়ে উপনীত হইলাম। একটী বাগানের মধ্যে শিবালয়। দক্ষিণদ্বারী মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বদ্বারী ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহে নবাগত অভ্যাগত কিংবা সন্ন্যাসিগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। মন্দিরে কোন প্রহরী থাকে না, পূজারি দিনের বেলায় পূজাশেষ করিয়া চলিয়া যায়। অনাথমন্দির, যাহার যখন ইচ্ছা আসিয়া বাস করে। আমি উপস্থিত হইলে দ্বিতল হইতে একটী যুবা সন্ন্যাসী আসিয়া নীচে লোহার রেলিং-ঘেরা বারান্দায় আমার স্থান দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার নিকট হইতে লোটা ও দড়ি লইয়া নদীতীরস্থ ইঁদারায় জল আনিতে গেলাম। ঐ নদীর নাম পূর্ণা। রাত্রিকালে ঐ নদী তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় পরিসরবিশিষ্ট বোধ হইল। পূর্ণার জল নিতান্ত বিস্বাদ, মুখে দেওয়া যায় না। নদীর ঘাটের ঠিক উপরে দুইটী ইঁদারা আছে। উহার একটীর জল সুস্বাদু। অপরটির জল বিস্বাদ। এক স্থানের দুইটী ইঁদারার জলের ঐরূপ আস্বাদের

তারতম্য কেন হইয়াছে, বৈজ্ঞানিকেরা উহা বলিতে পারেন। সন্ন্যাসীর কথিত দক্ষিণ দিকের ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক নদীর ঘাটের একখানি শিলাখণ্ডে বসিয়া সন্ধ্যা শেষ করিলাম। এখন স্মরণ হইলে মনে ভয়ের সঞ্চার হয় কিন্তু তখন সেই বনাকীর্ণ বিজন নদীতীরে গভীর রজনীতে একাকী বসিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে কিছুমাত্র ভয় হয় নাই। নদীর ঘাটও শিবালয় হইতে নিতান্ত নিকটে নহে। বিশেষ রাজপথের উভয় পার্শ্বে কোনরূপ লোকালয় নাই। যাহা হউক, জল লইয়া শিবালয়ে আসিয়া দেখি ভারবাহীটি যাওয়ার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। আমি কোমরের টাকার থলি হইতে যখন সিকিটী বাহির করিয়া ভারবাহীর হস্তে দিলাম, তখন সন্ন্যাসি-যুবা সস্পৃহলোচনে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাহার পর, আমি শয্যা প্রস্তত করিয়া শয়ন করিলে সন্ন্যাসী তাঁহার বন্ধু কর্ত্তৃক আহূত হইয়া উপরে গেলেন। আমি শয়ন করিলাম বটে কিন্তু সন্দেহ দূর হইল না। সন্নিহিত তমালতরু-সমূহের নিবিড় পত্রের ভিতর হইতে অল্প অল্প জ্যোৎস্না চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল এবং সামুদ্রিক প্রদেশের কোন এক পাখীর অশ্রুতপূর্ব্ব কণ্ঠরব নিয়ত হৃদয়কে বিরক্ত ও শঙ্কিত করিয়া তুলিল। আমি শুইয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম। যেই চোখে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, আর সিঁড়ীতে পদশব্দ শ্রুত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। সহসা উঠিয়া বসিলাম, আর কোন শব্দ শুনা গেল না। রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিতে চলিল, আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, শয়নমাত্র তিমত নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে হটাৎ যেন কাহার গাত্রের ছায়া আমার শরীরে পড়িতেছে বোধ হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিমীলিতনেত্রেই জিজ্ঞাসা করিলাম "কে"? সন্ন্যাসি-যুবা উত্তর করিলেন "উপরে বড় গরম, তজ্জন্য নীচে বেড়াইতে

আসিয়াছি"। আমি বলিলাম "সন্ন্যাসি-মহারাজ! উপরে হাওয়া অধিক না? সন্ন্যাসী বলিলেন "হাঁ উপরে বেশ হাওয়া, তুমি ইচ্ছা করিলে উপরে যাইতে পার। এই দেবালয়ে সকল অভ্যাগতেরই সমান অধিকার"। আমি "বলিলাম কাহারও নিকটে শুইলে আমার ঘুম হয় না, আপনি উপরে যান, আমি একাকী এখানে থাকি"। সন্ন্যাসী উপরে গেলে আর বিলম্ব না করিয়া নিঃশব্দে দেবালয় ত্যাগ করিয়া রাজপথ অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে চলিলাম। কিছু দূর গেলেই অনতিদূরে আলোক দেখা গেল। নিকটে গিয়া দেখি সেই "পান্থ-শালা"। বহু পথিক নরনারী বাহিরের দুইটী বারান্দা ব্যাপিয়া শুইয়া আছে। আমি ও উহার এক পার্শ্বে শয্যা প্রস্তুত করিয়া নিশ্চিন্ত-মনে নিদ্রাগত হইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে 'আমি বড়োদা হইতে আসিতেছি' শুনিয়া দ্বারবানেরা বিশেষ সমাদর করিল এবং বলিল "সেনাপতি মহারাজের আবাসবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। কার্য্যালয়ের প্রহরীরা বোধ হয় জানে না, তজ্জন্য আপনাকে বলিতে পারে নাই"। তাহার পর, তাহারা রাজবাটীতে রাখিয়া আসিবার জন্য আমার সঙ্গে লোক দিল। কিছুদূর গিয়া একটী দরিদ্র-পারসীকপল্লীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম। ঘন ঘন পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন খোলার ঘর। পাড়ার মাঝখানে নিম্ববৃক্ষতলে একটি বড় ইঁদারা। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটি অতসীপুষ্পবর্ণাভা পারসীকমহিলা ইঁদারার পার্শ্বে সমবেত হইয়াছেন। কেহ জল তুলিতেছেন, কেহ ঘড়া পূরিয়া দিতেছেন, কেহ লইয়া যাইতেছেন। দরিদ্রতা-নিবন্ধন সামান্য পরিচ্ছদ হইলেও পারসীক-বধূদের বর্ণের মাধুর্য্য কি মনোহর! বালিকাগুলি যেন প্রফুল্ল-গোলাপ ফুলের মত হাস্যমুখে বিচরণ করিতেছে। সে পাড়ায় পারসী ব্যতীত অন্য জাতির বাস নাই। পথে সারি সারি পার্সী সুন্দরীদের

যাইতে দেখিয়া মনে হইল যেন পরীর রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। তাহার পর, পারসীকপল্লী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাহ্ন সাতটার সময় রাজবাটীতে উপস্থিত হইলাম। সহরের বিজন অংশে নানাবিধ বৃক্ষরাজি-শোভিত উপবনের মধ্যে রাজকীয় অট্টালিকা-সমূহ বিরাজমান। দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেই একজন রাজ-কর্ম্মচারী আমাকে সেনাপতি মহাশয়ের নিকট লইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর, আমার আহারের ব্যবস্থা হইল। আমি প্রাতঃকৃত্য স্নান সমাপনপূর্ব্বক সন্ধ্যা করিতে বসিলে আহার্য্য বস্তু সকল উপস্থিত করা হইল। নৌসরীতে আমাদের আহার-যোগ্য যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু পাওয়া যায় তৎসমস্তই আনীত হইয়াছিল। উপাদেয় কলাকন্ (সন্দেশ), ক্ষীর, মিষ্টদধি, নির্জ্জল দুগ্ধ, গব্যঘৃত, নবনীত প্রভৃতি কোন বস্তুরই অসদ্ভাব রহিল না। অপরাহ্ন দুইটার সময় জলযোগের ব্যবস্থা হইল। লোহিতবর্ণের খরবুজায় মিছরির সুমিষ্টতা অনুভব করিলাম। তিনটার সময় একাকী ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। একটী উদ্যান ত্যাগ করিলেই প্রান্তর, তাহার পর, বেলাভূমি। ঠিক সমুদ্রতটে মহারাজের একটী মনোহর প্রাসাদ বিদ্যমান। উহা দূর হইতে বড় সুন্দর দেখায়। নৌসরীর "অগ্নিমন্দির" একটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দর্শনীয় পদার্থ। পারসীকগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া প্রথমে ঐ স্থানে অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক আবাস গ্রহণ করেন। তজ্জন্য অন্যান্য স্থানের অগ্নিমন্দির অপেক্ষা নৌসরীর অগ্নিমন্দির উক্ত সম্প্রদায়ের একটী পবিত্র তীর্থবিশেষ। সেই পুরাকাল হইতে প্রতিদিন ইন্ধন অর্পণপূর্ব্বক পারসীকগণ তাঁহাদের আদিম জন্মভূমি পারস্যদেশ হইতে আনীত হুতাশনকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অগ্নি-মন্দিরও ধনী পারসীকগণের শ্রেণীবদ্ধ মনোহর সৌধমালা সন্দর্শন-পূর্ব্বক বণিক্‌পল্লীর মধ্য দিয়া রাজকীয় ধর্ম্মাধিকরণের নিকট উপস্থিত

হইলাম। কিন্তু সেখান হইতে কোন্ রাস্তায় রাজবাটী যাইতে হইবে তাহা ভুলিয়া গেলাম। নৌসরীর রাজপথ অন্যান্য নগরীর রাজপথের ন্যায় লোকবহুল নহে। এমন কি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াও কোন লোকের সাক্ষাৎ পাইলাম না। রাজপথের উভয়পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা দেখা যায়, অথচ মানুষ নাই। স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকে বোম্বাইপ্রবাসী। যাঁহারা গৃহে থাকেন, তাঁহারাও ঐ সময় সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। আমি বড়ই চিন্তাকুল হইয়া দ্রুতপদে যাইতেছি, এমন সময় রেশমী-শাড়ীপরা সোণার চশ্মা চোখে দুইটি সুন্দরী পারসীক-মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের নিকট রাজবাটীর পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ঈষৎ হাস্যমুখে কোন্ দিক্ দিয়া কোন্ কোন্ পথে যাইতে হইবে বলিয়া দিলেন তাহার পর, আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বুঝিলেন 'নিতান্ত নবাগত আমি সকল রাজপথের ধারণা করিতে পারি নাই'। তখন বলিলেন "আমাদের সঙ্গে আসুন।" তাঁহারা প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রাজবাটীর দরজায় আমাকে রাখিয়া গেলেন। আমি সেই সদাশয় মহিলাদ্বয়ের ধন্যবাদ করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। নৌসরী নগরীটি পারসীক-সম্প্রদায়ের জন্যই প্রসিদ্ধ। তজ্জন্য এখানে প্রসঙ্গক্রমে পারসীক-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

পারসীক জাতির আদিম বাসস্থান পারস্য। পূর্ব্বকালে পারস্যরাজ্য পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্ব্বে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত এবং উত্তরে ককেসস্-পর্ব্বতমালা হইতে দক্ষিণে পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পারস্যের অধিবাসিগণই পারসীক নামে আখ্যাত। পারসীকগণ আর্য্যজাতির একটী প্রধান শাখা। পুরাকালে আর্য্যগণ কাশ্মীরের উত্তরে বিন্দুসরোবর-সন্নিধানে বাস করিতেন। উক্ত বিন্দুসরোবরই অতিপরিচিত বেদোক্ত সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থান। অথর্ব্ববেদে

ঐ স্থান "প্রত্নৌকস্" অথবা প্রাচীনগণের আবাস বলিয়া উক্ত আছে। ঐ স্থান হইতে আর্য্যগণ ক্রমে কাশ্মীরে আসিয়া বসতি করেন। তাহার পর, একভাগ পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, অপর ভাগ সিন্ধুনদ পার হইয়া পারস নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। এই পারসের অধিবাসী আর্য্যগণই পারসীক নামে প্রসিদ্ধ। যখন সিন্ধু-পারগামী আর্য্যগণ, ভারতবর্ষগামী আর্য্যসম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হন, তখন বোধ হয়, তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন রূপ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। তজ্জন্য ভারতীয় আর্য্যগণের ধর্ম্মশাস্ত্র বেদে দেবগণের অর্চ্চনা ও অসুরগণের নিন্দা কীর্ত্তিত হইয়াছে। পারসীক-গণের অবস্তা-গ্রন্থে অসুরের (অহুরের) পূজা ও দেবগণের কুৎসা বর্ণিত আছে। কিন্তু যখন ইঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হন নাই, তখন সকলেই অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, ইন্দ্র, নাসত্য (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) প্রভৃতির উপাসক ছিলেন। অদ্যাপি অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের অগ্নিতে নিত্য-হোম ও পারসীকগণের প্রত্যহ অগ্নির উপাসনা সমভাবে বর্ত্তমান আছে। সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন দেশে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন রাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়ায় এই উভয় জাতির ভাষা ও আচার ব্যবহারগত এত পার্থক্য ঘটিয়াছে যে, এই উভয় জাতি পূর্ব্বে যে এক ছিল, উহা অনুমান করাও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ভাষাতত্ত্বের পর্য্যালোচনা দ্বারা এই উভয়জাতির আশ্চর্য্যরূপ ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যখন পারসীকগণের ও ভারতীয় দ্বিজাতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় বর্ত্তমান ছিলেন, তখন যে সকল শব্দ সৃষ্ট হইয়াছিল, উহা অদ্যাপি উভয়-জাতির মধ্যে তুল্য অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। তবে আকারগত ও উচ্চারণগত যে কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ, উহা কেবল উভয়জাতির মধ্যে ভাষার বিবর্ত্তন বশতঃ ঘটিয়াছে। আমরা এখন বেদে যে ভাষা

দেখিতে পাই, উহাও আদিমতম আর্য্যভাষা নহে, কালপ্রভাবে রূপান্তরিত বৈদিক-ভাষা। পারসীকগণেরও সে আর্য্যভাষা নাই, তাহার স্থানে অভিনবজাত জেন্দভাষা আপন অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু উক্ত জেন্দ ভাষার অভ্যন্তরে সেই প্রাচীন শব্দ-সমূহের অনেকগুলি কঙ্কাল দৃষ্ট হয়। ভারতীয় বৈদিক-সূক্তের অথর্ব্বন্, বৃত্রহন্, আঙ্গিরস, অর্য্যমন্, কাব্য-উশনস্, নাসত্য, মিত্র, যম, অসুর, বায়ু, সোম, আর্য্য প্রভৃতি শব্দ জেন্দভাষার আবস্তিক গ্রন্থে যথাক্রমে আথ্রবন্, বেরেথ্রঘ্ন, অঙ্গ্র, অইর্যমন্, কবউশ, নাওংহইথ্য, মিথ্র, যিম, অহুর, বয়ু, হোম, অইর্য্য-প্রভৃতি আকার ধারণ করিয়াছে বটে কিন্তু অর্থগত কোনই বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। এই সকল দেখিয়া পারসীকগণ যে আর্য্যগণের একটী প্রধান শাখা সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। প্রথমে পারসীকগণ ভারতীয় আর্য্যগণের ন্যায় অগ্নি সূর্য্য ইন্দ্র বায়ু নাসত্য প্রভৃতির উপাসনা করিতেন। শেষে জরথুস্ত্র নামক এক মহাপুরুষ পারসীক-জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়া পারসীকগণের বর্ত্তমান ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা করেন। বেদের সহিত পারসীকগণের ধর্ম্মগ্রন্থ অবস্তার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। উহারও কোন অংশে দেবগণের স্তুতি, কোন অংশে কথোপকথনচ্ছলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্ণয়, কোন অংশে বা দেবগণের গুণবর্ণনা আছে। পারসীকগণের ধর্ম্ম ও ভাষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল, এইবার আমরা তাঁহাদের পারস্য ত্যাগ ও ভারতবর্ষে আগমনের কারণ সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

অনুমান ৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে আরবগণ পারস্যদেশ জয় করিয়া ঐ দেশে মুসলমান-ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করে, উহাতে কতকগুলি পারসীক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য হয়। অবশিষ্ট স্বধর্ম্মানুরাগী পারসীক জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত প্রাচীন ধর্ম্মমত পরিত্যাগপূর্ব্বক মহম্মদীয় ধর্ম্ম

গ্রহণে অসম্মত হইয়া পারস্য হইতে পলায়নপূর্ব্বক খোরাসান প্রদেশে (বর্ত্তমান আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানে) আসিয়া প্রায় একশত বৎসর বাস করেন। আরবগণ সেখানে আসিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। আবার তাঁহারা সে স্থান ত্যাগ করিয়া অর্ণবযানে আরোহণপূর্ব্বক পারস্যোপসাগরের অর্ম্মজদ্বীপে আসিয়া বসতি করেন। সেখানেও আরবগণকে সমাগত দেখিয়া প্রায় সাত শত পারসীক উক্ত দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া আরবসাগর অবলম্বনপূর্ব্বক স্ত্রীপুত্র সহ নিরাশহৃদয়ে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করেন। কয়েক দিবস গমনের পর, তাঁহারা এক প্রকার ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন। সহসা কুকুরের শব্দে জানিতে পারেন যে, স্থলভূমি অতিসন্নিহিত। তাহার পর, তাঁহারা কাম্বে উপসাগরের অন্তর্গত ডিউ নামক স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু দ্বীপভূমি বাসযোগ্য নয় ভাবিয়া গুজরাটের দক্ষিণ-প্রান্তে সঞ্জানা নামক স্থানে অবতরণ করেন। তখন জয়দেবনামা এক রাজা সঞ্জানার অধীশ্বর ছিলেন। তিনি, "বিবাহকালে বৈদিক-মন্ত্রপাঠ করিবে এবং রাজার আদেশ ব্যতীত অস্ত্রধারণ করিতে পারিবে না"—এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া নিজ রাজ্যে পারসীকদিগকে বসতি করিতে আজ্ঞা দেন। কিছুকাল সঞ্জানায় বাস করার পর পারসীকগণ পুনরায় নবাগত আরবগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তাহার পর, সেখান হইতে পলায়ন করিয়া বাহারত নামক কোন দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে কিছুকাল প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থিতি করেন। ক্রমে বংশ বিস্তৃত হওয়ায় উক্ত স্থান হইতে বান্‌সা এবং বান্‌সা হইতে নৌসরীতে আসিয়া স্থায়িরূপে বাস করেন। এই নৌসরীই পারসীকগণের ভারতীয় আদিম বাসভূমি। এখন ভরোচ্, সুরাট্, বোম্বাই ও পুণা প্রভৃতিস্থানে যে সকল পারসীক দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নৌসরী হইতে গিয়া ঐ সকল স্থানে বাস করিয়াছেন। ভারতীয় পারসীকগণ

আপন প্রতিভা ও ব্যবসায়-বুদ্ধি-প্রভাবে একটি ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রাণান্তেও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করেন না। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ একুশখানি। উহার সাধারণ নাম নক্স্। ঐ সকল গ্রন্থ জরথুস্ত্র-প্রণীত। পারসীকগণ অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতির উপাসক হইলেও জরথুস্ত্রের বিধানানুসারে সম্পূর্ণ একেশ্বরবাদী। তাঁহারা বৎসরের মধ্যে ছয়টি সাধারণ উৎসব সম্পন্ন করেন। প্রথম, অর্দ্দিবেহেস্ত যশন্ উৎসব। ইহা অগ্নিদেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন পারসীকগণ অগ্নিমন্দিরে সমবেত হইয়া জগদীশ্বরের উপাসনা করেন। দ্বিতীয়, অব্ অর্দ্দ্ ইস্সুর-যশন্ উৎসব। ইহা অপ্ নামক সমুদ্র-দেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ দিন পারসীকগণ কোন নদী বা সমুদ্রতীরে গমন করিয়া জগদীশ্বরের উপাসনা করেন। তৃতীয়, অমরদাদ-সাল পর্ব্বাহ। চতুর্থ, পতেতি নৌরোজ বা নববর্ষোৎসব। পারস্যরাজ যজ্দেজার্দ্দের সম্মানার্থ ১লা ফরবরদিনে ঐ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ঐ উপলক্ষে পারসীকগণ সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও দরিদ্রদিগকে দান করেন। পঞ্চম, রাপ্তিবার উৎসব। উহা অগ্নিদেবতা অর্দ্দিবেহেস্তের সম্মানার্থ সম্পন্ন হয়। ষষ্ঠ, খুরদাদ-সাল উৎসব। উহা বর্ত্তমান পারসীক-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জরথুস্ত্রের সম্মানার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বাল্যাবস্থায় পারসীক বালক বালিকারা রেশমী জামা ব্যবহার করে। তাহার পর, সপ্তমবর্ষ বয়সে বালকেরা উপবীত ধারণ করে, উহা "কস্তি-গ্রহণ" সংস্কার নামে কথিত। ঐ সময় হইতে তাহারা রেশমী জামা পরিত্যাগ করিয়া "সদরো" নামক পবিত্র জামা ব্যবহার করিতে থাকে। উপবীত গ্রহণের পর, পারসীক বালকেরা জেন্দ-অবস্তার কতিপয় স্তোত্র মুখস্থ ও জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সাধারণ নিয়মগুলি

অভ্যাস করে। পারসীক-সম্প্রদায়ে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। পারসীকগণের নিজবাটীতে বিবাহ হয় না। প্রত্যেক পারসীক-পল্লীতে একটী করিয়া বিবাহমন্দির আছে। বিবাহ দিবসে বর ও কন্যা স্ব স্ব স্নানাগারে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমে গোমূত্র দ্বারা, তাহার পর, বালুকাদ্বারা সর্ব্বশরীর ধৌত করিয়া স্নানকার্য্য সম্পন্ন করেন। অনন্তর তাঁহারা যথাক্রমে নূতন জামা পিশোরী (১ ও শাড়ী পরিধান পূর্ব্বক কয়েকটি দাড়িম্বপত্র চর্ব্বণ কবিয়া নিজ গৃহে আসিয়া উপবেশন করেন। ঐ সময়, কন্যার মাতা একথানি থালায় সাতটী নারিকেল স্থাপনপূর্ব্বক ঐ থালা লইয়া বরের গৃহে গমন করেন এবং উক্ত নারিকেলপূর্ণ থালা মস্তকোপরি সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া বরকে বিবাহসভায় আসিবার জন্য সাদরে আহ্বান করেন। বর ও কন্যা বিবাহমণ্ডপে আগমন করিলে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কতকটা বৈদিকপ্রথা অনুসারে পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন করেন। ঐ সময় অতসীপুষ্পবর্ণাভা পারসীকযুবতীরা বহুমূল্য রেশমী-শাড়ী ও হীরকের অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়া কোন সুসজ্জিত গৃহের মধ্যভাগে একটি উজ্জ্বল প্রদীপ স্থাপনপূর্ব্বক উহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধুর হাস্য ও করতালী সহ নৃত্য গীত করিতে থাকেন। তখন ঐ বিবাহভবন অপ্সরোমণ্ডলীপরিশোভিত ইন্দ্রসভার ন্যায় অপূর্ব্ব সুষমা ধারণ করে। অল্পবয়সে বিবাহ হইলেও রীতিমত বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পারসীক-বালিকারা স্বামি-গৃহে গমন করিতে পারে না। পারসীক-রমণীরা সকলেই প্রায় পতিব্রতা। তাঁহারা স্বামীর নাম ধরিয়া আহ্বান করেন না। পারসীকেরা গোমাংস ও শূকরমাংস স্পর্শ করেন না। ঐ সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ। গোমূত্র পারসীকদিগের

(১) জামা পিশোরী (কোর্ত্তা ও চাদর) ইহা পারসীকগণের পবিত্র পরিচ্ছদ।

নিকট অতিপবিত্র বস্তু বলিয়া গণ্য। তাঁহারা নিদ্রাভঙ্গের পর গোমূত্র হস্তে মুখে দিয়া তৎপরে হস্তমুখাদি ধৌত করিয়া ফেলেন। প্রত্যেক ধার্ম্মিক পারসীক দিবসে যোলবার উপাসনা করেন। উপাসনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা হস্তমুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক উপবীত খুলিয়া ফেলেন এবং উপাসনা শেষ হইলে পুনরায় উহা গ্রহণ করেন। উপাসনারম্ভে সারসনামক স্বর্গীয় দূতের স্তুতিপাঠ করা হয়। স্ত্রীলোকেরাও উপাসনা করিয়া থাকেন। সন্তান হইবার পর দশ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যেক পারসীক রমণীকে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিয়া অশৌচ পালন করিতে হয়। পারসীক-গৃহস্থের প্রত্যেকের গৃহে পবিত্র অগ্নি রক্ষিত হয় এবং প্রতিদিন উহাতে ইন্ধন প্রদত্ত হয়। উঁহারা গোজাতিকেও অত্যন্ত ভক্তি করেন। সকলের গৃহেই একটী করিয়া বৃষ পরিপালিত হইয়া থাকে। পারসীকেরা বলেন "পবিত্র চিন্তা কর, পবিত্র বাক্য প্রয়োগ কর এবং পবিত্র কার্য্য কর"। উঁহারা ঋণ গ্রহণকরাকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। পারসীকেরা বলেন "ঋণীকে বাধ্য হইয়া মিথ্যা কথা বলিতে হয়"। পারসীক জাতির আর একটি মহত্ত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ঐ জাতিতে বারমহিলা ও ভিক্ষুক নাই।

পারসীকদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এক প্রকার অদ্ভুতপ্রণালীতে সম্পন্ন হয়। যে সকল চিকিৎসক পারসীকরোগীর চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হন, জীবনের আশা না থাকিলে পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে উহা রোগীর আত্মীয়দিগকে জানাইতে হয়। আত্মীয়গণ আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির মুখে গব্য ঘৃত মাখাইয়া গৃহপালিত সারমেয়কে ঐ মুখ লেহনে নিযুক্ত করেন। কুক্কুর মুমূর্ষুর মুখ না চাটিলে লোকে উহাকে পাপী বলিয়া সন্দেহ করে। তজ্জন্য আত্মীয়েরা যে কোন উপায়ে কুক্কুর দ্বারা মুমূর্ষুর মুখ চাটাইয়া লয়েন। মৃত্যু হইলে পারসীকেরা শ্বেতবস্ত্রদ্বারা

শবদেহ আচ্ছাদিত করিয়া লৌহ-খট্টায় স্থাপনপূর্ব্বক শববাহকদ্বারা দোখ্‌মায় লইয়া যান। এই "দোখ্‌মার" অর্থ প্রেতগৃহ বা শুদ্ধাগার। মৃতদেহ প্রেতগৃহে আনীত হইবার সময়ে সর্ব্বাগ্রে এক ব্যক্তি দুই খানি রুটী লইয়া যায়। তৎপর, শববাহকেরা যায়, তাহার পর, একটি শ্বেতবর্ণ কুক্কুর এবং সর্ব্বশেষে শুভ্রপরিচ্ছদে আবৃত পুরোহিত ও বন্ধুবান্ধবগণ গমন করেন। বান্ধবগণ প্রত্যেক দুই জনে একখানি করিয়া রুমালের দুই ধার ধরিয়া শবদেহের অনুসরণ করেন। মৃতদেহ প্রাচীরবেষ্টিত আচ্ছাদনশূন্য সেই সুবিশাল প্রেতভবনের ষাট্ হাত দূরে স্থাপন করিয়া কুকুরটিকে লইয়া দেখান হয় এবং ঐ কুকুরকে রুটি খাইতে দেওয়া হয়। এই প্রথার নাম "সগদাদ" তাহার পর, শববাহকেরা শবদেহ লইয়া গিয়া প্রেতভবনের মধ্যে অনাবৃত করিয়া রাখে। ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইলে তাহারা নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে স্নান করিয়া পূর্ব্বের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া চলিয়া যায়। প্রেতভবন মধ্যে মৃতদেহ স্থাপিত হইবামাত্র সমীপস্থ তরুশাখা হইতে গৃধ্র শকুনি কাক প্রভৃতি মাংসলোলুপ পক্ষিগণ সবেগে আপতিত হইয়া উহা কঙ্কালাবশেষ করিয়া ফেলে। হিন্দুদের ন্যায় পারসীকগণেরও দশমদিবসে পুরকপিণ্ডদানের ন্যায় একটা ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। হিন্দুরা যেমন শ্রাদ্ধকালে কুশ ব্যবহার করেন, পারসীকেরাও তদ্রূপ এক প্রকার তৃণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ সকল আচার ব্যবহার সন্দর্শনে পারসীকেরা যে প্রাচীন আর্য্য-জাতির একটী প্রধান শাখা সে বিষয়ে আব কোন সন্দেহ থাকে না।

রাজবাটীতে আসিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিলাম। আহার শেষ হইলে সেনাপতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে কিছুদিন নৌসরীতে থাকিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু আমি আমার

সময়ের সংক্ষিপ্ততা জানাইয়া ঐ দিবসেই রাত্রি দশটার ট্রেনে বোম্বাই গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সেনাপতি একটু চিন্তার পর, একজন কর্ম্মচারীর প্রতি আমার পাথেয় প্রদানের আদেশ করিয়া আমার সহিত বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত বহু ব্যক্তির সহিত আলাপ হইয়াছে কিন্তু বিষয়ী লোকের মধ্যে এরূপ শিষ্ট ও মিষ্টভাষী অতি-অল্পই দেখিয়াছি। যথাসময়ে পাথেয় উপস্থিত হইল। আমি পূর্ব্বে কল্পনাও করি নাই যে, আমার ভ্রমণের সমুদয় রেলভাড়া সেনাপতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে। পূর্ব্বেই দ্বারবানেরা একখানি অশ্ব-শকট ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। উহাতে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন্ আসিল, সমুদয় গাড়ীই লোকে পরিপূর্ণ। অবশেষে আসিষ্টাণ্ট-ষ্টেসন-মাষ্টারের সাহায্যে একখানি গাড়ীতে স্থান পাইলাম। আমি যে গাড়ীতে উঠিলাম, উহা মারোয়ারী স্ত্রীপুরুষে পূর্ণ। গাড়ী ষ্টেসন ত্যাগ করিলেই স্তন্যপায়ী একটি শিশু রোদন আরম্ভ করিল, রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত তাহার স্বর অব্যাহত ছিল। শেষ রাত্রিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রভাতে বাষ্পশকট বোম্বাই নগরীর সন্নিহিত হইলে এক বৃদ্ধ আমাকে ডাকিয়া তুলিলেন। তখন রেলশকট একটী জলাভূমির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

৩০শে বৈশাখ প্রত্যুষে বোম্বাই-নগরীস্থ বান্দারা ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। এই নগরী একটী দ্বীপের উপরিভাগে অবস্থিত। পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে মহাসমুদ্র। উত্তরদিকেও যে এক সময় সমুদ্র ছিল, রেলপথের উভয়পার্শ্বস্থ সুদূরব্যাপী জলময় স্থান দেখিয়াই সহজে উহা অনুমান করা যায়। বম্বে-দ্বীপে প্রথমে কোন সভ্যজাতির বাস ছিল না। পূর্ব্বে ঐ স্থান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সামুদ্রিক সর্প ও অন্যান্য হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। জলদস্যুরা নৌকারোহণে প্রচ্ছন্নভাবে ঐ দ্বীপের নিকটে অবস্থান করিত। বৈদেশিক বণিক্‌গণ দুস্তর সমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ঐ স্থলভূমি আশ্রয় কবিলে দস্যুরা তাহাদের অর্থ ও পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রাণবিনাশ করিয়া প্রস্থান করিত। ভারতসম্রাট্ সেকেন্দরলোদীর সময়ে পর্ত্তুগীজ্‌গণ ভারতবর্ষে আগমন-পূর্ব্বক দক্ষিণাপথের অশ্বারোহী দস্যুগণের অগম্য বলিয়া ঐ দ্বীপভূমিতে বাণিজ্যাগার নির্ম্মাণ করেন এবং উহার "বন্‌বে" (উৎকৃষ্ট বন্দর) এই নাম রাখেন। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চাল স্ পর্ত্তুগালের রাজকুমারী ইন্‌ফেন্টাকেথিরিন্‌কে বিবাহ করিয়া যৌতুকস্বরূপ বোম্বাইনগরী প্রাপ্ত হন। সেই সময় হইতে উহা ইংরেজ অধিকারে আসিয়াছে। এখন সমৃদ্ধিতে ব্রিটিসনগরী লণ্ডনের নিম্নেই বোম্বাই নগরীর স্থান।

শকট হইতে অবতরণ করিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিলাম। এই নগরে মহারাষ্ট্রী গুজরাটী মারোয়ারী পাঞ্জাবী ত্রৈলঙ্গী উড়িয়া পার্সী মুসলমান্ জাপানী বার্ম্মিজ্ ও নানাশ্রেণীস্থ য়ূরোপীয় জাতির এতদূর ভিড় যে, নগরে প্রবেশ করিলে যেন কেমন এক

প্রকার দিশেহারা হইয়া যাইতে হয়। নানাভাষাভাষী লোক, কেহ কাহারও কথা বুঝে না, সামান্য কয়েকটি বাঙ্গালী বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে এখানে থাকেন। তাঁহারা কে কোথায় বাস করেন অনেকেই তাহার সন্ধান জানে না। যে বাঙ্গালী বাবুর গৃহে আমার অবস্থানের কথা ছিল, গারোয়ানেরা তাঁহার বাসা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। অগত্যা কাল্‌কাদেবী-রোডে কোন মণিকারের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় নামক এক বাঙ্গালীযুবার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি সাদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ভ্রাতৃকল্প নীলমণি বাবুর যত্নে বোম্বাই-নগরীতে অবস্থানকালে আমার কোনও অসুবিধা হয় নাই। নিখিল পুণ্যনদীর গম্যস্থল তীর্থরাজ সমুদ্রের পবিত্রসলিলে অবগাহন করা একান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনায় প্রাতঃকৃত্য হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তে সাগরে গমন করিলাম। এখানকার মহার্ণবের সুনীল জলরাশি তরঙ্গসঙ্কুল নহে। সমুদ্রের লবণাক্ত সলিলে স্নান সন্ধ্যা শেষ করিয়া পুনরায় বাসায় আসিয়া মিষ্ট-জলে (মিঠা পানীতে) সর্ব্বশরীর বিধৌত করিলাম। পাকের উদ্‌যোগ হইতেছে, এমন সময় শিবানন্দব্রহ্মচারী নামক এক প্রবীণ বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী সেখানে আগমন করিলেন। ব্রহ্মচারী গৈরিকপরিধায়ী সর্ব্বদা কাষ্ঠ-পাদুকা ব্যবহার করেন। অনেকদিন বম্বে নগরীতে আছেন সুতরাং তিনি সর্ব্বজন-পরিচিত। শিবানন্দ সরল ও মিষ্ট কথায় মানুষকে হাঁসাইতে জানেন।

আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া তিনটার সময় নগর সন্দর্শনে বাহির হইতেছি, এমন সময় দ্বারদেশে একটী একবিংশ কি দ্বাবিংশ-বর্ষবয়স্ক বাঙ্গালী পরিব্রাজকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারও গৈরিক পরিচ্ছদ। বিশেষত্বের মধ্যে তিনি ইংরেজী বাঙ্গালা ও কিছু কিছু সংস্কৃত জানেন। ঐ উদাসীন যুবা অত্যন্ত চতুর, কথা বলিবার সময় যেন নাক মুখ দিয়া কথা বহির হয়। তিনিও ঐ দিন বম্বে আগমন

করিয়াছেন। আমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া দ্রুতবেগে কোথায় সরিয়া পড়িলেন, আর সাক্ষাৎ হইল না। বম্বের রাজপথে কেবল জনতা। সেই গাড়ী ঘোড়া ও মানুষের ভিড় ঠেলিয়া অনেকক্ষণ পরে মুম্বাদেবীর মন্দিরে উপনীত হইলাম। একটি জলাশয়-তীরে উক্ত দেবীর মন্দির। জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে পাষাণনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী, তীরদেশে নানাবিধ দেবমন্দির। স্থানীয় হিন্দুরা বলেন ;— মুম্বাদেবীর নামেই এই নগরের নাম মুম্বই হইয়াছে। বৈদেশিকেরা মুম্বই শব্দকে অপভ্রংশ করিয়া বোম্বে বা বোম্বাই শব্দে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পর্ত্তুগিজ্‌দের আগমনের পূর্ব্বেও মুম্বাদেবী বিদ্যমান ছিলেন। তজ্জন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ও বণিকেরা "শ্রীমুম্বই" লিখিয়া থাকেন। মুম্বাদেবীর মন্দিরে এত ভিড় যে, অনেক কষ্টে দর্শন ও প্রণামাদি শেষ করিতে হইল। তাহার পর উহার অনতিদূরবর্ত্তী ভোলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। অতিবৃহৎ একটি মন্দিরে উক্ত মহাদেব বিরাজমান। সিদ্ধি এবং ধুস্তূরপ্রিয় অবধূত ও সন্ন্যাসিগণ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দূরে দূরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া ঔষধার্থিনী বন্ধ্যা নারী ও রোগক্লিষ্টদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। বণিক্‌মহিলাদের ভিঁড়ে ভোলেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করা দুরূহ। গুজরাটী নিতম্বিনীরা পুরুষদের বড় গ্রাহ্য করেন না। বহু আয়াসে ভোলেশ্বরের সন্দর্শন ও প্রণিপাত করিয়া মন্দির হইতে নির্গত হইলাম। ঐ পল্লীতে অনেকগুলি জৈনমন্দির আছে। প্রত্যেক মন্দিরে স্নুবর্ণ ও হীরক-মণ্ডিত পার্শ্বনাথের উজ্জ্বল মূর্ত্তি বিরাজমান।

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় সাগর-সন্নিহিত সমুদ্রতীরে (ব্যাক্‌বে নামক স্থানে) ভ্রমণার্থ গমন করিলাম। তত্রত্য সাগরতটের শোভা অনির্ব্বচনীয়। পশ্চিমভাগে প্রশান্তজলধির অনন্তনীলাম্বুরাশি স্তরে স্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা বক্ষে ধারণ করিয়া পুরোভাগস্থ মহানগরীর

অসীমসৌভাগ্য সূচিত করিতেছে। উত্তরপশ্চিম-কোণে বালুকেশ্বর শৈলবর সুরম্য হর্ম্ম্য ও উদ্যানরাজি মস্তকে করিয়া দণ্ডায়মান। পূর্ব্ব দক্ষিণে আলোকগৃহ, রাজাবাই-স্তম্ভ প্রভৃতি দর্শনীয় পদার্থসকল শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বদিকে নিউমার্কেট্ ও কাল্কাদেবীরোড্-প্রভৃতির ত্রিতল পঞ্চতল সপ্ততল সৌধমালা শ্রেণীবদ্ধভাবে বিরাজিত হইয়া বাণিজ্যপ্রধান অম্বিনগরীর ঐশ্বর্য্যগরিমা প্রকাশ করিতেছে। প্রান্তরের একাংশ দিয়া "বম্বে-বরোদা-সেন্ট্রাল্ইণ্ডিয়া" নামক রেলপথে বাষ্পশকট কোলাবা হইতে বান্দারা পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গমনাগমন করিতেছে। উল্লিখিত লৌহপথের পশ্চিমপার্শ্ব হইতে সমুদ্র-সলিল পর্য্যন্ত আয়ত দূর্ব্বাদলমণ্ডিত প্রশস্তক্ষেত্র ভ্রমণ ও ক্রীড়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রান্তরের মধ্যে বালক বালিকা ও কিশোর কিশোরীরা বিবিধ প্রকার ব্যায়ামে নিরত। তীরোপান্তে কোন কোন পাষাণময় ঘাটে অপূর্ব্বলাবণ্যবতী পারসীক-মহিলারা কটিদেশে বিলম্বমান উপবীত হস্তে ধারণ করিয়া সমুদ্র-সলিলে নানাবিধ মনোজ্ঞ কুসুম ও পুজোপহার সমর্পণ করিতেছেন। কোন কোন পারসীক পুরুষ ও মহিলা বীচিমালাবিচুম্বিত উপলখণ্ডে উপবেশন করিয়া জেন্দভাষায় লিখিত আবেস্তা নামক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। সায়ংকালে বম্বের জলধিতটের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হয়। বস্তুতঃ এখানকার সমুদ্রতীরের শোভার সীমা নাই, পারসীক-মহিলার পরিচ্ছদ ও সৌন্দর্য্যের উপমা নাই। বম্বে সহরে পারসীক গুজরাটী ও মরাঠী জাতিই অধিক। গুজরাটী মহিলারা ঈষৎ অবগুণ্ঠিতবদনে স্বাধীনভাবে দেবমন্দিরে গমনাগমনে সমর্থ কিন্তু অন্যত্র নহে। মরাঠী রমণীগণ স্থবর্ণময় কুসুমে কবরী শোভিত করিয়া বগী বা ফেটিং গাড়ীতে অন্তরীক্ষচারিণী দেবীর ন্যায় ভ্রমণ করিলেও একাকিনী বা সঙ্গিনী সহ এই বেলাভূমির বিমুক্ত বায়ু

সেবনের অধিকারিণী নহেন। এ ক্ষেত্রে কেবল পারসীকমহিলা ও ইংরেজ-রমণীরাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। যখন পাঁচ ছয়টী রূপবতী পারসীক তরুণী উজ্জ্বল সিল্কের শাড়ী ও দুই একখানি হীরকালঙ্কার পরিয়া সোনার চস্‌মা-চোখে ঈষৎহাস্যবদনে শ্রেণীবদ্ধ রাজহংসীর ন্যায় হরিদ্বর্ণ-দূর্ব্বাক্ষেত্রে পাদচারণা করেন, তখন পার্শ্বস্থিত শ্বেতাঙ্গী-মহিলাদের সৌন্দর্য্য যেন সূর্য্যালোকে দীপকান্তির ন্যায় নিস্প্রভ হইয়া যায়। পারসীক-ললনারা যথার্থই বিধাতার অপূর্ব্বসৃষ্টি। তাঁহাদের যেমন স্পৃহণীয় কান্তি, তেমনি কমনীয় মুখ। ইংরেজকামিনীর ভ্রূযুগল পারসীক-সীমন্তিনীর ন্যায় আকর্ণবিশ্রান্ত ও এত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নহে। পারসীক-রমণীর ওষ্ঠাধর অধিক লোহিত বর্ণ, দৈহিক গঠন ও ইংরেজমহিলা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুরুচি-সম্পন্ন। দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই দেখা গেল ভিন্ন ভিন্ন কতিপয় প্রস্তরাসনে ছয় সাতটি করিয়া পারসীক যুবক যুবতী একসঙ্গে মিলিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন। কোথায় বা প্রণয়ী প্রণয়িনীর গ্রীবাদেশে বামবাহু বিন্যস্ত করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। কোন স্থানে বা প্রণয়ি-যুগলের প্রীতিপূর্ণ আলাপে পূর্ব্বরাগ সূচিত হইতেছে। যাঁহারা য়ুরোপীয় মহিলাদের স্বচ্ছন্দ বিহার সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ও এই স্থানের কোন কোন বিষয় নূতন বোধ হইবে। যাঁহারা “বল্‌ নাচের সংবাদ রাখেন না, নিতান্ত পল্লীগ্রামের অধিবাসী, তাঁহারা ঐ বিস্ময়জনক উজ্জ্বল বেশভূষা, স্বাধীনতাপূর্ণ হাবভাব সন্দর্শন করিলে প্রথমক্ষণে মনে করিতে পারেন, এ কি স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতেছি, না ইহাই গন্ধর্ব্বলোক অথবা নন্দনকাননের একদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ?

কিছুক্ষণ পরে আমরা বিশ্রামের নিমিত্ত পাদুকা ত্যাগ করিয়া জলসন্নিহিত একখানি উপলখণ্ডে গিয়া উপবেশন করিলাম। এক একটি

তরঙ্গাঘাতে আমাদেরও পাদদেশ বিধৌত গাত্রবস্ত্র ঈষৎ সিক্ত হইতে লাগিল। নিকটে একটী প্রবীণ পারসীক বসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট জেন্দ-আবেস্তার পাঠ শ্রবণের প্রস্তাব করিলাম। তিনি অদূরস্থিতা দুইটী রমণীর সন্নিধানে গিয়া বসিতে বলিলেন। কিন্তু আমরা অপরিচিত, বড় সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। শেষে পারসীক-প্রবর স্বয়ং আমাদিগকে লইয়া গিয়া সেই মহিলাদ্বয়ের সমীপে বসাইয়া দিলেন। তাঁহারা উৎসাহসহকারে অতিস্পষ্টরূপে ঐ গ্রন্থের গাথাসকল পাঠ করিতে লাগিলেন। শুনা যায় বর্ত্তমান পারসীক-ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক জরদষ্ট্রের উপদেশসমূহই জেন্দ ভাষায় লিখিত। তদ্ভিন্ন পরবর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থ-সকল পহ্লবী ভাষায় রচিত হইয়াছে। আমরা জেন্দ বা পহ্লবী কিছুই অবগত নহি, সুতরাং রমণীযুগলের মুখনিঃসৃত বাক্যসমূহের কোনই মর্ম্ম-গ্রহ করিতে সমর্থ হইলাম না, তবে মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা শব্দের ঝঙ্কার যেন সংস্কৃতের ন্যায় কানে বাজিতে লাগিল। আর ঐ বিদুষী মহিলাদের সুন্দর স্বর ও পাঠনৈপুণ্যবশতঃ উহা শুনিতে বেশ মধুর বোধ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সায়ংকাল উপস্থিত, সূর্য্যকিরণ ক্ষীণ অপেক্ষা ক্ষীণতর হইল, অংশুমালী ক্রমে ক্রমে একটী লোহিত বর্ণ বৃহৎ গোলকের ন্যায় আকার ধারণ করিলেন। সাগরসলিলে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শোভা দেখিতে বড়ই রমণীয়। যাঁহারা প্রত্যহ জলধি-জলে সূর্য্যের অন্তর্ধান নয়নগোচর করেন, তাঁহারা ও ঐ সময় একবার উদ্গ্রীব হইয়া সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। একখানি তাম্রথালা যেমন অকস্মাৎ সরসীসলিলে নিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ দেখিতে দেখিতে জবাকুসুমসঙ্কাশ সহস্রাংশু অনন্তনীলাম্বু-মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। অবিলম্বে জ্যোৎস্নালোকে সাগরতীর আলোকিত হইয়া উঠিল, গগনমণ্ডলে তারকারাজির ন্যায় অসংখ্য গ্যাসের আলোক জলধিতট সুশোভিত করিল।

আমরা সুশীতল সমীরণ-পরিষেবিত সমুদ্রতীরে কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর নগরাভিমুখে চলিলাম। নগরের সন্নিহিত একটী মনোহর উদ্যান আছে। সময়াভাবে উক্ত উদ্যানে প্রবেশ করা ঘটিল না। রাজপথের পার্শ্বেই পারসীকদিগের অগ্নিমন্দির ও উচ্চ উচ্চ সৌধমালা। অগ্নি-মন্দির বা আতসবেহরমের পার্শ্বেই চন্দনকাষ্ঠ ও ধর্ম্মপুস্তক বিক্রীত হয়। রাজপথের সন্নিহিত উদ্যানের মধ্যে সুন্দর একটী অট্টালিকা বিবিধ প্রকার উজ্জ্বল আলোকমালা ও পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া পথিকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। রাজপথে অসংখ্য ফেটিং বগী ও অন্যান্য শকটরাজি দাঁড়াইয়া আছে। নানাবিধ উজ্জ্বল বসন ও হীরকালঙ্কারে সুসজ্জিতা পারসী-রমণীরা বিমানচারিণী অপ্সরো-মণ্ডলীর ন্যায় শকট হইতে অবতরণ করিয়া ঐ অট্টালিকা অভিমুখে যাইতেছেন। শুনিলাম উহা পার্সীদিগের বিবাহমন্দির। ঐ দিন একটী বিবাহ, তজ্জন্য অগ্নিমন্দিরে অত্যন্ত সমারোহ।

অনন্তর রাত্রি নয় ঘটিকার সময় বাসায় উপস্থিত হইলাম। পরীক্ষার দিন অতিসন্নিহিত। অতএব বোম্বাই-নগরীর অন্যান্য দ্রষ্টব্য গুলি প্রত্যাগমন কালে দেখিব সঙ্কল্প করিয়া রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় পুণা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভ্রাতৃকল্প শ্রীমান্ নীলমণি মুখোপাধ্যায় "ভিক্টোরিয়া-টার্ম্মিনাস্" নামক সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেসনে আসিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। সমস্ত নিশা প্রায় নিদ্রিত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া পরদিন ৩১শে বৈশাখ পূর্ব্বাহ্ন সাতটার সময় পুণাষ্টেসনে অবতরণ করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রাচীনকালে বর্ত্তমান মহারাষ্ট্রের অধিকাংশস্থল দণ্ডকারণ্য নামে অভিহিত হইত। ঐ প্রদেশ ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। উহার উত্তরদিকে সুরাট্ ও সাতপুরা গিরিশ্রেণী, দক্ষিণে কর্ণাট প্রদেশ, পূর্ব্বদিকে গোণ্ডবন ও ত্রৈলিঙ্গ, পশ্চিমে আরব-সমুদ্র। ঐ দেশের পরিমাণ প্রায় ১২৫০০০ বর্গ মাইল এবং লোক-সংখ্যা তিনকোটির অধিক। সহ্যপর্ব্বত মহারাষ্ট্রদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বিরাজমান। উহার পূর্ব্বাঞ্চলের নাম দেশ ও পশ্চিমাংশ কোঙ্কণ নামে প্রসিদ্ধ। ঐ দেশের অধিকাংশস্থল পর্ব্বতবহুল ও দুর্গম-অরণ্যানী-পরিব্যাপ্ত। মহারাষ্ট্র অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনুর্ব্বর, তবে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যপ্রদ। পুরাকালে ঐ দেশ কেবল নিশাচরগণের লীলাস্থল ছিল। কথিত আছে;—সর্ব্বপ্রথম মহর্ষি অগস্ত্য বিন্ধ্যাদ্রি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ঐ দুর্গম আরণ্য প্রদেশে প্রবেশ করেন। তিনি অনেক রাক্ষসকে নিগৃহীত করিয়া ঐ প্রদেশে স্বীয় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার পর, পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া বীরহত্যা-পাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য মহর্ষি কশ্যপকে সমস্ত পৃথিবী প্রদানপূর্ব্বক তপস্যার্থ পশ্চিম-সমুদ্রের তীরবর্ত্তী কোঙ্কণপ্রদেশে বাস করেন। তাঁহারই প্রযত্নে কোঙ্কণে ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার পর, রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র বনবাসকালে রাক্ষসকুলের বিনাশ সাধন করিয়া ঐ প্রদেশকে অনেকটা নিরাপদ্ করেন। তদবধি ঐ জনপদে আর্য্যজাতির বসতি-বিস্তার হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার গোপালকৃষ্ণভাণ্ডারকর নানাবিধ শিলালিপি ও পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন;—যিশুখ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে রট্ঠ ও ভোজ উপাধিকারী ক্ষত্রিয়গণ মহারাষ্ট্রদেশে বাস ও আধিপত্য করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে শিল্পিপ্রবর

সাত্যকির বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। উক্ত রট্ঠ ও ভোজজাতিই কালক্রমে মহারট্ঠ ও মহাভোজ নামে প্রসিদ্ধ হন। মহারট্ঠ জাতির সহিত মহাভোজ জাতির কন্যা আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। উক্ত প্রাচীন মহারট্ঠ শব্দ হইতেই বর্ত্তমান মারাঠা ও মহারাষ্ট্র শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। মহারট্ঠগণের নামানুসারে খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও ঐ দেশ মহারট্ঠ নামে পরিচিত ছিল। পূর্ব্বকালে ঐ দেশের আয়তন, বর্ত্তমান মহারাষ্ট্রের ন্যায় সুবিস্তৃত ছিল না। তখন পুণা, সাতারা, আহম্মদনগর জেলা ও শোলাপুর জেলার পশ্চিমাংশ প্রকৃত মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। কালক্রমে মহারাষ্ট্রীয় জাতির বংশ-বিস্তার ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত কোঙ্কণ, গোণ্ডবন, কোলবন, আভীরদেশ, বিদর্ভ ও উত্তরকর্ণাট মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্ভূত হইয়াছে।

নাসিক ও কোহ্লাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭৩ অব্দ হইতে ২১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শালিবাহন-বংশীয় নরপতিগণ মহারট্ঠ ও মহাভোজ-প্রভৃতি-জাতীয় ক্ষত্রিয়গণের পরাজয় সাধনপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রদেশে স্বীয় আধিপত্য-বিস্তার করেন। গোদাবরী-তীরবর্ত্তী প্রতিষ্ঠানপুরে তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ দেশে চালুক্যবংশীয় নরপতিগণের শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহারা বাতাপিপুরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে রাষ্ট্রকুট-বংশীয়েরা মহারাষ্ট্র প্রদেশে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর এক চালুক্য-রাজবংশ মহারাষ্ট্রদেশ শাসন করেন। কল্যাণনগরে ঐ রাজবংশের রাজধানী ছিল। তাঁহাদের অধিকার-কালে লিঙ্গায়ত-সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রাবল্য হয় ও বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। চালুক্যবংশীয় নরপতিগণ অতিশয় বিদ্যানুরাগী

ছিলেন। কাশ্মীরদেশীয় বিহ্লনকবি ঐ বংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং উক্ত নরপতির মন্ত্রী বিজ্ঞানেশ্বর সুপ্রসিদ্ধ মিতাক্ষরাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইতিমধ্যে কলচুরি-রাজবংশ কিছুকালের জন্য মহারাষ্ট্র-প্রদেশে অভ্যুদয় লাভ করে। তাহার পর, শিলাহার নামে পরিচিত তিনটি সামন্ত-রাজবংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া মহারাষ্ট্রের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিল। মহালক্ষ্মী তাঁহাদের কুলদেবতা ছিলেন। ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যাদববংশীয় নরপতিগণ মহারাষ্ট্রদেশে প্রভুত্ব-লাভ করেন। ঐ বংশীয় ভূপতিগণের কীর্ত্তিকলাপ অনন্ত। তাঁহাদের প্রথম নরপতির নাম সিজ্বন। তাঁহার পুত্র মল্লগী। মল্লগীর পুত্র ভিল্লম। প্রথমে যাদবেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থলে রাজধানী স্থাপন করেন, শেষে ১১০৯ খ্রীষ্টাব্দে যাদববংশীয় পরাক্রান্ত ভূপতি ভিল্লম দেবগিরিতে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং ঐ বৎসরেই তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ভিল্লমের পুত্র রাজা জৈত্রপাল। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের পুত্র লক্ষ্মীধর জৈত্রপালের সভাপণ্ডিত ছিলেন। জৈত্রপালের পুত্র দ্বিতীয় সিজ্বণের সময়ে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেব ও স্মার্ত্ত হেমাদ্রি দেবগিরির রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাহার পর, তাঁহার পুত্র জয়সিংহ দেবগিরির সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি অধিকদিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। ঐ বর্ষেই তাঁহার পুত্র কৃষ্ণরাজ রাজদণ্ড অধিকার করেন। ঐ নরপতি অনেক যাগ যজ্ঞ ও রাজ্যবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ত্রৈলিঙ্গ কর্ণাট লাট গুর্জ্জর মালব-প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গের দর্পহরণ করিয়াছিলেন। ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে মহাদেবের মৃত্যুর পর, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি সাধারণের মধ্যে রামদেবরাও ও রামরাজ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন

রামচন্দ্র অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি বাহুবলে দক্ষিণাপথের সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ আলা-উদ্দীন খিলিজী পাঁচহাজার সৈন্য সহ মৃগয়াচ্ছলে দেবগিরির সন্নিহিত হইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক অতর্কিতভাবে রাজধানী আক্রমণ করেন। ঐ সময় হইতেই মহারাষ্ট্র-রাজলক্ষ্মী একান্ত চঞ্চলা হইয়া উঠেন। ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যাদববংশীয় রাজগণের হস্তেই মহারাষ্ট্রের শাসনদণ্ড ছিল। ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে জয় লাভ করেন। ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দক্ষিণভারত দিল্লীশ্বরের অধীন ছিল। উহার পর দক্ষিণাপথে বাহ্মনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৪২৬ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদশাহ বাহ্মনী, প্রাচীন হিন্দুরাজধানী বিদর্ভনগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হয় এবং অন্নাভাবে মহারাষ্ট্র জনশূন্য হইয়া পড়ে। মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারগণ সুযোগ বুঝিয়া মুসলমানের হস্ত হইতে পর্ব্বতীয় প্রদেশ ও দুর্ভেদ্য দুর্গাদি অধিকার করিয়া লয়েন। বাহ্মনীবংশের রাজ্যকালে হিন্দুরাই রাজস্ব-সংগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিভাগীয় রাজস্ব-সংগ্রাহকগণ দেশমুখ নামে পরিচিত হইতেন। বাহ্মনীরাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে হিন্দু দেশমুখগণের কিয়দংশ নিজামসাহী এবং কিয়দংশ আদিলসাহী রাজবংশের অধীন হন। সুধু রাজস্ব সংগ্রহ করাই দেশমুখগণের একমাত্র কার্য্য ছিল না, দুর্গরক্ষা এবং যুদ্ধকালে স্বীয় দল বল সহ মুসলমান-সেনাপতিগণের সাহায্য করাও তাঁহাদের অন্যবিধ কর্ত্তব্যের অন্তর্গত ছিল। অনেকে ঐ সময় রাজকার্য্যে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যে সকল দেশমুখ ঐরূপ প্রতিপত্তি লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে মরাঠাবংশ-সম্ভূত রাজা মালজী-ভোঁশলা অন্যতম। নিজামসাহী রাজগণের অধীনে পুণায় মালজীর জায়গীর ছিল। নিজামসাহী-রাজ্য

ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলে দিল্লীর বাদ্‌সা পুণা এবং উহার সন্নিহিত প্রদেশ বিজাপুররাজকে অর্পণ করেন। তদবধি মালজীর জায়গীর বিজাপুর-রাজের অধীন হয়। ঐ মালজীর পুত্র শাহজী। ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে মোগলশাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইলে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হয় এবং ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতাবাদ মোগলেরা হস্তগত করেন। রাজা বন্দীকৃত হইলে মরাঠা সর্দ্দারগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাহজী পূর্ব্বতন রাজবংশের এক জনকে সিংহাসনে বসাইয়া বিজাপুরের সৈন্যের সহিত পরেণ্ডা হইতে মোগলদিগকে তাড়াইয়া দেন এবং পুণা ও গঙ্গথর জেলা লুট করিয়া লয়েন। ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুররাজ পরাজিত হইয়া শাহজাহানের পদানত হন। ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহজীও আত্মসমর্পণ করেন। ভীমা নদীর উত্তরতীরবর্ত্তী জুন্নরপ্রভৃতি স্থান মোগলসামাজ্য-ভুক্ত ও দক্ষিণ তীরবর্ত্তী ভূভাগ বিজাপুরের রাজাকে প্রদত্ত হইলে শাহজী বিজাপুরের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় কার্য্যের পারিতোষিক-স্বরূপ পুণা প্রভৃতি কতিপয় স্থান জায়গীর প্রাপ্ত হন। বিজাপুর-রাজের অধীনে মরাঠা-সর্দ্দারের বর্গী নামক শিক্ষিত অশ্বারোহী সেনাদল মোগল-যুদ্ধে রণপাণ্ডিত্য দেখাইয়া জনসাধারণের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিল। ঐ সময় সুযোগ বুঝিয়া শাহজীর পুত্র শিবাজী মস্তক উত্তোলন করেন। শিবাজী শৈশবে তাঁহার পৈত্রিক জায়গীরের তত্ত্বাবধায়ক দেশস্থ-ব্রাহ্মণ কুলসম্ভূত দাদাজীপন্থের যত্নে পরিপালিত হন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না কিন্তু বাল্যকাল হইতে রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত বীরপুরুষগণের শৌর্য্যকাহিনী শ্রবণে তাঁহার হৃদয়ে বীরত্বের বীজ রোপিত হইয়াছিল। উহার ফলে তিনি গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর-রাজ্য ব্যতীত সমগ্র দক্ষিণাপথের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীও পরাক্রম এবং তেজস্বিতায় ন্যূন ছিলেন না। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভুজী পরলোকগত হইলে তাঁহার

পুত্র নাবালক দ্বিতীয় শিবাজী রাজা হন। তিনি সাধারণ লোকের মধ্যে সাহু নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত (শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র) রাজারাম প্রথম সাহুর অভিভাবক নিযুক্ত হন। শেষে তিনি সাহুকে ত্যাগ করিয়া সেতারায় রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। নানাবিধ ঘটনার পর, মহারাষ্ট্রের হিন্দুরাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়। রাজারামের দ্বিতীয় পুত্র শম্ভুজীর বংশধরেরা কোহ্লাপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া সহ্যাদ্রির অনেকাংশ অধিকার করেন। অদ্যাপি রাজারামের বংশধরগণ সেখানে ইংরেজ-গবর্মেণ্টের মিত্রনরপতিরূপে স্বীয় রাজ্য ভোগ করিতেছেন।

সাহুর রাজত্বকালে কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত বালাজী বিশ্বনাথভট্ট নামক এক ব্যক্তি রাজস্ব সংগ্রহের কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করায় মহারাজ সাহু তাঁহাকে পেশওএ (প্রধান মন্ত্রীর) পদে নিয়োগ করেন। ঐ সময় সেতারায় সাহুর রাজধানী ছিল। বালাজী বিশ্বনাথকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করায় সাহুর রাজ্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজীরাও পেশওএ-পদে অভিষিক্ত হন। বাজীরাও অসাধারণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যে তাঁহার একাধিপত্য ছিল। তিনি প্রায় ২০ বৎসর কাল পেশওএ-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময় সাহু কোন রূপ রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেন না, বাজীরাওই সকল বিষয়ে প্রভু ছিলেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সাহু নিঃসন্তান-অবস্থায় পরলোক গমন করিলে বাজীরাওর পুত্র বালাজী বাজীরাও শিবাজীর বংশসম্ভূত একটী বালককে সেতারার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া মহারাষ্ট্রের সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-গবর্মেণ্ট পেশওএর আধিপত্য ধ্বংস করিয়া সেতারার রাজাকে স্বাধীন করিয়া দেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সেতারার

শেষ রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে সেতারা ইংরেজ-রাজ্য ভুক্ত হয়। বাজীরাওর পুত্র বালাজীবাজীরাও অসাধারণ ক্ষমতা-শালী বীরপুরুষ ছিলেন। যে সময় মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধসম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা রঘুজীভোঁশলে এবং দেওয়ান্ ভাস্করপণ্ডিত, বিহারের নবাব আলীবর্দ্দী খাঁকে পরাজিত করিয়া মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠের কুঠি লুণ্ঠনপূর্ব্বক আড়াই কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করেন। তখন আলীবর্দ্দী ভীত হইয়া দিল্লীর বাদসাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাদ্‌সা নিরুপায় হইয়া বালাজীবাজীরাওকে বাঙ্গালাদেশ রক্ষার জন্য অনুরোধ করেন। সেই সময় বালাজী অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত রঘুজীকে বাঙ্গালা দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বাদসাহ, বালাজীবাজীরাওকে মালবের সুবাদারী পদ প্রদান করেন। বালাজীবাজীরাও সিন্ধিয়া হোলকর-প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণকে উহা ভাগ করিয়া দেন। বালাজীবাজীরাও পুণায় অবস্থিতি করিতেন, তজ্জন্য তাঁহার সময় হইতে পুণা মহারাষ্ট্রের রাজধানী হয়। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশেই মহারাষ্ট্রীয়-জাতির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে সময় আর পেশ্‌ওএ-বংশ মন্ত্রিস্থানীয় ছিলেন না। বালাজী বাজীরাও মহারাষ্ট্র-রাজ্যের সার্ব্বভৌম নরপতির পদে আসীন হইয়া অবলীলাক্রমে ঐ শত্রু-সঙ্কুল বিস্তৃত রাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মাধবরাও পেশওএ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও অতিবিচক্ষণতার সহিত মহারাষ্ট্র-দেশের শাসন কার্য্য পরিচালন করেন। তিনি ব্রাহ্মণোচিত ধ্যান ধারণা ও জপ তপে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাহার পর, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণরাও রাজপদ লাভ করেন কিন্তু তিনি অধিক দিন উক্ত পদে অবস্থান করিতে পারেন নাই। কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহার পিতৃব্য দুরন্ত-রাঘব তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া রাজপদ

অধিকার করেন। ঐ ঘটনায় বৃদ্ধমন্ত্রী রামশাস্ত্রী পদ ত্যাগ করেন। নানাফর্নবীশ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ নিহত নারায়ণরাওর মহিষীর গর্ভজাত শিশুকে পেশওএ-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সময় মহারাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে বালক মাধবনারায়ণরাও-পেশওএর সহিত ইংরেজগবর্ম্মণ্টের সন্ধি হয় এবং নারায়ণরাওর প্রাণহন্তা রঘুনাথরাও মাসিক ২৫০০০ হাজার টাকা বৃত্তি লইয়া গোদাবরীতীরে কোন গ্রামে বাস করিতে বাধ্য হন। মাধবনারায়ণরাওর মন্ত্রী নানাফর্নবীশ যেমন পরাক্রান্ত তেমনই অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তাঁহার প্রভাবও রাজনীতি-কৌশল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি হায়দরাবাদের নিজামকে পরাস্ত করিয়া তিন কোটি টাকা ও নিজামরাজ্যের অনেকাংশ গ্রহণ করেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মাধবনারায়ণরাও পেশওএ ছাদ হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিলে পূর্ব্বোক্ত রঘুনাথরাওর পুত্র বাজীরাও পেশওএ-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার সময়ে অনেক ঘটনা ঘটে। বাজীরাও কয়েকবার সন্ধির পর পুনরায় দুরাশাগ্রস্ত হইয়া ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে ইংরেজগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইংরেজগবর্মেণ্ট তাঁহাকে আটলক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদানপূর্ব্বক কাণপুরের সন্নিহিত বিঠুর নামক স্থানে বাস করিতে দেন। বাজীরাওর দত্তকপুত্র নানাসাহেব ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মিউটিনির সময় কাণপুরের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকায় ইংরেজগবর্মেণ্ট তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছেন। মহারাষ্ট্ররাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইল এইবার আমরা পুণানগরীর বিষয় বলিব।

পুণার পুরাতন নাম পুণ্যপুর। পুণ্যসলিলা মূলা ও মুঠা নদীর সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত বলিয়া উহার পুণ্যপুর নাম হয়। ঐ নগরী সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৮৫০ ফিট্ উচ্চ। পুণার ৩১ ক্রোশ পশ্চিমে মহাসমুদ্র

বিদ্যমান। বোম্বাই নগরী হইতে পুণা প্রায় ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। উহার চতুর্দ্দিকেই প্রায় শৈলশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ নগর মুঠানদীর দক্ষিণ-তীরে বিরাজমান এবং সুদৃঢ় দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। নগরীর মধ্যে কতিপয় জলপ্রণালী প্রবাহিত হইয়া পার্ব্বতী-হ্রদের জলের দ্বারা নগরবাসিগণের জলের অভাব দূর করিয়া থাকে। পুণানগরীর এক একটী পাড়া বা মহল্লাকে পেট্ বলে। নগরীটী আঠার পেটে বিভক্ত। প্রাতঃকালে বাষ্পশকট হইতে অবতরণপূর্ব্বক একখানি এক্কা ভাড়া করিয়া প্রায় আটটার সময় নানাচাপেটে বঙ্গীয় ছাত্রাবাসে উপস্থিত হইলাম। বহুদিন হইতে পুণায় বাঙ্গালী ছাত্রগণের একটী ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত ছাত্রাবাসে অবস্থান করিয়া বাঙ্গালী বিদ্যার্থিগণ পুণা-ইঞ্জিনিয়ারিং-কলেজে স্থপতিবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। আমাকে উপস্থিত দেখিয়া ছাত্রগণ অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় গ্রীষ্মাবকাশনিবন্ধন কলেজ বন্ধ থাকায় তিনটিমাত্র বিদ্যার্থী ছাত্রাবাসে উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতা বাগ্‌বাজারনিবাসী ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্ ৺নবীনকৃষ্ণসরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রবাবুর যত্নে পুণায় আমি অত্যন্ত সুখে ছিলাম। তিনি সর্ব্বদা আমার সকল বিষয়ে বিশেষরূপ তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারের কথা বহুদিন আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে।

১লা জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে স্নানান্তে আমি পুণার বর্ষীয়ান্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণশাস্ত্রী গড়বোলের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি একটী বড়বাটীর দোতলার একাংশে গৃহিণী কন্যা পুত্র পুত্রবধূ শিশুপৌত্র প্রভৃতির সহিত বাস করেন। শাস্ত্রী অত্যন্ত আদরের সহিত আমাকে লইয়া গিয়া তাঁহার বাসগৃহে বসাইলেন। নবাগত পুরুষ দেখিয়া পণ্ডিতের গৃহিণী কন্যা পুত্রবধূ কিছুমাত্র সঙ্কুচিত

হইলেন না। অনাবৃতমস্তকে কেহ পূজা করিতে লাগিলেন, কেহ রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন, কেহ বা শিশুর আদর করিতে লাগিলেন। আমি কিছু সঙ্কোচ-ভাব প্রকাশ করিলে শাস্ত্রী সংস্কৃতে বলিলেন "ইহাই এ দেশের সনাতনী প্রথা, আপনি সঙ্কুচিত হইতেছেন কেন? নিরুদ্বেগে বসিয়া কথোপকথন করুন।" তাহার পর, আমি পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত রাজারামশাস্ত্রীর একখানি পত্র তাঁহার হস্তে দিলাম। পণ্ডিতবর সাদরে পত্রখানি পাঠ করিয়া বলিলেন "আপনি বেদশাস্ত্রোত্তেজক-সভায় পরীক্ষা প্রদানের নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন অবগত হইয়া আমি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম। পণ্ডিত রাজারামশাস্ত্রী আমার পিতার ছাত্র এবং ভ্রাতৃকল্প। অতএব তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না বলিয়া বড় দুঃখিত হইতেছি। কারণ সংপ্রতি পুরাণনগরীস্থ হিন্দুসমাজে কোন বিশেষ কারণে দুইটী দল হইয়াছে। আমি প্রতিবাদকারীদের পক্ষভুক্ত। কালমাহাত্ম্যে উক্ত পক্ষ বড়ই দুর্ব্বল। প্রতি বৎসরই আমাকে পরীক্ষা-কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক ও পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইত, এবার করা হয় নাই। যাহা হউক, তজ্জন্য আপনার কোন হানি হইবে না। আদিত্যবার-পেটে যে সংস্কৃতপাঠশালা আছে, আপনি সেখানে গেলে পুস্তকের তালিকা ও নিয়মাবলী পাইবেন।" পণ্ডিত নারায়ণশাস্ত্রী বেশ শান্তস্বভাব ও সুপণ্ডিত। তাঁহার গৃহটী সংস্কৃত-গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিপিতে পরিপূর্ণ। উক্ত পণ্ডিতবরের সহিত সংস্কৃত-ভাষায় বহুক্ষণ কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। পরদিন ২রা জ্যৈষ্ঠ স্নানান্তে সাড়ে সাতটার সময় আদিত্যবারপেটে সংস্কৃতপাঠশালায় গিয়া নিয়মাবলী প্রাপ্ত হইলাম। পাঠশালার দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহে অনেক বিদ্যার্থী এবং কতিপয় অধ্যাপক বাস করেন। তাঁহারা বলিলেন;—"আপনি এক মাসের পূর্ব্বে আবেদন করেন নাই, এ অবস্থায় পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার অনুমতি

পাইবেন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষ আপনি কলিকাতা-সংস্কৃত-কলেজের উপাধি-পরিক্ষায় উত্তীর্ণ, যাঁহারা অন্য কোন স্থানে উপাধি পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন ‘বেদশাস্ত্রোত্তেজক-সভা’ তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দানের অনুমতি করেন না। যাহা হউক, আমাদের কথায়ই বিরত হইবেন না, নারায়ণশাস্ত্রীর চিঠি লইয়া সভার সম্পাদক বলবন্ত-রামচন্দ্র সহস্রবুদ্ধির সহিত সাক্ষাৎ করিলে সমুদয় জানিতে পারিবেন।” অপরাহ্নে বলবন্ত রামচন্দ্র সহস্রবুদ্ধির সহ সাক্ষাৎ করিলাম। সহস্রবুদ্ধি মহাশয় বেশ শিক্ষিত ব্যক্তি, ইংরেজী সংস্কৃত উভয় ভাষায়ই কৃতবিদ্য। তিনি আর কয়েকটি সদস্যের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন, “আপনি দূরদেশ হইতে সমাগত, অতএব আপনার সম্বন্ধে এক মাস পূর্ব্বে আবেদনের নিয়ম সঙ্কোচ করা গেল। আর আপনি যে সকল গ্রন্থের পরীক্ষা দিয়াছেন, উহা প্রায় আমাদের পরীক্ষিতব্য পুস্তকের তালিকায় নাই, সুতরাং আপনি একখানি আবেদন করুন।” আমি তৎক্ষণাৎ দেবনাগরাক্ষরে সংস্কৃত-ভাষায় একখানি আবেদনপত্র লিখিয়া দিলে সম্পাদক মহাশয় পরীক্ষাদানের অনুমতিপত্র প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন “আপনার সঙ্গে পুস্তক নাই, সুতরাং আপনি ইচ্ছা করিলে আনন্দাশ্রমে বসিয়া পড়িতে পারেন।”

পরদিন ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্নে স্নানান্তে আনন্দাশ্রমে গমন করিলাম। আনন্দাশ্রম পুণা-নগরীর সর্ব্বপ্রধান পাঠাগার। একটী পাষাণনির্ম্মিত বৃহৎ ত্রিতল বাটীতে পাঠাগার অবস্থিত। স্থানীয় লোকের সম্পূর্ণ ব্যয়ে ঐ আশ্রমটী নির্ম্মিত হইয়াছে। পুণা-নিবাসী বোম্বাই, হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল উহার নির্ম্মাণকল্পে প্রায় তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এখানে দুর্লভ সংস্কৃত-গ্রন্থসমূহের সহস্র সহস্র হস্তলিপি বিদ্যমান আছে। পুস্তকের অনুলিপি ও অমুদ্রিত গ্রন্থের সংগ্রহ কার্য্যে অনেক গুলি পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন। আশ্রমে প্রবেশ করিলেই

পুস্তকালয়াধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাদেবশাস্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় আমার নাম, নিবাস ও দেশপর্য্যটনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ও সংস্কৃত-ভাষায় উহার যথাযথ উত্তর করিলাম। তাহার পর, বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশের উপাসক-সম্প্রদায়ের কথা উঠিল। তাঁহার সহিত দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য-সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইলাম। মহাদেবশাস্ত্রী বিলক্ষণ শিষ্টাচার-পরায়ণ ব্যক্তি; আমি যে যে পুস্তক প্রার্থনা করিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ উহা বাহির করিয়া দিলেন। তাঁহার সাহায্যে মুদ্রিত ও হস্তলিখিত সকল প্রকার পুস্তক দেখারই সুবিধা হইল। ৪ঠা ৫ই দুই দিন পূর্ব্বাহ্ণ আটটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত পাঠের নিমিত্ত আনন্দাশ্রমে অবস্থান করিলাম। পুস্তকালয়ের কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদা সদয় ব্যবহারে আমাকে আপ্যায়িত করিতেন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ আহারান্তে দশটার সময় বেদশাস্ত্রোত্তেজক-সভায় উপস্থিত হইলাম। ঐ সভা আদিত্যবারপেটে ফড়কের সুবৃহৎ প্রাসাদের দ্বিতল গৃহে অবস্থিত। বোম্বাই-প্রদেশের যাবতীয় কৃতবিদ্য ও ধনী লোকের উদ্‌যোগে ও অর্থব্যয়ে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এই পরীক্ষা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বোম্বাই-প্রদেশে সংস্কৃতশিক্ষার উৎসাহ দান করাই ঐ সভার প্রধান উদ্দেশ্য। সভায় প্রবেশ করিয়া দেখি দ্রাবিড়ী ও মহারাষ্ট্রী অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিগণে সভাগৃহ পূর্ণ হইয়াছে। নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণ উক্ত বৎসর পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

(১)	বেদমূর্ত্তি কাশীনাথ ভট্‌জী বাবা চিতলে,	ঋগ্বেদ।
(২)	বেদমূর্ত্তি রামভট্‌জী খরে	আপস্তম্ব।
(৩)	বেদমূর্ত্তি কৃষ্ণভট্ ও	যাজ্ঞিক।
(৪)	বেদমূর্ত্তি বালশাস্ত্রী দিবাকর	

(৫)	নরসিংহশাস্ত্রী শেজবলকর,	ব্যাকরণ।
(৬)	জয়রামাচার্য্য	ন্যায় ও বেদান্ত।
(৭)	বাসুদেবশাস্ত্রী দেড়গাঁওকর,	জ্যোতিষ।
(৮)	শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিত	ধর্ম্মশাস্ত্র।
(৯)	নারায়ণশাস্ত্রী সাঠে	সন্ধ্যাভাষ্য।
(১০)	বলবন্ত রামচন্দ্র সহস্রবুদ্ধি,	অলঙ্কার।
(১১)	বলবন্ত সদাশিব দাতে,	বুৎপত্তি।
(১২)	গণেশকৃষ্ণ গর্দ্দে,	বৈদ্যক।

উপরি উক্ত অধ্যাপকগণ প্রথম দিন মৌখিক প্রশ্নদ্বারা পরীক্ষা-কার্য্য শেষ করিলেন। পরীক্ষাগৃহে সংস্কৃতভাষা ব্যতীত অন্য ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ! আমি চারি জন অধ্যাপকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষা দিয়া সায়ংকালে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। রাত্রিতে আর পাঠ করিতে ইচ্ছা হইল না। পূর্ব্বোক্ত বন্ধু শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকারের সহিত তাঁহার সঙ্গীতগুরু প্রসিদ্ধ কলাবৎ শ্রীমান্ পুরুষোত্তম-গণেশ ঘাড়পোড়ে মহাশয়ের গৃহে গমন করিলাম। ঘাড়পোড়ে মহাশয়ের ক্ষুদ্র উদ্যান-মধ্যস্থ বৈঠকখানায় সঙ্গীত আরম্ভ হইল। মাঘকবির শিশুপালবধকাব্য অধ্যয়ন কালে বীণাযন্ত্রের বর্ণনা পাঠ করিয়াছিলাম কিন্তু ঐ দিন উক্ত যন্ত্র নয়নগোচর করিয়া পরম প্রীত হইলাম। সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল।

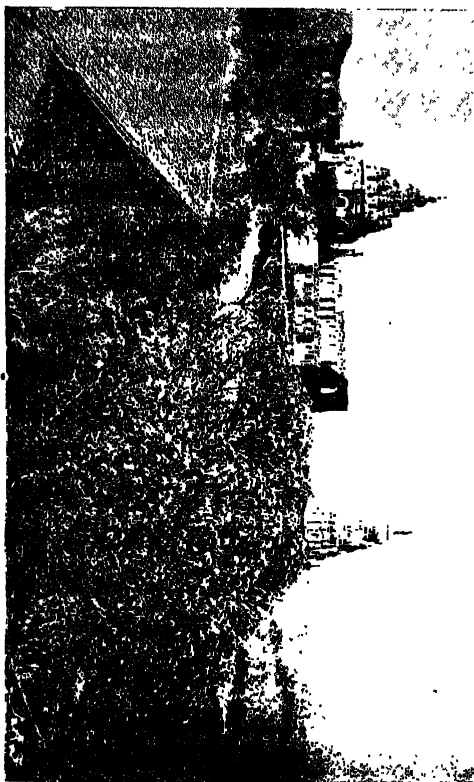
৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে চন্দ্রবাবুর সহিত সেতারার তদানীন্তন ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ মিঃ সত্যেন্দ্রনাথঠাকুর I. C, S, মহোদয়ের বাসায় গমন করিলাম। সত্যেন্দ্র বাবু কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে পুণা-সহরের উত্তর ভাগে একটী বাঙ্গলোতে সপরিবারে অবস্থিতি করিতেছেন। সহধর্ম্মিণী, পুত্র, কন্যা তদীয় অগ্রজ মহাত্মা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথঠাকুর ও অনুজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথঠাকুর মহাশয়ও সেখানে ছিলেন। বাঙ্গালাদেশে

কলিকাতার ঠাকুরবংশ বিদ্যা বুদ্ধি ঐশ্বর্য্যে চির-প্রসিদ্ধ। কখনও উঁহাদের সহিত আলাপ করিবার সুযোগ ঘটে নাই, ঐ দিন সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত পরিতোষ লাভ করিলাম।

প্রায় এগারটার সময় বাসায় আসিয়া আহারান্তে পুনরায় বেদ-শাস্ত্রোত্তেজক সভায় গমন করিলাম। ঐ দিন লিখিত প্রশ্ন সকল প্রদত্ত হইল। আমি একটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত পরীক্ষাগৃহে বসিয়া প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া দিয়া বাসায় ফিরিলাম। পূর্ব্বে পরীক্ষকগণ বলিয়াছিলেন "সংস্কৃতভাষায়" প্রশ্নের উত্তর লিখিলেই চলিবে, বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিলে ক্ষতি হইবে না।" কিন্তু আমি লিখিতে আরম্ভ করিলে বাঙ্গালা বর্ণমালার আকৃতি দেখিয়া সকলে অবাক্। গুজরাটী তেলেগু, উৎকল দেবনাগর প্রভৃতি কোন বর্ণমালার সহিতই উহার আকারগত ঐক্য নাই। কাজেই পূর্ব্বের আদেশ প্রত্যাহার করিতে হইল। তাঁহারা বলিলেন "দেবাক্ষরে লিখিতে হইবে, নতুবা আমরা বুঝিতে পারিব না"। অগত্যা দেবনাগরই অবলম্বন করিলাম, অনভ্যাসবশতঃ কিছু অধিক সময় আবশ্যক হইল। দাক্ষিণাত্যবিদ্যার্থিগণও আমার তুল্য সময় গ্রহণ করিলেন।

৮ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ণে পার্ব্বতীশৈল সন্দর্শন করিতে গমন করিলাম। পুণানগরীর দক্ষিণে প্রায় এক ক্রোশ দূরে পার্ব্বতীহ্রদের তীরবর্ত্তী পার্ব্বতীশৈলের শিখরদেশে পাষাণময় অট্টালিকা ও সুন্দর মন্দির বিদ্যমান। ঐ মন্দিরে বাজীরাও পেশওএ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুবর্ণময়ী পার্ব্বতী ও পাষাণময় শিবলিঙ্গ বিরাজমান। নগরপ্রান্ত হইতে ঐ দেবমন্দির-পরিশোভিত শৈলশৃঙ্গের শোভা যে কি মনোমুগ্ধকর উহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। একটী কৃত্রিমনদীর তীর হইতে পর্ব্বত গাত্রদিয়া শৈলারোহণের সোপান-শ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সমুদয় সোপানের অত্যধিক দৃঢ়তা ও বিশাল পরিসর দেখিলে বিস্মিত হইতে

হয়। বাজীরাওপেশওএ সসৈন্যে ঐ প্রশস্ত সোপানপথে পর্ব্বতারোহণ করিতেন। ঐ পথে সহস্র লোক এক সঙ্গে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে



পার্ব্বতী-পাহাড়—পুণা।

পারে। প্রায় অর্দ্ধ মাইল পৈঠা ভাঙ্গিয়া অতিশ্রান্ত ও গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবরে পার্ব্বতী-মন্দিরে উপনীত হইলাম। ঐ পর্ব্বতশিখরে শিবপার্ব্বতীর মন্দিরও প্রাচীর-বেষ্টিত বিশাল দ্বার-বিশিষ্ট পেশওএরাজগণের প্রাসাদ বিদ্যমান। মন্দিরে কয়েকজন পূজারি ও পরিচারক নিযুক্ত আছে।

দেব-সেবার ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইংরেজগবর্মেণ্ট বার্ষিক সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। শিবপার্ব্বতীর সন্দর্শন এবং প্রদক্ষিণ প্রণামাদি শেষ করিয়া শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত মন্দিরের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী অট্টালিকায় গিয়া বসিলাম। বজ্রপাতে ঐ অট্টালিকার ছাদ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জলকণসংসর্গী বিমল বায়ুতে অল্পক্ষণের মধ্যেই শরীর শীতল হইয়া গেল। নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা গেল অদূরস্থ প্রান্তরবাহিনী স্বচ্ছতোয়া মূলা ও মুথা নাম্নী নদী দুইটী রজতরেখার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে নিদাঘ-কালের নানাবিধ বিকসিত কুসুমালঙ্কারে বিভূষিতা সৌধমালিনী পুণানগরী সৌন্দর্য্যগর্ব্বে অমরাবতীব ন্যায় বিরাজিত। দূরে দূরে শৈলশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে শস্যক্ষেত্র ; আহা ঐ স্থানের প্রকৃতি কেমন এক প্রকার অভিনব বৈচিত্র্যশালিনী! আমি অনেকক্ষণ ঐ স্থানে বসিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিলাম। যে সকল বাঙ্গালী পার্ব্বতী-মন্দির সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাসাদগাত্রে আপন আপন নাম লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। আমিও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আপন নামটী অঙ্কিত করিয়া ধীরে ধীরে অবতরণ করিলাম। আমি ঐ পর্ব্বতে আরোহণে ও অবরোহণে কত শ্রান্তি বোধ করিলাম কিন্তু ওদেশীয় লোকেরা উহা একটা আয়াস-সাধ্য কর্ম্ম বলিয়াই মনে করে না। পার্ব্বতীশৈল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মধ্যাহ্ন আহারের পর পুনরায় বেদশাস্ত্রোত্তেজক-সভায় গমন করিলাম। ঐ দিন সংস্কৃতভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখিতে হইল। প্রশ্নের বিষয় "সংস্কৃত-বিদ্যার ইতিহাস"। বৈদিক কাল হইতে কি প্রকারে সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত-শাস্ত্রসমূহ সৃষ্ট পুষ্ট ও বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার সবিস্তার বর্ণনাই ঐ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যথাশক্তি সংস্কৃত-ভাষায় প্রবন্ধটী লিখিয়া দিয়া সায়ংকালে বাসায় ফিরিলাম।

৯ই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ন ৩টার সময় ছাত্রাবাসের অন্যতম বিদ্যার্থী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। ছাত্রাবাস যে পল্লীতে অবস্থিত, উহার নাম "নানাচাপেট্"। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে পেশওএ সবাই মাধবরাওর রাজত্বকালে নানাফড়্নবীশ কর্ত্তৃক ঐ পল্লীটী প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার পূর্ব্বাংশে একটী প্রান্তরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পারসীক ও ইংরেজ-বালক বালিকারা ক্রীড়া করিতেছে। কিছু দূর অগ্রসর হইলেই পারসীকদিগের অগ্নিমন্দির ও হিন্দুদের বিঠোবা-মন্দির এবং ঘোড়েপীরের আস্তানা-প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইল। নগরের ঐ অংশে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষবাটিকা-পরিশোভিত ইংরেজ ও ধনী পারসীকগণের দৃষ্টিরম্য অট্টালিকারাজি দর্শকের পক্ষে অতিশয় প্রীতি-প্রদ। কিঞ্চিৎ দূরে দূরে শৈলশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রান্তর ও উদ্যান দেখিতে দেখিতে চলিলাম। যতীন্‌বাবু বলিলেন "আষাঢ় মাসে এখানে দিবারাত্রি প্রায় অবিশ্রান্ত বিন্দু বিন্দু জল-বর্ষণ হইতে থাকে, তখন উদ্যানের বৃক্ষ লতা নুতন পুষ্পপল্লবে বিভূষিত হইয়া নগরের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে। তখন ঐ স্থান এত স্বাস্থ্যপ্রদ হয় যে, জীবনের আশাহীন কোন চিররোগী ব্যক্তি ও কিছুকাল বাস করিলে সবলদেহ ও প্রফুল্লবদনে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারে। বম্বের গবর্ণর্ ঐ সময় পুণায় অবস্থিতি করেন।

১০ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে পণ্ডিতা রমাবাইর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সারদা-সদনে গমন করিলাম। দ্বারদেশ হইতে নাম লিখিয়া পাঠাইলেই তৎক্ষণাৎ তিনি যাইতে অনুমতি করিলেন এবং বারান্দার সিঁড়ি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বসিবার ঘরটী বেশ সুসজ্জিত এবং অনেক মুদ্রিত গ্রন্থ ও সংবাদপত্রে পরিপূর্ণ। পণ্ডিতা বাইর সংপ্রতি শ্রবণশক্তির কথঞ্চিৎ ক্ষীণতা ঘটিয়াছে, তজ্জন্য চেয়ার্ খানি অতিন্নিকটে স্থাপন করিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

প্রথম পরিচয়ের পর, তাঁহার কন্যা ও মাতৃস্বসার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ইয়ং মে দুহিতা, অসৌ মম মাতৃস্বসা। কন্যাটির বয়স দ্বাদশ বৎসর হইবে, নাম মনোরমাবাই। কুমারীবাইকে দেখিয়াও বেশ বুদ্ধিমতী বলিয়া বোধ হইল। চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষার্থ আমেরিকায় পাঠাইবার উদ্দেশ্যে রমাবাই আপন দুহিতাকে ইংরেজী ও লাটিন্ পড়াইতেছেন। কন্যা মাতার ন্যায় সম্পূর্ণ গৌরাঙ্গী না হইলেও সুগঠিত-দেহা এবং প্রফুল্লমুখী। পণ্ডিতাবাই কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "বাঙ্গালা-দেশ হইতে ফিরিয়া আসার পর নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন ঘটে নাই ; ইংলণ্ডে অবস্থান কালে দুই দিন অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-অধ্যাপক ভট্ট মোক্ষমূলারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দিন কথোপকথন কালে সংস্কৃতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজীতে সমাপ্ত করি। দ্বিতীয় দিন আলাপের সময় দুই চারিটী সংস্কৃত কথা ব্যতীত অধিকাংশই ইংরেজীতে শেষ করিতে হইয়াছিল। স্বদেশীয় যে সকল পণ্ডিত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাঁহারা মরাঠী ভাষায়ই কথা বলেন, আজ আপনার সহিত দেবভাষায় কথা বলায় আমার বড় আনন্দ বোধ হইতেছে"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "য়ুরোপে বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত চর্চ্চা কিরূপ হইতেছে ?" রমাবাই বলিলেন "সমস্ত য়ুরোপে যে কয়টী সংস্কৃতবিদ্ আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা নখাগ্রে গণনা করা যায়।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি য়ুরোপে অবস্থান কালে কিরূপ পরিচ্ছদ ও খাদ্য পানীয় ব্যবহার করিতেন ?" তিনি বলিলেন, "এখন যেরূপ পরিচ্ছদ দেখিতেছেন, আমি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় অবস্থানকালেও এইরূপ পরিচ্ছদই ব্যবহার করিতাম, তবে এত সূক্ষ্ম নহে, সে সমুদয়ই উর্ণানির্ম্মিত এবং শীতের প্রভাব নিবারণে সমর্থ। আমি কখনও মাংস স্পর্শ করি নাই, অন্ন রোটিকা ডা'লও যথেষ্ট ঘৃতই আমার দেহ রক্ষার উপাদান ছিল। উহাতে

আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই, আমি বেশ সবলদেহে ও সুস্থমনে দেশে ফিরিয়াছিলাম!” দক্ষিণাপথে এখন বেদচর্চ্চা কিরূপ হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিতাবাই বলিলেন “ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে বেদচর্চ্চা নাই বলিলেই হয়, মহারাষ্ট্র ও দ্রাবিড়েই যাহা কিছু আছে কিন্তু তাহাও আশানুরূপ নহে। এই পুণা নগরীতে যে সকল বেদজ্ঞ পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের দুই একজন ব্যতীত সকলের বেদার্থ-পরিজ্ঞান নাই কিন্তু যাঁহাদের শুধু বেদ মুখস্থ আছে, এরূপ পণ্ডিতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে”। ইংরেজী শিক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন “ইংরেজী-শিক্ষায় মহারাষ্ট্র-দেশ বাঙ্গালা দেশের অনেক পশ্চাতে অবস্থিত। পাশ্চাত্য মতে স্ত্রীশিক্ষাও বাঙ্গালা দেশের তুলনায় মহারাষ্ট্রে নিতান্তই অল্প হইতেছে”।

এই সকল কথার পর, রমাবাই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি জানেন আমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বিনী?” আমি বলিলাম “হাঁ আমি শুনিয়াছি, আপনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।” আবার প্রশ্ন করিলেন “এখানে ধর্ম্মমত লইয়া কাহারও সহিত আপনার কোন কথা হইয়াছিল কি?” আমি বলিলাম “আনন্দাশ্রমের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাদেবশাস্ত্রীর সহিত দ্বৈতবাদও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে সামান্য কথোপকথন হইয়াছিল”। রমাবাই বলিলেন “দ্বৈতবাদীই হউন, আর অদ্বৈতবাদীই হউন, যিশুর কৃপা ব্যতীত কাহারই মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।” আমি বলিলাম “ইতিহাসাদিতে পাঠ করা যায়, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যিশুখ্রীষ্ট কিঞ্চিদূন দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব যে সকল লোক উক্ত মহানুভবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের তবে কি গতি হইয়াছে?” তিনি বলিলেন “হাঁ তাহারা যদি সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে, অবশ্য মুক্ত হইয়াছে। যাহারা যিশুর নাম শুনে নাই, অথচ উত্তম কার্য্য করে,

তাহারা মুক্তি পাইতে পারে কিন্তু যাহারা যিশুর নাম শুনিয়াছে, অথচ ভজনা করে না, তাহারা যিশুর দয়া ভিন্ন পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না।" আমি একটু অবিশ্বাসের ভাব দেখাইয়া বলিলাম "আপনার কথা আমি অনুমোদন করিতে পারিলাম না, কারণ উহার মূলে কিছুমাত্র যুক্তি নাই"। রমাবাই কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া একখানি সংস্কৃত বাইবেল্ বাহির করিলেন এবং উহার একটী স্থান পড়িতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া বলিলাম "ইহার কিয়দংশ পাঠ করিয়াই আমার এত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, বোধ হয় বহু বিতর্কেও তাহার মীমাংসা হইবে কি না সন্দেহ"। তাহার পর, আরও অনেক কথা হইল। পণ্ডিতা রমাবাই জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আর কয় দিন এখানে থাকিবেন ?" আমি বলিলাম "দুই দিনের অধিক নহে"। তিনি আর একবার আমাকে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম "আর বোধ হয় সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা হইবে না, কারণ দুই দিনে আমাকে অনেক স্থান সন্দর্শন করিতে হইবে, অতএব এই শেষ সাক্ষাৎকার"। আমি বিদায় কালে পণ্ডিতাবাইকে বলিলাম "আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, আপনার সহিত ধর্ম্মমত লইয়া বিতর্ক হইবে। অতএব ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিতর্ক হওয়ায় যদি আপনার মতের বিরুদ্ধে কোন তীক্ষ্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।" রমাবাই হাঁসিয়া বলিলেন "সে কি ? ধর্ম্মসম্বন্ধে পৃথিবীতে মতভেদ চিরকালই আছে, তর্ক ব্যতীত সত্য নির্ণয় হয় না। আর আপনি ত তেমন কোন তীক্ষ্ণ বাক্য ব্যবহার করেন নাই, এ আপনার অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করা হইতেছে।"

পণ্ডিতা রমাবাই একটী প্রভাববতী মহিলা। তাঁহার পিতার নাম অনন্তশাস্ত্রী ও মাতার নাম লক্ষ্মীবাই। অনন্ত, মহারাষ্ট্রের কোঙ্কণস্থ-

ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত ছিলেন। তিনি শৈশবে বিবাহ করিয়া শেষে পুণানগরীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক রামচন্দ্রশাস্ত্রীর নিকট অধ্যয়ন করিতে আসেন। তাঁহার অধ্যাপক যখন পেশওএরাজপ্রাসাদে কোন রাণীকে সংস্কৃত পড়াইতে যাইতেন, তখন অনন্তও সঙ্গে থাকিতেন। একদিন উক্ত রাণীকে মধুরস্বরে সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিতে শুনিয়া অনন্ত অত্যন্ত আহ্লাদিত হন এবং স্বীয় বালিকা পত্নীকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার অন্তঃকরণে বাসনা জন্মে। তাহার পর, অনন্তশাস্ত্রী ত্রয়োবিংশ কি চতুর্ব্বিংশ বর্ষে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে গমন করেন এবং পত্নীকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু গুরুজনের প্ররোচনায় তাঁহার পত্নী অধ্যয়ন করিতে সম্মত না হওয়ায় তাঁহার সকল প্রযত্ন ব্যর্থ হয়। কিছুদিন পরে পত্নী কালগ্রাসে পতিত হইলে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। ঐ নবপরিণীতা সুন্দরী বালিকার নাম লক্ষ্মীবাই। লক্ষ্মী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও স্বামীর আজ্ঞাকারিণী ছিলেন। স্বামী, প্রস্তাব করিবামাত্র তিনি লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। গুরুজনেরা প্রথমে নিষেধ করিলেন, শেষে লক্ষ্মীকে শিক্ষা হইতে বিরত করিবার জন্য তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার বিদ্রূপ ও অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। অগত্যা অনন্তের গৃহত্যাগ করিতে হইল। তিনি বালিকা পত্নী, শয্যা ও কতিপয় গৃহসামগ্রী লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তাহার পর, সহ্যপর্ব্বতের পাদদেশে গোদাবরী-সন্নিহিত গঙ্গামল নামক আরণ্য ভূভাগে দুখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। উহার অনতিদূরে দুই চারিটী ভীলের আবাস ব্যতীত অন্য লোকালয় ছিল না। তখন সভ্য জ্ঞাতিবন্ধু আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা অসভ্য ভীলগণের সাহচর্য্যই অনন্তের পক্ষে প্রার্থনীয় বোধ হইয়াছিল। বনেচরগণ তাঁহার যথেষ্ট উপকার করিত, তাহারা শাস্ত্রীকে বড় ভক্তি করিত এবং প্রায়ই শুষ্ক কাষ্ঠ,বনের

ফল মূল, ক্ষেত্রের শস্য প্রদান করিত। অনন্ত, ঐ বিজন অরণ্যে প্রেমময়ী বালিকা ভার্য্যাকে লইয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইল। লক্ষ্মীবাই সংস্কৃতভাষায় বেশ বিদুষী হইলেন। অনন্ত, ঐ সময় ভীলদের সাহায্যে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলেন এবং একটী নূতন আবাস প্রস্তুত করিলেন। ঐ নূতন ভবনে প্রবেশের পর, ক্রমে তাঁহার একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মিল। ঐ কন্যা দুইটীর মধ্যে আমাদের বর্ণনীয়া রমাবাই কনিষ্ঠা। তিনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মাতা উভয়েই অতিযত্নপূর্ব্বক পুত্র কন্যাদের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও দেশস্থ লোক তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তাঁহার গৃহে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন সুতরাং শাস্ত্রীর যাহা আয় হইত তদপেক্ষা অধিক ব্যয় হইতে লাগিল। তাঁহার প্রথমা কন্যার অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়া গেল। শাস্ত্রী ও শাস্ত্রি-পত্নী প্রাণ-পণে পুত্রটীকে ও মেধাবিনী কন্যা রমাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে শাস্ত্রী বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন, এদিকে যাহা কিছু ছিল, ঋণদাতারা বিক্রয় করিয়া লইয়া গেল। নিরুপায় হইয়া অনন্তশাস্ত্রী পত্নী ও সন্তানগণ সহ তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ-কালেও তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি রমার শিক্ষা দানে বিরত হন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, শিক্ষা সমাপ্ত হইলে একটু অধিক বয়সে রমাকে কোন সৎপাত্রে অর্পণ করিবেন কিন্তু বিধাতা সকলের সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন না, রমার বয়স যখন পনর বৎসর নয় মাস, তখন শাস্ত্রী ও শাস্ত্রি-পত্নী পরলোক গমন করিলেন। যখন লক্ষ্মীবাইর মৃত্যু হয়, তখন একমাত্র সহোদর ব্যতীত রমার আর কেহই ছিল না। সুতরাং অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় অপর দুইটী সাহায্যকারী ব্রাহ্মণের সহিত রমাকে ও জননীর মৃত দেহ বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। জনক

জননীর মৃত্যুর পর, রমাবাই সহোদর ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী নামক একটি হিন্দুস্থানী অধ্যাপকের সহ ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে পর্য্যটন করেন। তিনি ঐ সময় বঙ্গদেশেও আসিয়াছিলেন। কলিকাতার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সংস্কৃত-ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা ও সমস্যা-পূরণে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া "সরস্বতী" উপাধি প্রদান করেন। রমাবাইসরস্বতী যখন সমস্যাপূরাণার্থ আহূত হইয়া নদীয়া রাজধানীতে গমন করেন, তখন আমরা কিশোরবয়স্ক, নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ৺কৃষ্ণকান্ত-শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতাম। আমাদের পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহাশয়ই রমাবাইকে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় পূরণার্থ একটী কবিতাংশ প্রদান করেন *। তাহারপর, রমা কৃষ্ণনগর হইতে রংপুরে আহূত হন। সেখানে কোন বিধবা ভূম্যধিকারিণীর বাটীতে তিনমাস কাল অবস্থিতি করিয়া কয়েকটি সাধারণ সভায় সমস্যা পূরণ করেন। ঐ সময় রংপুরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক (এখন, মহামহোপাধ্যায়) পণ্ডিত যাদবেশ্বরতর্করত্ন মহাশয়ের সহিত রমাবাই সরস্বতীর সৌহৃদ্য জন্মে। তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার গুণে একান্ত মোহিত হইয়া একখানি প্রশস্তি রচনা করেন এবং পূর্ব্বোক্ত ভূম্যধিকারিণীর হস্ত দিয়া উহা রমাকে উৎসর্গ করেন। কিছুকাল পরেই রমাবাই কামরূপে গমন করেন। সেখান হইতে শ্রীহট্ট হইয়া ঢাকানগরে উপস্থিত হন। ঢাকায় তাঁহার সঙ্গী প্রবীণপণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর বিসূচিকা-রোগে মৃত্যু হয়। তাহার পর, তিনি পুনরায় রংপুর হইয়া বিহার প্রদেশে প্রস্থান করেন। কিছুদিন পরে শূদ্রজাতীয় এক ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া, রমা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহ করেন নাই। উহা অসাম্প্র-

* ঐ কবিতাংশ এই :—ভূঙ্গৈঃ সৎপ্রতিপক্ষতাং প্রবিদধন্ মাধাব রে পদ্মিনীম্।

দায়িক পরিণয়, সুতরাং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন অনুসারে উক্ত বিবাহ রেজেষ্টেরি করা হয়। তিনি স্বামীর সহিত কিছুকাল, কাছারে বাস করেন। বিবাহের পর, এক বৎসর পাঁচ মাস মাত্র তাঁহার স্বামী জীবিত ছিলেন।

তাহার পর, কন্যা সহ রমা স্বীয় জন্মভূমি মহারাষ্ট্রে গমনপূর্ব্বক পুণা নগরীতে "আর্য্যমহিলাসমিতি" স্থাপন করেন। কিছুকাল ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। শেষে তিনি নিজের ইংরেজী-ভাষা জ্ঞানের অভাব অনুভব করিয়া আপন শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ওয়ান্টেজ নগরীতে এক বৎসর ইংরেজী-ভাষা অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রমা চেণ্টেনহাম-নগরের মহিলা-বিদ্যালয়ে সংস্কৃত-অধ্যাপিকার পদে নিযুক্ত হন। ঐ স্থানে অবস্থানের সময় তিনি অবসর কালে গণিত ও বিজ্ঞান-শাস্ত্র অভ্যাস করিতেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রমাবাই আমেরিকায় উপস্থিত হন এবং তত্রত্য কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদ লাভ করেন। কয়েক বৎসর সেখানে কার্য্য করার পর স্বদেশে ফিরিয়া ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পুণানগরীতে "সারদা-সদন" নামে একটী মহিলা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। আমেরিকার খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক-সম্প্রদায় ঐ সারদাসদনের বাটী নির্ম্মাণের ব্যয়-স্বরূপ তাঁহাকে প্রায় ৭০,০০০ সত্তর হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। সারদা-সদনে বিদ্যার্থিনীর সংখ্যা ৬৬টী মাত্র। উহার অর্দ্ধাংশ, ছাত্রীনিবাসে থাকিয়া বিদ্যা অভ্যাস করেন এবং অপরার্দ্ধ গ্রাম ও নগর হইতে আসিয়া অধ্যয়ন করিয়া যান। ছাত্রীদের অধিকাংশই, হিন্দু, আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিনী ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিনী এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিনীও আছেন। ঐ বিদ্যালয়ে মাসিক দেড় সহস্র টাক ব্যয়িত হয়। উহাও আমেরিকার খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ প্রদান করেন।

রমাবাইসরস্বতী সকলেরই ধন্যবাদার্হ। কারণ, তিনি যেরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়া ও আপন অধ্যবসায়-প্রভাবে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, উহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ঐ দিন অপরাহ্ণে পূর্ব্বোক্ত যতীন্‌বাবুর সহিত নগরীর উত্তর পশ্চিমাংশে নদীবক্ষঃস্থ হোলকর-সেতু অতিক্রমপূর্ব্বক পুণার সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক-বিশ্ববিদ্যালয়ে উপনীত হইলাম। তত্রত্য কলেজ-বাড়ীটী মনোহর-উদ্যান-শোভিত। যতীন্‌বাবু কলেজে লইয়া গিয়া কোথায় কৃষিশাস্ত্র, কোথায় স্থপতিবিদ্যা ও কোথায় যন্ত্রাদি-নির্ম্মাণ কার্য্য শিক্ষা হয়, উহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইলেন। তাহার পর, উদ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিলাম। উহার একাংশে কয়েকখণ্ড ভূমিতে শস্যবীজ অঙ্কুরিত হইতেছে। কোন অংশে বা নানাবিধ ফলের চারাগাছ এক স্থানে সংগৃহীত আছে। ঐ সকল স্থলে জল-সেকের উত্তম ব্যবস্থা দেখিলাম। উদ্যানে কতই পরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত পুষ্পিত তরুরাজি বিদ্যমান, তাহার সংখ্যা করা যায় না। বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতার বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ প্রকরণে. বৃক্ষসমূহের রোপণ ও পালনের অনেক বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের তীক্ষ্ণ মনীষা তৎ সমুদয় ভিন্ন আরও কত নূতন পদ্ধতি আবিষ্কারে ব্যাপৃত, তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? বৈজ্ঞানিক-বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ একটী প্রশস্ত রাজপথ অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ পশ্চিমাভি-মুখে চলিলাম। ঐ সুন্দর রাজপথের উত্তরভাগে বহু য়ুরোপীয় ও দেশীয় ধনিকগণের উদ্যান-শোভিত সুন্দর সুন্দর আবাস দৃষ্টিগোচর হইল। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের বাটী ও ঐ রাজপথের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত।

যাইতে যাইতে প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইলাম। একটী শৈলমালার গাত্রে কতকগুলি গুহা আছে। উহার নাম পাণ্ডব-গুহা। সাধারণ

লোকের বিশ্বাস, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ বনবাস কালে ঐ গুহায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে উহা পুরাকালের কোন-রূপ বৌদ্ধকীর্ত্তি। যাহা হউক, আমরা উক্ত গুহা ত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ ফার্গুসন্-কলেজের সন্নিহিত হইলাম। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রযত্নে এই কলেজটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশীয় লোকের সম্পূর্ণ সাহায্যে উহা পরিচালিত হইয়া থাকে। স্থানটী বড়ই মনোরম এবং বিদ্যার্থিগণের পাঠাবস্থায় অবস্থানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। শৈলমালার বিজন উপত্যকায় পাষাণ-নির্ম্মিত সুন্দর বিদ্যামন্দিরটী বহুদূর হইতে নয়নগোচর হয়। পার্শ্বেই ছাত্রাবাস, কয়েকটী বিদ্যার্থীকে প্রান্তর-মধ্যে পাদচারণায় নিরত দেখিলাম। অনেকে সমবেত হইয়া ব্যায়াম করিতেছে। ঐ স্থানটী নগর হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ওখানকার ছাত্রেরা নগরের বিলাস বিভ্রম হইতে দূরে থাকিয়া বেশ স্বাস্থ্য ও শান্তি উপভোগ করে। সূর্য্য অস্তগত-প্রায়, আমরা দ্রুতপদে পুণানগরীর পশ্চিমভাগস্থ ওয়েস্‌লীসেতুর উপরিভাগে উপনীত হইলাম। উহার দক্ষিণে নদীর পূর্ব্বতীরে ভীষণ শ্মশানভূমি। নদী পার হইয়া আমরা অদৃষ্টপূর্ব্ব পল্লীসকল দেখিতে দেখিতে রাত্রি আটটার পর বাসায় উপস্থিত হইলাম।

পুণায় দেখিবার ও চিন্তা করিবার বিষয় অনেক আছে। যে পেশোয়া-নৃপতিদের জন্য মহারাষ্ট্রের গৌরব, তাঁহাদের পুরাতন প্রাসাদ শনিবার-পেটে অবস্থিত। এখন উহা বহুস্থানব্যাপী ধ্বংসাবশেষ মাত্র। উহার অনতিদূরে ওঙ্কারেশ্বর হরিহরেশ্বর, অমৃতেশ্বর মারুতি গণপতি অষ্টভুজা এবং গায়কবাড়েব ভবন বিরাজিত। বর্ত্তমান পিঁজরাপোল ও ঐ পল্লীতে বিদ্যমান। বুধবার-পেটে অষ্টমপেশও-এর প্রাসাদ, বেলবাগ, ভাঙ্গিয়ামারুতির মন্দির, কোতোয়ালচাব্‌ড়ি, তাম্বড়ী

যোগেশ্বরী, খনালীরামের মন্দির, মোরোবা দাদার ভবন, ভিদের ভবন. ধম্‌ধারের ভবন, ঠট্টের রামমন্দির ও পাসোদিয়া মারুতির মন্দির বিরাজমান। শুক্রবার-পেট জীবাজীপন্থ-খাস্‌গিবালে কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ঐ পল্লীতে তালিমখানা তুলসীবাগ লক্কড়খানা কালাহ্রদ রামেশ্বর-মন্দির পন্থসচিবের প্রাসাদ চৌধুরীভবন হীরাবাগ ও পরেশনাথের মন্দির বিদ্যমান। সদাশিব নামক পল্লীটি তৃতীয় পেশওএর ভ্রাতা সদাশিব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ঐ অংশে লকড়ীপুল, বিঠোবা ও মুরলীধরের মন্দির, খাজিনাবিহার, ফড়নবীশের জলাধার, বিশ্রামবাগ-প্রভৃতি বিদ্যমান। শিবপুরী নামক পল্লীতে ও দ্রষ্টব্য বস্তুর অভাব নাই। পেশওএর অশ্বারোহী সৈনিকগণের নেতা আনন্দরাও লক্ষ্ণ-রাস্তিয়ার শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ঐ স্থান শিবপুরী নামে খ্যাত হয়। এখানকার রাস্তিয়া-ভবন নামক বৃহৎ প্রাসাদ দর্শকের বিস্ময়জনক। মঙ্গলবার-পেটের নাগেশ্বরের মন্দিরটীও উল্লেখযোগ্য। ভবানী নামক পল্লীটী পেশওএ সবাই মাধবরাওর রাজত্বকালে নানাফড়নবীশ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ঐ স্থানের ভবানীমন্দির ও তেলফলাদেবীর মন্দির বিলক্ষণ দর্শনযোগ্য। কস্‌বা নামক স্থানে গণপতি-মন্দির প্রভৃতি বিদ্যমান। আদিত্যবারপেট বালাজীবাজীরাওর রাজত্ব-কালে মহাজন ব্যবহার জ্যোষী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ পল্লীতে দুর্জ্জনসিংহের পাগ ফড়কের প্রাসাদ সোমেশ্বর-মন্দির বেহোরাদিগের জমাৎখানা প্রভৃতি বিরাজিত। গণেশনামক পল্লীর মারুতির দোলমন্দির একটি দর্শনীয় পদার্থ। এতদ্ভিন্ন পুণার নদীতীরস্থ অসংখ্য দেবমন্দির ও মঠ পুণ্যাত্মা প্রতিষ্ঠাতৃগণের শরীরিণী অক্ষয়কীর্ত্তির ন্যায় বিরাজিত হইয়া নিয়ত দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়ে পবিত্র আনন্দ প্রদান করে। পারসীকদিগের প্রেতভবন সিন্ধিয়াছত্রী বারুদখানা গোরাবাগান সেনাবারিক জেলখানা ফৌজদারী এবং দেওয়ানীকোর্ট প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য পদার্থ মধ্যে গণ্য।

১২ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্ন আহারের পর পূর্ব্বের নির্দ্দেশ অনুসারে আদিত্যবারপেটে পূর্ব্বোক্ত ফড়কের সুবৃহৎ প্রাসাদে উপনীত হইলাম। ঐ দিন উত্তীর্ণ বিদ্যার্থিগণের পারিতোষিক প্রদানের নিমিত্ত উক্ত প্রাসাদের দ্বিতল গৃহে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছে। গুজরাট্ মহারাষ্ট্র ও দ্রাবিড়-প্রদেশের যাবতীয় অধ্যাপক ও পুণানগরীর হিন্দুসমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ ঐ সভা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। উষ্ণীষশোভী মস্তকগুলি শ্রেণীবদ্ধ স্ফটিকস্তম্ভের ন্যায় সভার শোভাও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বদিকে ঠিক মধ্যে একটী বেদীর উপরিভাগে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমন্ত রাঃ রাঃ ত্র্যম্বকরাওরামরাও উর্ফ নানাসাহেব পুরন্দর মহোদয় সুন্দর-কারুকার্য্য-খচিত বৃহৎ উষ্ণীষে মস্তক আবৃত করিয়া সভাপতির আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ ভাগে প্রথমে দ্রাবিড়ী এবং মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপকবর্গ, তৎপর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ বসিয়াছেন। বামভাগে ও সম্মুখে মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সমাসীন। সভায় প্রায় পাঁচশতের অধিক শিক্ষিত লোক সমবেত হইয়াছেন কিন্তু কার্য্যপ্রণালীর গুণে সভাগৃহ নীরব গাম্ভীর্য্যময়। গৃহের ভিত্তিতে অনেক আলেখ্য দেখিলাম কিন্তু একটী চিত্রও বিলাসিতা-ব্যঞ্জক নহে। অধিকাংশই ইতিহাস-বিশ্রুত যুদ্ধের প্রতিকৃতি। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, কেবল অশ্বারোহী বীরগণের পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন ও দুর্গরক্ষার চিত্র। আমি উপস্থিত হইলেই সম্পাদক মহাশয় আমাকে লইয়া গিয়া ছাত্রদের মধ্যে বসাইয়া দিলেন। সভাস্থ সকলেই আমার উষ্ণীষশূন্য মস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, উষ্ণীষ ধারণ সভ্যতার একটি অঙ্গ, সভাস্থ পাঁচশত সভ্য উষ্ণীষমণ্ডিত, কেবল একাকী "আমি নিরুষ্ণীষ" ইহাতে মনে মনে একটু লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। সভাসংলগ্ন অপরগৃহে যবনিকার অন্তরালে

পুরন্ধ্রীবর্গ ও প্রাপ্তবয়স্কা বিদ্যার্থিনীরা উপবিষ্ট হইয়া সভার কার্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রথমে সভার অন্যতম সম্পাদক বলবন্ত-রামচন্দ্র সহস্রবুদ্ধি মহারাষ্ট্রীয়-ভাষায় লিখিত গতবর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে সভাপতি মহাশয় উত্তীর্ণ ছাত্রবর্গের পারিতোষিক প্রদান করিলেন। প্রথম বেদের ব্যাখ্যায় উত্তীর্ণ ছাত্রবর্গকে, তাহার পর, শুধু বেদাভ্যাসী বিদ্যার্থীদিগকে পুরস্কার প্রদত্ত হইল। অনন্তর দুইটি ছাত্রের পর, আমি আহূত হইলাম। সভাপতি মহাশয় প্রথম প্রশংসাপত্র, তৎপর, চন্দনচুয়া ও পুষ্পমালার সহিত কাগজের মোড়কে করা পুরস্কারের রৌপ্যমুদ্রাগুলি আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। আমার পর, আরও অনেক ছাত্র পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন। কতকগুলি বিদ্যার্থীকে কেবল প্রশংসাপত্র দেওয়া হইল। পুরস্কার বিতরণ সমাপ্ত হইলে মহাদেবশাস্ত্রী ও ভিক্ষুবরশাস্ত্রী সংস্কৃত-ভাষায় কিয়ৎকাল বক্তৃতা করিলেন। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে সভাপতি শ্রীমন্ত রা০রা০ত্র্যম্বকরাও রামরাও উর্ফ নানাসাহেব পুরন্দরে মহাশয় অতীব ওজস্বিনী মহারাষ্ট্রীয়-ভাষায় কিয়ৎকাল বক্তৃতা করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভাভঙ্গ হইল। আমি যখন বাহিরে আসি, তখন চতুষ্পাঠীর ও কলেজের বহুবিদ্যার্থী আমাকে ঘিরিয়া ধরিলেন। আমি তাঁহাদের প্রশ্নের সংস্কৃতভাষায় উত্তর দিতে দিতে নিম্নে অবতরণ করিলাম। বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে পুণাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত স্থান। ঐ নগরে যত শিক্ষিত লোকের বাস, বোধ হয় বোম্বাই-প্রদেশের আর কোথাও তত নাই। স্থানীয় শিক্ষিত লোকদের অনেকেই সংস্কৃত-ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন। পুণা নগরীতে আসার পর, বাঙ্গালী ছাত্র ভিন্ন অপর কাহারও সহিত সংস্কৃত ব্যতীত অন্য ভাষায় কথোপকথনের প্রয়োজন হয় নাই।

রাজপথে উপস্থিত হইলেই একটী বিবাহের বরযাত্রি-সম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঐ বরপক্ষ অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত যাইতেছেন। ঐ জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিলাম। বর বীরোচিত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে অঙ্গ আবৃত করিয়া একটি সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন। তাহার পর, আত্মীয় মহিলারা নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বরের অনুগমন করিতেছেন। গ্রীষ্মকাল হইলেও প্রত্যেক রমণীর সর্ব্বাঙ্গ লোহিতবর্ণের শালে আবৃত এবং পদযুগল কারুকার্য্য-খচিত পাদুকায় সুশোভিত। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে মহারাষ্ট্রীয় মহিলারা অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করেন না। সুতরাং পুরসুন্দরীদের অনাবৃত কবরীতে সুবর্ণ-চন্দ্রক অথবা পদ্মগুলি অত্যন্ত শোভা বিস্তার করিতেছে। গজেন্দ্রগামিনীদের পশ্চাদ্ভাগে সুবৃহৎ উষ্ণীষধারী পুরুষগণ যাইতেছেন। বরযাত্রি-সম্প্রদায়ে আর একটি কৌতুকাবহ দৃশ্য দেখিলাম। একটি ক্ষুদ্র বালিকা বরের পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বরের কর্ণের নিকট নিয়ত ঘণ্টা বাজাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে একটি বিদ্যার্থী বলিলেন "প্রথমেই নববধূর মধুরস্বর বরের কর্ণে প্রবেশ করিলে যদি গুরুজনের উপর অশ্রদ্ধা জন্মে, তজ্জন্য পূর্ব্বকালে ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অদ্যাপি সেই প্রাচীন পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে।" আমি বলিলাম "নব-বধূর মধুরস্বর যখন বরের কর্ণে প্রবেশ করিবে, তখন বজ্রনিনাদ ও তাহার প্রতিবন্ধক করিতে পারিবে না, ক্ষুদ্র ঘণ্টার বাদ্যের কথা আর কি বলিতেছেন? উহা বর্ব্বরতার পরিচয় মাত্র"। ছাত্রটি হাঁসিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দের দিবসেও বিবাহ হয়, উহা তাঁহারা অবৈধ মনে করেন না। আমি নারায়ণশাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে দিবা বিবাহের স্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও আপনারা কেন দিবসে

বিবাহকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন" ? তিনি বলিলেন "হাঁ শাস্ত্রে নিষেধ আছে সত্য কিন্তু বহুকাল হইতে মহারাষ্ট্রে এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। দেশাচার অনন্ত, যে দেশের পক্ষে যাহা সুবিধাজনক, সে দেশের লোকে তাহাই অবলম্বন করে। অথবা উহার কোন বিশেষ কারণ আছে"।

ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই ব্রাহ্মণজাতি প্রধান। মহারাষ্ট্রে ও ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অল্প নহে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ও বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে দেশস্থ ও কোঙ্কণস্থ—এই দুই শ্রেণীর সংখ্যাই সর্ব্বপেক্ষা অধিক। এক সময়ে দেশস্থ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণই মহারাষ্ট্র-প্রদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ঐ সম্প্রদায়ের "দেশস্থ" এই নামের কারণ কি ? দেশস্থ-ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে ও উহার সদুত্তর পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন "পর্ব্বতনিবাসী ব্রাহ্মণগণ হইতে সমতল ভূমির অধিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে পৃথক্ করিবার জন্য দেশস্থ নামকরণ করা হইয়াছিল" কিন্তু উহাও অনুমান মাত্র। দেশস্থ-ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব নিবাস কোথায় ছিল, কি সূত্রে তাঁহারা মহারাষ্ট্রে আগমন করেন, তাহার কোনই ইতিবৃত্ত নাই। উঁহারা বলেন "কিছুকাল পূর্ব্বে দেশস্থ-ব্রাহ্মণেরা নাসিক নামক স্থানে বাস করিতেন"। কেহ কেহ বলেন "বিদর্ভে বাস করিতেন"। তাহার পর, ক্রমে সমস্ত মহারাষ্ট্র কর্ণাট, মহীশূর, তাঞ্জোর, মদুরা, ত্রিবাঙ্কোর, ইন্দোর, গোয়ালিয়র এবং নাগপুর প্রভৃতি বহুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা অদ্যাপি নিজ মহারাষ্ট্র-প্রদেশে বাস করিতেছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ মরাঠী ভাষায় কথা বলেন। যাঁহারা দূরতর প্রদেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের ভাষা ও আচার ব্যবহারের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। দেশস্থ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীই

অধিক, সামবেদীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সাতারা জেলায় কতকগুলি অথর্ব্ববেদী দেশস্থ-ব্রাহ্মণ আছেন। ঋগ্বেদীরা প্রাতে ও সায়ংকালে আহ্নিক-কৃত্য সমাপন করেন। যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়ীরা মধ্যাহ্নে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া থাকেন। বেলগাঁর দেশস্থ-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আপস্তম্ব নামে এক শাখা আছেন. তাঁহারা ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া অত্যন্ত গৌরবের বিষয় মনে করেন। ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী দেশস্থ-ব্রাহ্মণেরা পরস্পর পান ভোজন করেন বটে কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে আদান প্রদান প্রচলিত নাই। দেশস্থ-ব্রাহ্মণদের কিয়দংশ স্মার্ত্ত, কিয়দংশ বৈষ্ণব। স্মার্ত্তেরা সকলেই শৈব এবং জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য, আর বৈষ্ণবদিগের গুরু মধ্বাচার্য্য। স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের কুলদেবতা ত্র্যম্বকেশ্বর, আম্বাগ্রামের যোগাদ্যা দেবী, তুলজাপুরের ভবানী, কোহ্লাপুরের অম্বাবাই ও ভীমাশঙ্কর। বৈষ্ণবদিগের কুলদেবতা অবণ্ড্যা-গ্রামের নাগনাথ, পণ্ডারপুরের বিঠোবা এবং খাণ্ডোবা-প্রভৃতি। দেশস্থ-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুইটী বিশেষ নিয়ম প্রচলিত আছে। প্রথম নিয়ম এই ;—তাঁহারা পিতৃষসার কন্যা ও ভগিনীর কন্যার বিবাহ করা অবৈধ মনে করেন না। আপন পিস্‌তুত ভগিনী ও ভাগিনেয়ী প্রায়ই দেশস্থ-ব্রাহ্মণগণের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া থাকেন। দ্বিতীয় আচারটী এই ;—দেশস্থ-ব্রাহ্মণেরা আজ্‌রা দেবীর প্রীতির নিমিত্ত অল্পবয়স্কা বিধবাদিগের আহ্বান পূর্ব্বক সিন্দূর হরিদ্রা ও বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া তাঁহাদের পূজা করেন এবং সধবার ন্যায় তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার করেন। মহারাজ শিবাজীর রাজত্বকালে দেশস্থ-ব্রাহ্মণগণের অবস্থা সবিশেষ উন্নত ছিল। মহারাজ শিবাজীর শিক্ষক দাদোজীকোদণ্ডদেব, গুরু রামদাসস্বামী, প্রধানমন্ত্রী পন্থপ্রতিনিধি, পন্থসচিব, পন্থ-অমাত্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ দেশস্থ-ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত ছিলেন। ঐ শ্রেণীতে জ্ঞানদেব, একনাথ, নিবৃত্তিনাথ,

সোপানদেব, রঙ্গনাথস্বামী প্রভৃতি অনেক সাধু মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন ঐ সম্প্রদায়ে আরও অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দেশস্থ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন সামাজিক গোলোযোগ উপস্থিত হইলে তাঁহারা স্বয়ং উহার মীমাংসা করেন না, স্ব স্ব সম্প্রদায়ের গুরু শঙ্করাচার্য্য বা মধ্বাচায্য মঠের পীঠাধীশগণ উহার মীমাংসা করিয়া থাকেন। দেশস্থ-ব্রাহ্মণেরা স্বশ্রেণীস্থ-ব্রাহ্মণের মধ্যে পৌরোহিত্য করেন। যাঁহারা শূদ্রযাজী, তাঁহারা যে কোন হীনশ্রেণীর শূদ্রের বাটীতে পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন কিন্তু কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণের যাজন কার্য্য করেন না। পূর্ব্বে কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণের প্রতি দেশস্থ-ব্রাহ্মণের এই বিদ্বেষ-বুদ্ধি আরও প্রবল ছিল। শিবাজীর রাজ্যকালে দেশস্থ-ব্রাহ্মণের প্রভাব অধিক ছিল, পেশওএর আধিপত্য-সময়ে উহা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এখন দেশস্থ-ব্রাহ্মণের অবস্থা তত উন্নত নহে। উঁহাদের কেহ কেহ আজকাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়া গবর্মেণ্টের চাকুরী করিতেছেন বটে কিন্তু ঐরূপ চাকুরের সংখ্যা অতিঅল্প। অধিকাংশই কারকুনের কার্য্য (রাজস্ব সংগ্রহ) ও ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া দিনপাত করিয়া থাকেন। শোলাপুরের দেশস্থ-ব্রাহ্মণগণ বড়ই অপরিষ্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন।

কহ্লাড়-ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে দেশস্থ-ব্রাহ্মণের একটী শাখা বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহাদের সংস্কৃত নাম "কারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণ" বা "করহাটব্রাহ্মণ"। মহারাষ্ট্রের লোকেরা বলেন "সেতারা নগরের দক্ষিণে কৃষ্ণা ও কোয়েনা নদীর সঙ্গমস্থলে কাহ্লাড় নামক একটী স্থান আছে। কাহ্লাড় শব্দটি কারাষ্ট্র শব্দজ। সেই স্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণেরা কাহ্লাড় নামে আখ্যাত"। মহাভারতে এই কারাষ্ট্র বা করহাটদেশ, দুষ্টদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে কারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণের অতিশয় নিন্দা কীর্ত্তিত হইয়াছে

কিন্তু শ্লোকগুলির রচনাভঙ্গী দেখিলে উহা নিতান্ত আধুনিক ও ঈর্ষ্যা-বশতঃ কোন দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক সহ্যাদ্রিখণ্ড-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। একজন প্রসিদ্ধ লেখক কহ্লাড়-ব্রাহ্মণের শ্রেণীভেদের কারণ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ কুৎসিত জনশ্রুতির মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। কহ্লাড়-ব্রাহ্মণগণও স্মার্ত্ত এবং বৈষ্ণব এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উঁহারা সকলেই ঋগ্বেদী। কহ্লাড় সমাজে কাশ্যপ, উপমন্যু, মৌদ্গল্য, বৈণ্য, কৌশিক, কৌণ্ডিণ্য, গর্গ, গৌতম প্রভৃতি এয়োবিংশ গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কহ্লাড়ব্রাহ্মণের অধিকাংশই দরিদ্র। রাজাপুর শান্তবাড়ী প্রভৃতি স্থানে কহ্লাড়-ব্রাহ্মণেরা শুভদিন ক্ষণ নির্ণয় করেন ও ঠিকুজী কোষ্ঠী লিখিয়া থাকেন। মালবন ও অন্যান্য স্থানে তাঁহারা কুলকর্ণী (১) ও দেশপ্রভুর (২) পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। কোহ্লাপুর-অঞ্চলে কহ্লাড়-ব্রাহ্মণদিগকে কারকুনের কার্য্য করিতে দেখা যায়। বোম্বাই নগরের কহ্লাড়-ব্রাহ্মণগণ পরভু (কায়স্থ) দিগের পুরোহিত। এতদ্ভিন্ন ঐ শ্রেণীতে অনেক পৌরাণিক ও কথক আছেন। শান্তবাড়ী অঞ্চলে কহ্লাড়-ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটী ভীষণ প্রথা বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা আশ্বিন মাসের শুক্লা অষ্টমীতে অথবা ঐ পক্ষের অন্য কোন তিথিতে মাতৃকাদেবীর সন্নিধানে নরবলি প্রদান করিতেন। জামাতাই তাঁহাদের মতে শ্রেষ্ঠ বলি। জামাতার অভাবে সাধারণ ব্রাহ্মণ কিংবা অন্যকোন বর্ণের লোক বলি-প্রদানার্থ গৃহীত হইত। প্রথম বধ্য

(১) যাঁহারা সমস্ত গ্রামের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখেন, তাঁহারা কুলকর্ণীনামে অভিহিত।

(২) যাঁহারা সমস্ত পরগণার হিসাব রাখেন তাঁহাদিগকে দেশপ্রভু বলে।

ব্যক্তির খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে অল্প বিষ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইত। ঐ ব্যক্তি উহা খাইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলে দেবীর সম্মুখে লইয়া সংহার করা হইত। তজ্জন্য আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি প্রাণান্তেও আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে কহ্লাড়-ব্রাহ্মণের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে না। এমন কি অন্য দিনেও তাঁহাদের গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণে ভীত হয়। ঐ প্রথা নাকি কহ্লাড়-ব্রাহ্মণের একটী কুলধর্ম্ম। তাঁহাদের বিশ্বাস, দেবতার সমক্ষে ঐরূপ বলি না দিলে বংশবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। পূর্ব্বে সমস্ত কহ্লাড়-ব্রাহ্মণই শাক্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে উক্ত কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। তজ্জন্য সহ্যাদ্রিখণ্ডেও উহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আইনবলে উক্ত প্রথা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এখন প্রায়ই নরবলির কথা শুনিতে পাওয়া যায় না; উহার পরিবর্ত্তে দেবীর সম্মুখে কাক-বলি প্রদত্ত হয়।

যাহা হউক, কহ্লাড়-ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে নানা কথা প্রচলিত থাকিলেও তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বলা যাইতে পারে, কহ্লাড়-ব্রাহ্মণগণ বেশ উদ্যমশীল ও মুক্তহস্ত। তাঁহারা ক্রিয়া কর্ম্মে বিলক্ষণ ব্যয় করিয়া থাকেন। কহ্লাড় হইতে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। নাগপুর, ঝাঁসী, বাঙ্গালাদেশের দেওঘর এবং বারাণসী প্রভৃতি স্থানেও অল্পাধিক পরিমাণে কহ্লাড়-ব্রাহ্মণের বাস আছে। ঝান্সীর রাণী সুপ্রসিদ্ধা লক্ষ্মীবাই কহ্লাড়-ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূতা ছিলেন। এতদ্ভিন্ন এক সময়ে মহারাষ্ট্রে কতকগুলি খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়া কহ্লাড়-ব্রাহ্মণকুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণশাস্ত্রী তালকর ইংরেজী ও মরাঠী ভাষায় একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন। গোপালশাস্ত্রী বাল্মীকি-প্রণীত সংস্কৃত রামায়ণের মরাঠী ভাষায় অনুবাদ করেন। মোরোপন্থ একজন বিখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ মরাঠী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

বালগঙ্গাধরশাস্ত্রী মরাঠী কাণাড়ী গুজরাটী হিন্দী বাঙ্গালা পার্সী লাটিন্ এবং ইংরেজী ভাষায় একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মরাঠী ভাষায় দিগ্‌দর্শননামক একখানি মাসিকপত্র প্রচার করেন। গোবিন্দ-বিট্ঠল মহাজন ও একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি। তিনি প্রভাকর ও ধূমকেতু নামক দুইখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। রঘুনাথশাস্ত্রী এবং কাশীনাথশাস্ত্রীও কৃতবিদ্য বলিয়া খ্যাত। সিবিল্‌সার্ভেণ্ট শ্রীপদবাবাজী ঠাকুরও অল্পপ্রসিদ্ধ ছিলেন না।

যাঁহাদের জন্য মহারাষ্ট্র-ভূমির এত গৌরব, সেই সুপ্রসিদ্ধ কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণের কথা এ পর্য্যন্ত বলা হয় নাই। এই বার অতিসংক্ষেপে কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণের বিবরণ বিবৃত করিব। রামেশ্বরক্ষেত্র হইতে নর্ম্মদা-সঙ্গম পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী দুর্গম অরণ্যানী এবং শৈলমালা-পরিবেষ্টিত ভূভাগ কোঙ্কণ নামে অভিহিত। এই কোঙ্কণের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণের নাম কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ। কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ "চিৎপাবন" বা "চিৎপাবন-ব্রাহ্মণ" নামে কথিত হইয়া থাকেন। চিৎপাবন-ব্রাহ্মণের স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রায় গৌরাঙ্গ এবং সুদর্শন্। কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণেরা বলেন "পরশুরাম আর্য্যাবর্ত্ত হইতে যে চতুর্দ্দশটি ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া দক্ষিণাপথে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেই চতুর্দ্দশটি ব্রাহ্মণের বংশসম্ভূত। তাঁহারা অনেকের চিত্ত পবিত্র করেন বলিয়া "চিৎপাবন" আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন।" কিন্তু স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে;—যে সময়ে পরশুরাম তীর্থপর্য্যটনের নিমিত্ত দক্ষিণাপথে গমন করেন, সেই সময়ে তিনি একদিন শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞ উপলক্ষে সমস্ত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঋষিরা কেহই আগমন না করায় তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন, "আমি নূতনকর্ত্তা নূতন ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি, ব্রাহ্মণগণ কেন এ ক্ষেত্রে আগমন করিলেন না? যাহা হউক, আমি নূতন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি

করিব।" পরদিন সূর্য্যোদয় কালে যখন তিনি স্নানার্থ সাগরতীরে গমন করেন, তখন কতকগুলি লোককে আসিতে দেখিয়া তাহাদের জাতিও গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং স্বীয় অভিপ্রায়ও তাহাদিগকে বিজ্ঞাপন করিলেন। তাহারা বলিল "প্রভো! আমরা ক্ষুদ্র ধীবর, আমাদের আবার গোত্র কি? আমরা ব্যাধের কার্য্য করিয়া জীবনধারণ করি"। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পরশুরাম উহা শুনিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না।" তৎক্ষণাৎ তাহাদের জালের সূত্র দ্বারা উপবীত করিয়া দিয়া ব্রহ্মণ্য ও সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদত্ব প্রদান করিলেন। ঐ সকল ব্যক্তি চিতাস্থানে পবিত্র হওয়ায় চিৎপাবন আখ্যা প্রাপ্ত হইল। ত্রৈলোক্যাধিপতি পরশুরাম তাহাদিগকে নিজ আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক গোত্র ও আখ্যা প্রদান করিলেন এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোঙ্কণ-প্রদেশে স্থাপন করিলেন। পরশুরামের প্রসাদে তাঁহারা সকলে গৌরবর্ণ সুলোচন এবং সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। পরশুরাম প্রস্থান কালে বলিয়া গেলেন, 'যখন তোমাদের কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইবে, স্মরণ করিও, আমি তৎক্ষণাৎ আগমন করিব।' এক দিন তাঁহারা প্রভুর অনুগ্রহ পরীক্ষার্থ অকারণ তাঁহাকে স্মরণ করিলেন। পরশুরাম তৎক্ষণাৎ আগমন করিলেন কিন্তু কোন কার্য্য দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন "এই সকল ব্রাহ্মণ নিন্দনীয় ও দরিদ্র হইবে, আর রাজসেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং কোঙ্কণজ ব্রাহ্মণ সর্ব্বকার্য্যে পরিত্যাজ্য (১)।

উল্লিখিত পৌরাণিক আখ্যায়িকা ব্যতীত কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণসংক্রান্ত একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, 'পরশুরাম কতকগুলি মৃত মনুষ্যকে সমুদ্র-জলে ভাসিতে দেখিয়া তাহাদিগকে জীবন দানপূর্ব্বক

(১) (স্কন্দপুরাণ সহ্যাদ্রিখণ্ড পাঠ করুন।)

গলায় উপবীত দিয়া সমুদ্র-তীরে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহারাই কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ।' কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণসংক্রান্ত দ্বিতীয় কিম্বদন্তী এই যে, 'তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তরী ভগ্ন হওয়ায় সমুদ্রস্রোতে ভাসিয়া কোঙ্কণে আসিয়া পড়েন, এই দুই জনপ্রবাদে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক কেহ কেহ অনুমান করেন যে,"কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষেরা পারস্য হইতে পলায়িত অগ্নিপূজক প্রাচীন আর্য্য-সন্তান। নতুবা ভগ্ন তরীর কথা কি জন্য প্রচলিত হইবে?" আমাদের বিবেচনায় পূর্ব্বোক্ত সহ্যাদ্রি-খণ্ডের উপাখ্যান সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ পরশুরাম যেই ইচ্ছা করিলেন; আর তৎক্ষণাৎ কতকগুলি ধীবর ব্রাহ্মণ হইয়া গেল, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। তবে পারস্য হইতে আগত প্রাচীন আর্য্যগণের বংশধর বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। যে হেতু পূর্ব্বে কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণগণের সকলেই গৌরবর্ণ ছিলেন। এখনও তাঁহাদের মধ্যে শ্যামবর্ণ লোক অতি অল্পই দেখা যায়। কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কোঙ্কণের অধিকাংশস্থল দুর্গম অরণ্যানী ও কঠিন শৈলমালায় পরিব্যাপ্ত। তজ্জন্য শস্যাদি ভালরূপ জন্মিত না এবং বাণিজ্যেরও তেমন সুবিধা ছিল না। রাজা কিংবা ধনী লোকের অভাবে ঐ দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে অতিদীনভাবে জীবন যাপন করিতে হইত। যাঁহারা উত্তরকোঙ্কণ ছাড়িয়া মহারাষ্ট্রের পূর্ব্বাংশে আগমন করিতেন তাঁহারাও বিদ্যা ব্রহ্মণ্যের অভাবে ভিক্ষাবৃত্তি জলবাহকের কার্য্য রাস্তায় হোটেল খুলিয়া শ্রমজীবীদিগের নিকট অন্নবিক্রয়-প্রভৃতি দ্বারা কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেন। ঐ সময় হইতেই দেশস্থ-ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় উঁহাদিগকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর, মুসলমান-সাম্রাজ্যকালে যমন কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণেরা অত্যাচারী শাসনকর্ত্তাদের উপদ্রবে প্রপীড়িত হইয়া দলে দলে

মহারাষ্ট্রের পূর্ব্বাংশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন ক্ষমতাপন্ন দেশস্থ-ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষভাব আরও প্রবল হইয়া উঠে। সেই সময়েই বোধ হয়, কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে নানাবিধ গ্লানিপূর্ণ বচন রচনা করিয়া স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডমধ্যে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। বাজীরাও পেশওয়া এক সময়ে স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ড দগ্ধ করিবার জন্য অনুমতি করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে অনেক পুস্তক ভস্মীভূত হইয়াছিল। এখনও প্রতিবৎসর কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণেরা সভা করিয়া উক্ত পুস্তক দগ্ধ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সহ্যাদ্রিখণ্ডে চিৎপাবন-ব্রাহ্মণ-সংক্রান্ত যেরূপ গ্লানিপূর্ণ বচন আছে, উহা পাঠ করিয়া চিৎপাবন-বিদ্বেষীদের চরিত্রের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা জন্মে। ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রে কখনও সম্প্রদায়-বিশেষের ঐরূপ গ্লানিকর কথা থাকা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। উহা খলস্বভাব ব্যক্তিগণের বিদ্বেষ-বুদ্ধির নিদর্শন মাত্র। চিৎপাবন-ব্রাহ্মণকুলে যে সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এখনও এমন অনেক পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে স্কন্দপুরাণের ন্যায় শত শত পুরাণ অবলীলাক্রমে রচনা করিতে পারেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মহারাজ শিবাজীর সময়ে দেশস্থ-ব্রাহ্মণেরাই আধিপত্য করিতেন। মহারাজ সাহুর অধিকারকালে কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণগণের উন্নতির সূত্রপাত হয়। উক্ত নরপতির পেশওয়া (প্রধান মন্ত্রী) বালাজী বিশ্বনাথভট্টের আবির্ভাবে যথার্থই কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণকুল ধন্য হইয়াছে। তিনিই উক্ত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের উন্নতির একমাত্র হেতু। একদা বিশ্বনাথভট্ট কয়েক জন দেশস্থ কর্ম্মচারীকে কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতে আদেশ করেন। তাঁহারা উক্ত আদেশ গ্রাহ্য করেন না। অগত্যা তিনি একজন কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ দ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লন এবং মহারাজ সাহুর আদেশ

গ্রহণপূর্ব্বক কোঙ্কণ হইতে দুই শত ব্রাহ্মণ-বালক আনাইয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাহারা যেমন শিক্ষিত হইতে লাগিল, পেশওয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের উচ্চ উচ্চ পদ দিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে দিন দিন কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইতে লাগিল। যত দিন পেশওয়াদের রাজত্ব ছিল, তত দিন ঐ শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণেরা মনের আনন্দে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রভুত্ব করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এদিকে কার্য্যক্ষেত্রের অভাবে শক্তি পরিচালনার উপযুক্ত অবসর না পাইয়া দেশস্থ-ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম দেখিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্যের সমুদয় রাজকর্ম্মচারীর পদই কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক অধিকৃত। ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভে যখন ইংরেজগবর্মেণ্ট পুণায় একটা পাঠশালা স্থাপন করেন। তখনও উত্তরকোঙ্কণ হইতে অনেক কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণসন্তান পুণায় আগমন করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং শিক্ষাশেষে ভাল ভাল রাজকর্ম্মচারীর পদ অধিকার করেন। যাহা হউক, এখন কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বের ন্যায় শক্তি না থাকিলেও তাঁহাদের অবস্থা অনুন্নত নহে। তাঁহারা বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ মেধাবী দূরদর্শী চতুর স্বার্থপর এবং আত্মাভিমানী। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন, মহারাষ্ট্রে এরূপ সম্প্রদায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণগণের কেহ কেহ ঋগ্বেদের শাকল-শাখাভুক্ত, কেহ কেহ বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদী। তাঁহাদের মধ্যে অত্রি, কপি, কাশ্যপ, কৌণ্ডিন্য, জামদগ্ন্য, গর্গ, কৌশিক, বিষ্ণুবৃদ্ধ, বাভ্রব্য বশিষ্ঠ ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্র আছে। কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণের উপাধি—অভ্যঙ্কর, জ্যোষী, পটবর্দ্ধন, রাণাডে, গদ্রে, ডুগলে, মোদক প্রভৃতি। ভাষা কোঙ্কণী ও মরাঠী। আচার ব্যবহার দেশস্থ-ব্রাহ্মণ হইতে অনেকটা বিভিন্ন। কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণদিগের

মধ্যে অধিকাংশই স্মার্ত্ত, মধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবও আছেন কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। কোনরূপ সামাজিক গোলোযোগ কিংবা ধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে কোঙ্কণস্থব্রাহ্মণেরা প্রথম বারাণসী নাসিক ও অন্যান্য ধর্ম্মক্ষেত্রের মত আনয়ন করেন। শেষে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের মঠে উহা প্রেরণ করা হয়। মঠাধীশ শঙ্করাচার্য্যের মীমাংসাই শেষ মীমাংসা বলিয়া পরিগৃহীত হয়। কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণেরা স্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকেই পৌরহিত্যে নিযুক্ত করেন। পুরোহিত, কেবল শান্তি স্বস্ত্যয়ন এবং পূজাদি করিয়াই অব্যাহতি পান না. তাঁহাকে প্রায়ই যজমান-গৃহিণীর ফরমাজ খাটিতে হয়। ঘটকালী করিতে হয়, সময়ে সময়ে বাজার সরকারের কাজও করিতে হয়। ইহা ছাড়া পুরোহিতের কিছু বেদান্ত জানা আবশ্যক, কারণ সময়ে সময়ে যজমানদিগকে শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে কিছু কিছু উপদেশ দিতে হয়।

কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তৎক্ষণাৎ জাতকর্ম্ম পুণ্যাহবাচন মাতৃকা-পূজা নান্দীশ্রাদ্ধ ও শান্তি পাঠ করা হয়। পঞ্চম দিবসে বন্ধু বান্ধব ও ভিক্ষুকদিগের ভোজন ব্যাপার। ষষ্ঠ দিবসে প্রসূতি স্নান করিয়া শুদ্ধ হন। দ্বাদশ দিবসে শিশুর কর্ণবেধ হয়। পুত্র হইলে চতুর্থ মাসে সূর্য্যাবলোকন ও ষষ্ঠ অষ্টম্ দশম ও দ্বাদশ মাসে অন্নাশন হইয়া থাকে। জন্মতিথি উপলক্ষে প্রজাপতি গণেশ মার্কণ্ডেয় ব্যাসদেব কুলদেবতা জন্মনক্ষত্র-দেবতা ষষ্ঠী প্রহ্লাদ বলী পরশুরাম বিভীষণ হনূমান্ অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যের পূজা করিতে হয়। প্রথম হইতে পঞ্চম বর্ষের মধ্যে চূড়াকরণ ও সপ্তম হইতে দশম বর্ষের মধ্যে যজ্ঞোপবীত প্রদত্ত হয়। উপনয়নের দিন হইতে দ্বাদশ দিনের মধ্যে সমাবর্ত্তন হইয়া থাকে। কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণেরা কন্যার ছয় বর্ষ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে ও পুত্রের দশ বৎসর হইতে বিশ বৎসরের

মধ্যে বিবাহ দেন। বিবাহ-কালে বর, যৌতুক ব্যতীত অনেক উপহার প্রাপ্ত হন। কন্যাও উপহারে বঞ্চিত হন না। কন্যা-সম্প্রদানের জন্য কয়েক দিন পূর্ব্বে বিবাহমণ্ডপ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বিবাহের পর, বর যখন শ্বশুর বাড়ীর গ্রাম পার হন, তখন সীমান্ত-পূজা করিতে হয়। বর কন্যার এক গ্রামে বাস হইলে বিবাহের পূর্ব্বাহে বা পরাহে গ্রামস্থ মন্দিরে বা বরের গৃহে সীমান্ত পূজা হয়। বরের গৃহে সীমান্ত-পূজাকালে কন্যাপক্ষীয় কোন সধবা প্রবীণা রমণী, একটী চুবড়িতে নারিকেল চাউল ঘোল দধি দুগ্ধ মধু গুড় চিনি হলুদ সিন্দূর পুষ্প চন্দন এবং একটি থলিয়াতে পান সুপারি জড়াইয়া দুখানি উত্তরীয়, দুইটী পাগড়ি, ফুলের ছড়া প্রভৃতি দ্রব্য একখানি চৌকির উপর বনাত চাপা দিয়া রাখিয়া উহার উপরে কতকগুলি তামার পয়সা ছড়াইয়া রাখেন। পরে, পুরোহিতের হস্তে ঐ চৌকি খানি দিয়া পূর্ব্বোক্ত সধবা রমণী উক্ত পুরোহিত ও কন্যাপক্ষীয় পুরুষ এবং রমণীদের সহ বরের বাটীতে যান। সেই সময়ে বরের বাটীতে বাজনা বাজিতে থাকে। বরকর্ত্তা বহির্ব্বাটীতে পুরুষদিগকে ও বরের মাতা, কন্যার জননীপ্রভৃতিকে সাদরসম্ভাষণ-পূর্ব্বক অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া বসান। তাহার পর, কন্যার পুরোহিতকর্ত্তৃক আনীত সেই উচ্চ চৌকীর পার্শ্বে দুই খানি ছোট চৌকি রাখিয়া তাহার উপর বনাত পাতিয়া দেন। বর, সেই উচ্চ চৌকীর উপর ও কন্যার পিতা মাতা উভয় পার্শ্বস্থ ছোট চৌকীর উপর উপবেশন করেন। কন্যার পিতা, প্রথম গণনাথের পূজা করিয়া কুলপুরোহিতকে একটী পাগড়ী প্রদান করেন। তাহার পর, বরের পূজা। কন্যার মাতা অগ্রে গরম জল দিয়া বরের দক্ষিণ পদ ধৌত করেন। কন্যার পিতা, বরের পা মুছাইয়া তাহার কপালে চন্দন ও মস্তকে ধান্য প্রদান করেন। পরে তিনি বরকে নূতন একটী পাগড়ী ও উত্তরীয় পরিতে দেন। বর নিজের

পাগড়ী রাখিয়া সেই পাগড়ীটি পরেন এবং উত্তরীয় খানি স্কন্ধে স্থাপন করেন। সেই সময় বরের ভগিনী, পশ্চাৎ হইতে বরের পাগড়ীতে একগাছি ফুলের মালা জড়াইয়া দেয়। কন্যার পিতা বরকে পঞ্চামৃত খাইতে দেন, চতুর্দ্দিক্ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও ধান্যবৃষ্টি হইতে থাকে। কুলপুরোহিত তখন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন। তাহার পর, কন্যার মাতা বরের ভগিনীর পা ধুইয়া দেন। অন্তঃপুরে গিয়া তিনি পুনরায় বরের মাতা ও অপরাপর মহিলাগণের পা ধোয়াইয়া তাঁহাদের কোঁচড়ের কাপড়ে নারিকেল চাউল ও চিনি প্রদান করেন। অন্তঃপুরে যখন ঐ সকল ক্রিয়াসম্পন্ন হয়, সেই সময়ে বাহিরে কন্যার আত্মীয়েরা অভ্যাগতদিগের কপালে চন্দনের টিপ ও পানসুপারি নারিকেল দিয়া অভ্যর্থনা করেন। তাহার পর, কন্যা পক্ষীয় সকলে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যায়। সেই দিন সায়ংকালে কন্যার পিতা ভিন্ন অন্যান্য আত্মীয়গণ নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য লইয়া বরের বাটীতে যায়। প্রথমে বর, সমবয়স্ক বালকগণের সহিত সেই সকল খাদ্য ভোজন করেন। তাহার পর, বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় কুটুম্বগণ আহারাদি করেন। এদিকে কন্যা, পীতবসন পরিধানপূর্ব্বক হরগৌরীর সম্মুখে এক খানি ছোট চৌকীতে বসিয়া এইরূপ প্রার্থনা করে ঃ—

"গৌরি গৌরি সৌভাগ্য দে,
দারি যেতিল ত্যাল্ আয়ুষ্ দে"।

ইহার মর্ম্ম এই ;—"হে গৌরি হে গৌরি ! আমার সৌভাগ্য দাও, যে আমার দ্বারে এসেছে, তাহার দীর্ঘ আয়ু দাও।" তাহার পর, কন্যার পিতা পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া বর আহ্বান করিতে যান। পুরোহিত বরের ও তাহার পুরোহিতের হস্তে একটি একটি নারিকেল দিয়া কন্যার বাড়ীতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। সন্ধ্যা কালে যাত্রার সময় বর প্রথম শ্বশুর-প্রদত্ত নূতন পাগড়ী ও উত্তরীয় পরিধান করে,

তাহার ভগিনী সেই সময় একছড়া ফুলের মালা ঐ পাগড়ীতে জড়াইয়া দেয়। ঐ সময় পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করেন। বর, প্রথম ইষ্টদেব তৎপরে গুরুজনদিগকে নমস্কার করিয়া বাহিরে আসিয়া অশ্বে আরোহণ করে। তখন তোপ ধ্বনি ও বাজনা বাজিতে থাকে। বরের সঙ্গে তাহার মাতা ভগিনী ও অন্যান্য রমণী এবং আত্মীয় কুটুম্বগণ গমন করেন। পথে অনিষ্ট নিবারণের জন্য নারিকেল বিতরণ করা হয়। বর, কন্যার বাটীতে পৌঁছিলে তাহার মস্তকে অন্ন স্পর্শ করাইয়া উহা দূরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কন্যাপক্ষীয় কোন সধবা এক গাড়ু জল আনিয়া বরের ঘোঁড়ার পায়ে ঢালিয়া দেন। বর, অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে সধবা মহিলারা সম্মুখে আলো ধরিয়া বরণ করেন। তাহার পর, কন্যার ভ্রাতা বরের ডা'ন কান মলিয়া দেয়, সেই জন্য সে একটী পাগড়ী উপহার পায়। সেই সময় কন্যাকর্ত্তা, বরকে বিবাহমণ্ডপে আনিয়া যথারীতি মধুপর্ক প্রদান করেন। পুরোহিত ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া শুভকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের অনুমতি গ্রহণ করেন। একজন সধবা রমণী আসিয়া পুরোহিত বর কন্যা ও কন্যার পিতা মাতার কপালে চন্দন লেপন করে। ঐ সময় কৌলিক বিধি অনুসারে সম্প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইলে লগ্নকঙ্কণ সভাপূজন গৃহপ্রবেশ এবং বিবাহ-হোমের পর সপ্তপদী গমন হইয়া থাকে। স্ত্রী-আচার ও বর কন্যার আহারের পর কড়িখেলা হয়। ঐ সময় বরকে কন্যার পায়ে ধরিতে ও পরস্পর চুম্বন করিতে বলা হয়। তখন বরপক্ষীয়গণ কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া বাটীতে চলিয়া যায়। কন্যাপক্ষীয় রমণীগণ চাঙ্গারি ভরিয়া মিষ্টান্ন ও বরের শ্বশুর এবং শ্যালক একটী ঘোঁড়া সাজাইয়া লইয়া গিয়া তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া ফিরাইয়া আনেন। তখন বরপক্ষীয় রমণীগণ ঠাণ্ডা হইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে বরকে লইয়া কন্যার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। ভোজের পর,

বাহিরে পুরুষগণের মধ্যে ও অন্তঃপুরে রমণীমণ্ডলীর মধ্যে নানাপ্রকার হাঁসি তামাসা হয়। উহার নাম "উথান"। ঐ সময় বর ও কন্যা-পক্ষীয়েরা মরাঠী ভাষায় ছড়া কাটাকাটি করে। বরপক্ষীয়গণ অলঙ্কার দ্বারা নববধূর মুখ দেখেন। তাহার পর, কন্যার মাতা বরের মাতাকে ও অন্যান্য রমণীদিগকে যত্নপূর্ব্বক ডাকিয়া আনিয়া বাটীর পশ্চাতে কলা তলায় লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া দেন। সেখানে ছোট ছোট ঘণ্টা ঝোলান থাকে। স্নানের সময় দড়ি ধরিয়া টানিলে সেই সকল ঘণ্টা বাজিতে থাকে। বিবাহের দিন হইতে পাঁচদিন পর্য্যন্ত এই রূপ নানাবিধ আমোদ আহ্লাদে কাটিয়া যায়। পঞ্চমদিনে বর বিদায়। সুসজ্জিত বর, ঘোড়ায় চড়িয়া নবপরিণীতা পত্নীকে সম্মুখে বসাইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলে পুরনারীগণ বরণ করিয়া গৃহে লইয়া যায়। ঐ সময়ে কয়েকটি কৌলিক আচারের পর, বর পত্নীকে বলে "আমার ভাগিনী আমার কন্যাটীকে চায়।" তখন বধূ প্রতিজ্ঞা করে "আমাদের সাতপুত্রের পরও কন্যা হইলে ননদের পুত্রের সহিত বিবাহ দিব।" তাহার পর, বধূর নূতন নাম হয়। যেমন বরের নাম "শঙ্কর" হইলে বধূর নাম "পার্ব্বতী" কিংবা বরের নাম "নারায়ণ" হইলে বধূর নাম "লক্ষ্মী" রাখা হয়। বর, চুপে চুপে পত্নীর নূতন নামটী তাহাকে শুনাইয়া দেয়। উঁহাদের সমাজে কন্যাবিক্রয় নিষিদ্ধ নহে। অনেকে ধনলোভে অশীতিবৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধের হস্তে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা কন্যা অর্পণ করে। কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে যথারীতি গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন ও সাধভক্ষণ প্রভৃতি সংস্কার হইয়া থাকে। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে উঁহারা তুলসীপত্রের উপর শয়ন করাইয়া মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বেদ ও ভগবদ্গীতা শুনাইয়া থাকেন। উঁহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি অনেকটা বিভিন্ন প্রকারে সম্পাদিত হয়।

কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণকুলে এত পরাক্রান্ত রাজনৈতিক ও বিদ্বান্ লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের সংখ্যা করা যায় না। বালাজী-বিশ্বনাথভট্ট, বাজীরাওপেশওএ, বালাজীবাজীরাও, নানাফরনবীশ নানাসাহেব প্রভৃতি সকলেই কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত। মহারাজ সিন্ধিয়ার প্রধানমন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ সার্ রাজা দিনকররাও, রাওবাহাদুর কেবোলক্ষণছাত্রে, অধ্যাপক দাজীনীলকণ্ঠনগরকর, মহাদেবগোবিন্দশাস্ত্রী কলট্‌কার, রাওসাহেব বিশ্বনাথনারায়ণমাণ্ডলিক, রাওবাহাদুর গোপালরাওহরিদেশমুখ, বামনআবাজিমোড়ক, মহাদেবসুরেশ্বর কুণ্টে, অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা কাশীনিবাসী বেদমূর্ত্তি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বালশাস্ত্রী, বেনারস-কলেজের জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী, বোম্বাই-হাইকোর্টের জজ্ সুপ্রসিদ্ধমহাদেবগোবিন্দ-রাণাডে, বিখ্যাত কেশরীপত্রের সম্পাদক বালগঙ্গাধরতিলক, ভারত-গভর্মেণ্টের মন্ত্রিসভার সদস্য মিঃ গোখ্‌লে-প্রভৃতি মনীষিগণ সকলেই কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণসমাজ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ঐ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ে সকল শ্রেণীর লোকই দেখা যায়। মহামহোপাধ্যায় বেদজ্ঞ পণ্ডিত হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রব্যবসায়ী পর্য্যন্ত যাহা চাও তাহাই পাইবে। জজ্, উকীল, ব্যারিষ্টার্, দেশীয় রাজাদেরমন্ত্রী, দেশমুখ, কারকুন, কৃষক, হোটেলওয়ালা, শূদ্রের পাচক, জলবাহক প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। বহুসংখ্যক কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ কেবল ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা দিনপাত করেন।

কোঙ্কণপ্রদেশে দেবরুখে নামক একটী স্থান আছে। সেখানকার অধিবাসী ব্রাহ্মণেরা দেবরুখে নামে আখ্যাত। কথিত আছে;—এক সময় দেবরুখের অধিবাসী ব্রাহ্মণেরা অন্য গ্রামের ক্ষমতাপন্ন কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ-রমণীদের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা সমাজচ্যুত হইয়া ভিন্ন শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন। বোধ

হয় দেখরুখে ব্রাহ্মণেরা কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ হইতেই বহিষ্কৃত, তজ্জন্য উঁহাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণগণের অনুগামী দেখিতে পাওয়া যায়। দেবরুখে-ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই ভিক্ষাজীবী। কেহ কেহ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এ সম্প্রদায়ে কোন বিদ্বান্ কিংবা ধনী লোকের নাম শুনা যায় না।

মহারাষ্ট্রে শেনুই নামে আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। তাঁহারা আপনাদিগকে বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। কথিত আছে; তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে মহারাষ্ট্রে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। শেনুই-ব্রাহ্মণেরা মৎস্য মাংস ভোজন করেন বলিয়া দেশস্থ ও কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশাগত ব্রাহ্মণদিগকে মৎস্য ভোজন করিতে দেখিয়া ইঁহারা শেনুই (শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ) বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহারা সেই ঘৃণাব্যঞ্জক শেনুই শব্দে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। শেনুই-ব্রাহ্মণের সহিত মহারাষ্ট্রের অন্যান্য ব্রাহ্মণের ভোজ্যান্নতা নাই। শেনুই-ব্রাহ্মণের মধ্যে আঠারটি গোত্র প্রচলিত যথা;—বাৎস্য, মৌদ্গল্য, কৌণ্ডিন্য, কৌশিক, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, আঙ্গিরস, নৈধ্রুব, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, শাণ্ডিল্য, ধনঞ্জয় শাংখ্য, শাংখ্যায়ন, গর্গ, জামদগ্ন্য, অত্রি, কৌৎস, সিদ্ধি, গৌতম। পূর্ব্বে তাঁহাদের নাকি চারি বেদেরই চর্চ্চা ছিল, এখন সকলেই ঋগ্বেদী। শেনুই-ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালার উত্তরপ্রদেশস্থ জাহ্নবীতীর হইতে গমন কালে হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি লইয়া গিয়াছিলেন, তিনিই শেনুই-ব্রাহ্মণের কুলদেবতা। ঐ দেবমূর্ত্তি মঙ্গেশ বা মগেশ নামে প্রসিদ্ধ। গোমন্তকের সন্নিহিত কব্‌ড়ে নামক স্থানে শেনুইদিগের গুরুকুলের একটী মঠ আছে। উহার নাম কৈবল্য-মঠ। কথিত আছে;—পুরাকালে গৌড়পাদাচার্য্য কর্ত্তৃক নাকি উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে শেনুই-ব্রাহ্মণেরা সকলেই

শাক্ত ছিলেন, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হন। নবদ্বীপের চৈতন্যমহাপ্রভুই নাকি মহারাষ্ট্রে ধর্ম্মপ্রচারকালে তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শেনুই-ব্রাহ্মণগণের অনেকে শাস্ত্রালোচনায় কাল যাপন করেন। কেহ কেহ বা কারকুণ (কেরাণী) পহোজী (শিক্ষক) প্রভৃতির কার্য্যও করেন। কুলকর্ণী এবং দেশপাণ্ডের কার্য্যেও অনেককে ব্রতী দেখা যায়। পূর্ব্বে শেনুই-ব্রাহ্মণদের কেহ কেহ দেশীয় রাজার মন্ত্রিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন শেনুই-ব্রাহ্মণদের কাহারও জায়গীর আছে। কেহ কেহ শুধু ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রের অন্যান্য ব্রাহ্মণের তুলনায় শেনুই-ব্রাহ্মণের মধ্যে ভিক্ষুকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তাঁহারা প্রাণান্তেও কন্যা-বিক্রয় করেন না। সামর্থ্য অনুসারে কথক পৌরাণিক বিদ্যার্থী পণ্ডিত ও ভিক্ষুকের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। পরোপকার শেনুই-ব্রাহ্মণের জীবনের একটী ব্রত। এমন কি অনেক সময় তাঁহারা ঋণ করিয়াও দান করেন। শেনুই-ব্রাহ্মণেরা যেমন স্বয়ং পরোপকারী, অন্যকর্তৃক উপকৃত হইয়াও তদ্রূপ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট, সুতরাং বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন না। এত গুণ সত্ত্বেও শেনুই-ব্রাহ্মণেরা দোষের হস্ত হইতে একেবারে মুক্ত নহেন। প্রধান দোষ, তাঁহারা স্বভাব-নিন্দুক। অনেক সময় পরস্পর পরস্পরের কুৎসা লইয়া সময় অতিবাহিত করেন। যাহা হউক মহারাষ্ট্রে এই মুষ্টিমেয় শেনুই-ব্রাহ্মণের অবস্থা মন্দ নহে। তাঁহাদের মধ্যেও বিদ্বান্ এবং খ্যাতনামা লোকের অভাব নাই। বেলগাঁএর লক্ষ্মণভট্ট উপাধ্যায়, কর্ণাটকের বেদমূর্ত্তি নারায়ণভট্ট এবং পণ্ডিত লক্ষ্মণভট্ট প্রভৃতি বিদ্যা ব্রহ্মণ্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি কাশীনাথত্র্যম্বকতেলাঙ ও সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চেন্‌সেলার্ ডাক্তার গোপাল-

কৃষ্ণভাণ্ডারকর ও শেনুই-ব্রাহ্মণকুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন। শেষোক্ত মহাত্মা পুণা-ডেকান্‌কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে অবস্থান কালে দক্ষিণাপথের যে সুবিস্তৃত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন, উহা য়ুরোপীয় ও দেশীয় ঐতিহাসিকগণের উপজীব্য গ্রন্থরূপে পরিণত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রের সারস্বত-ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই প্রবাদ আছে যে, "পুরাকালে জমদগ্নির পুত্র ভগবান্ পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়া সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। যে সকল স্থান প্রদত্ত হয়, উহাতে বাস করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া তিনি সহ্যাদ্রির পশ্চিমভাগে উপস্থিত হন। ঐ প্রদেশের নাম "কোঙ্কণ"। উহা পরশুরাম-ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। কিছুকাল পরে তিনি একটী বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ঐ মহাযজ্ঞ গোমন্তকের (গোয়ার) সন্নিহিত হারমল নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যজ্ঞাবসানে পরশুরাম নিমন্ত্রিত সারস্বত-ব্রাহ্মণদিগকে বাসোপযোগি স্থান প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মণই অনার্য্যসঙ্কুল সুদূর দক্ষিণাঞ্চলে বাস করিতে সম্মত হইলেন না। যে আটজন বাস করিতে স্বীকার করিলেন, পরশুরাম তাঁহাদিগকে আটখানি গ্রাম দান করেন। সারস্বত-ব্রাহ্মণগণ সপরিবারে নিমন্ত্রণে আসেন নাই, সুতরাং গৃহিণীবিহীন হইয়া কি প্রকারে বাস করিবেন বলিয়া চিন্তিত হইলেন। শেষে নায়ার-জাতীয় দ্রাবিড়ী ললনাদিগকে গৃহলক্ষ্মী করিয়া গৃহিণীর অভাব পূর্ণ করিতে হইল। দ্রাবিড়ী মহিলার গর্ভে সারস্বত-ব্রাহ্মণদিগের অনেক সন্তান উৎপন্ন হইল, তাঁহারা যজ্ঞভূমির চতুর্দ্দিকে বসতি করিলেন সারস্বত-ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ বহুকাল গোমন্তকে পরমসুখে কালাতিপাত করেন। তাহার পর, ১৪৩২ শকে পর্ত্তুগিজ্‌জাতি গোমন্তক (গোয়া) প্রদেশ আক্রমণ করে এবং কিছু কাল যুদ্ধের পর তাহারা উক্ত প্রদেশ অধিকার করে। তাহাদের আচার ব্যবহার ও বেশভূষা দেখিয়া

ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত ভীত হইলেন। এদিকে পর্ত্তুগিজ্‌গণ ব্রাহ্মণদিগকে নিজধর্ম্মে আনয়নের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ঐ উপলক্ষে নানাপ্রকার অত্যাচার হইতে লাগিল। সারস্বত-ব্রাহ্মণগণ পর্ত্তুগিজ্‌-গণের কৃত পীড়ন সহিতে না পারিয়া চারিদিকে পলায়ন করিলেন। ব্রাহ্মণগণের পলায়নে দেশ শ্রীভ্রষ্ট হইল। তখন পর্ত্তুগিজেরা ঘোষণা করিল, তাহারা আর কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবে না এবং প্রজারা যাহাতে সুখে থাকে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবে। ঐ ঘোষণা বাক্য শ্রুত হইয়া যে সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত নিকটে ছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। যাঁহারা দূরে গিয়াছিলেন তাঁহারা আর ফিরিলেন না।" গোমন্তকে (গোয়ায়) প্রধান আবাস হইলেও এখন সারস্বত-ব্রাহ্মণগণ নানাপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। বোম্বাই রত্নগিরি মালবন শান্তবাড়ী উত্তরকাণারা দক্ষিণকাণাড়া মালাবার বেলগাঁও ধারোয়ার হায়দরাবাদ ইন্দোর বড়োদা-প্রভৃতি স্থানে অল্প বিস্তর সারস্বত-ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই-প্রদেশে সারস্বত-ব্রাহ্মণের সংখ্যা লক্ষাধিক। ঐ শ্রেণীতে শাস্ত্রজ্ঞ চাকুরে ভিক্ষাজীবী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই বিদ্যমান।

মহারাষ্ট্রে 'কিরোঅন্ত' নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়, তাঁহারা সারস্বত-ব্রাহ্মণের শাখা। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের পৌরোহিত্য করিতেন না। যাঁহারা প্রথম ঐরূপ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা 'কিরোঅন্ত' আখ্যা প্রাপ্ত হন। 'কিরোঅন্ত' শব্দ 'ক্রিয়াবন্ত' শব্দের অপভ্রংশ। ঐ সকল ব্রাহ্মণের অধিকাংশই অতি দীনভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অনেকে শূদ্রের যাজনক্রিয়াও কেহ কেহ দিনক্ষণ নির্ণয় এবং ঠিকুজী কোষ্ঠী লিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। পূর্ব্বে তাঁহারা মহারাষ্ট্রের অন্যান্য ব্রাহ্মণের নিকট ঘৃণার পাত্র ছিলেন কিন্তু এখন সে ভাব অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে। বর্ত্তমান

সময়ে কোঙ্কণস্থ ও কহ্লাড়-ব্রাহ্মণ-বালক-সকল কিরোঅস্ত-ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাবের সঞ্চার হইতেছে। ঐ শ্রেণীতে বিখ্যাত লোক অতি অল্পই আছেন।

মহারাষ্ট্রে কনোজিয়া শাকলদ্বীপী মারোয়ারী ত্রৈলঙ্গী গুজরাটী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ পরদেশী ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ। গোবর্দ্ধন ত্রিগুল বিদুর প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ পৌনর্ভব-ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত। আভীর জাঘল-প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ হীনশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। মহারাষ্ট্রে উল্লিখিত ব্রাহ্মণগণের উচ্চ নীচ কোন শ্রেণীই ব্রাহ্মণেতর জাতির বাটীতে আহার করেন না কিন্তু বঙ্গদেশে যেমন কয়েকটি বর্ণের যাজনের নিমিত্ত কয়েকশ্রেণীর বর্ণযাজী ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়, মহারাষ্ট্রে তাহা নাই। ওদেশে যাঁহারা শূদ্রযাজী তাঁহারা উচ্চ নীচ সকল প্রকার শূদ্রেরই যাজন কার্য্য সম্পাদন করেন, দক্ষিণা গ্রহণ করেন। কিন্তু যজমানদের গৃহে ভোজন করেন না। মহারাষ্ট্রে সামাজিক ভোজন ব্যতীত অন্য-সময়ে ব্রাহ্মণ হইতে অতিনিম্নবর্ণ-পর্য্যন্ত ছত্রিশ জাতি একগৃহে ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে আহার করিতে পারেন কিন্তু সামাজিক ভোজনে উহার অন্যথা দৃষ্ট হয়। দক্ষিণাপথে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে আচার বিষয়ে বহু পার্থক্য লক্ষিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিলক্ষণ শুদ্ধাচার। পণ্ডিতেরা রজক দ্বারা বস্ত্র ধৌত করান না, প্রত্যহ স্বয়ং কাচিয়া লয়েন। তৈল ও মৎস্য মাংস ব্যবহার করেন না এবং অধিকাংশ শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিত সন্ধ্যা বন্দনা বেদপাঠ নিত্যহোমে দিবসের অনেকাংশ অতিবাহিত করেন। তাঁহারা নিরীহ এবং যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট।

মহারাষ্ট্রের স্থানে স্থানে চোহানও রাঠোর-বংশসম্ভূত রাজপুত দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। মরাঠারাই এখন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্থান অধিকার করিতে উদ্যত কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়

ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ঐ সকল বর্ণের গৃহে বেদোক্ত প্রণালীতে মন্ত্র পড়াইতে সম্পূর্ণ সম্মত হন নাই। অনেক স্থলে তাঁহারা পুরাণোক্ত পদ্ধতি অনুসারে মরাঠাদের বৈধক্রিয়া সম্পাদন করেন। ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর বংশধর কোহ্লাপুরের মহারাজ, নাগপুরের ভোস্লেগণ, বড়োদার গায়কবাড় প্রভৃতি রাজন্যবর্গ মরাঠা-জাতিসম্ভূত। মহারাষ্ট্রেও কায়স্থ জাতির অবস্থা বিলক্ষণ উন্নত। শিক্ষায় কায়স্থগণ মরাঠাদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। মহারাষ্ট্রে কায়স্থগণ পরভু নামে আখ্যাত। পরভুরা কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত। মহারাজ শিবাজীর সময় হইতে পরভুরা রাজনৈতিক বিভাগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখনও অনেক শিক্ষিত পরভুকে দেশীয় রাজ্যেও ইংরেজ-রাজ্যের প্রায় সকল বিভাগেই উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়! মহারাষ্ট্রে নবশাক ও অন্যান্য বর্ণের অবস্থাও মন্দ নহে।

১১ই জ্যৈষ্ঠ আহারান্তে ছাত্রবন্ধুদের নিকট বিদায় লইয়া পূর্ব্বাহ্ন এগারটার সময় ষ্টেসন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গিয়া দেখি, বেদশাস্ত্রোত্তেজকসভায় যাঁহাদের সহিত পরীক্ষা দিয়াছিলাম, তাঁহাদের অনেকেই গাড়ীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমাকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহারা আহ্লাদ সহকারে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইলেন। গাড়ী আসিলে সকলে প্রফুল্লচিত্তে আরোহণ করিলাম। চন্দ্রবাবুর উপদেশ অনুসারে গন্তব্য পথের নির্ম্মাণকৌশল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনের নিমিত্ত গবাক্ষ-সন্নিধানে উৎসুকচিত্তে বসিয়া রহিলাম। নগরের অনতিদূরবর্ত্তী কতিপয় কর্ষিত ভূখণ্ড অতিক্রম করিলেই বম্বের গবর্ণরের প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার পর, কোন শৈলমালার অধিত্যকায় একটি মন্দির দেখা গেল। সঙ্গী বিদ্যার্থিগণ বলিলেন "ঐ মন্দিরে মহারাজ শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত চতুঃশৃঙ্গী দেবী বিরাজমান আছেন"। কিয়দ্দূরে গিয়া লোনাবলী ষ্টেসন পাওয়া

গেল। স্থানটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। ষ্টেসনের উভয়পার্শ্বে পর্ব্বত গাত্রে কতিপয় সুন্দর বাঙ্গলো ও মনোহর পুষ্পোদ্যান বিরাজিত হইয়া ঐ স্থানের দৃশ্যকে অত্যন্ত নয়ন-প্রীতিকর করিয়া রাখিয়াছে। অনুমান অপরাহ্ণ দুইটার সময় গাড়ী খাণ্ডাবারা ষ্টেসনে উপনীত হইল। উক্ত স্থান হইতে পলাশদড়ী ষ্টেশন পর্য্যন্ত সহ্যপর্ব্বতের গাত্র দিয়া অদ্ভুত প্রণালীতে রেলপথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে বাষ্পশকট কখন শৈলশ্রেণীর অধিত্যকায় কখনও বা উপত্যকা-প্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিছু দূরে অগ্রসর হইলে শকটমালার অগ্রে ও পশ্চাতে ইঞ্জিন্ জুড়িয়া দেওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে ক্ষণকাল মধ্যে উহা পর্ব্বতের চূড়ায় গিয়া উপনীত হইল। তখন শকট হইতে শৈলনিতম্ববাহিনী স্রোতস্বতীকে একগাছি সূক্ষ্মসূত্রের ন্যায় ও উপত্যকাস্থ পথিকগণকে ক্ষুদ্র পিপীলিকাসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। আবার শকটমালার গতি পরিবর্ত্তিত হইল, এবার নামিতে নামিতে যেন রসাতলে নীত হইতে লাগিলাম। ঐরূপ চড়াই উৎরাইতে অনেক সময় অতীত হইল। ঐ পথের মধ্যে চব্বিশটি বিভিন্ন স্থানে পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া রন্ধ্রপথ (tunnel) নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। কোথায় রন্ধ্রস্থিত রেলপথ চতুর্থাংশ মাইল, কোন স্থানে বা মাইলের অষ্টমাংশ-ব্যাপী, উহার ন্যূন প্রায় নাই। উক্ত সমুদয় রন্ধ্রপথই চারিটি তারবিশিষ্ট (dauble line) সুতরাং যুগপৎ বিভিন্নদিগ্‌গামী শকট-নিচয়ের গমনাগমনের কোনই প্রতিবন্ধক ঘটে না। যাইতে যাইতে বাষ্পশকট একটি তিমিরাচ্ছন্ন পর্ব্বততলখোদিত পথে (Tunnel) প্রবেশ করিল। ঠিক ঐ সময়ে বিপরীতদিক্ হইতে একখানি ধাবমান বাষ্পশকট ভীষণ শব্দে আমাদের দিকে আসিতে ছিল। যখন উভয় শকট পাশাপাশি চলিতে লাগিল, তখন অন্ধকারে কিছুই নয়নগোচর হইল না, কেবল গভীর গর্জ্জন শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে

আতঙ্কের সঞ্চার করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে ঐ ভীমরব আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। কিছু দূর গেলেই পর্ব্বতমালার পার্শ্বে বহুদূরব্যাপী একটি হ্রদের তীরদেশে শুভ্র শুভ্র অট্টালিকা ও উদ্যানপরিশোভিত প্রসিদ্ধ কল্যাণনগর নয়নপথে উপস্থিত হইল। ঐ সময় নারায়ণনদের বক্ষে অনেক নৌকা ও দুই চারিখানি সুন্দর বাষ্পপোত শোভা পাইতেছিল। কল্যাণজংসন অতিক্রম করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেই টানা-সহর, উহা টানা জেলার প্রধান নগরী। টানা সহরে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোর্ট আছে। ঐ স্থানের লবণক্ষেত্র একটি রমণীয় দৃশ্যের মধ্যে গণ্য। দূর হইতে শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবণহ্রদ দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ন পাঁচটার সময় বোম্বাই-নগরে উপনীত হইলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে সাতটার মধ্যে প্রাতঃকৃত্য স্নান সন্ধ্যা শেষ করিলাম। বম্বে নগরীর প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে রেল-ষ্টেসন। বাসার নিকটস্থ ষ্টেসন হইতে তিন পয়সার টিকিট ক্রয় করিয়া পূর্ব্বাহ্ন আটটার সময় মহালক্ষ্মী ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। ষ্টেসন হইতে মহালক্ষ্মীর মন্দির প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। রঙ্গিল বসন ও নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিতা বহুসংখ্যক রমণী দুই একটি পুরুষের সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রান্তর মধ্যদিয়া মন্দির অভিমুখে যাইতেছিলেন। আমরাও তাঁহাদের সঙ্গী হইলাম। মহার্ণবের উর্ম্মিমালা-বিচুম্বিত মহালক্ষ্মীর মন্দিরের মধ্যভাগ ও সোপান-সকল মর্ম্মর-পাষাণে নির্ম্মিত এবং উহার গাত্রস্থ কারুকার্য্য ও বিলক্ষণ দৃষ্টিরম্য। মন্দিরের মধ্যভাগে চতুর্ভুজা মহালক্ষ্মী উপবিষ্টা। চতুর্দ্দিকে অন্যান্য কতিপয় দেব দেবীর

মূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের মধ্যে ও বারান্দায় কয়েকটি ব্রাহ্মণ চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। বারাণ্ডার উভয় পার্শ্বে কতকগুলি গৌরাঙ্গী ব্রাহ্মণ-মহিলা কৃতাঞ্জলিপুটে মহালক্ষ্মীর স্তোত্র-পাঠে নিরত আছেন। সঙ্গী দুইটি মহারাষ্ট্রীয়-ব্রাহ্মণ ও আমি যথাশক্তি পূজা স্তব প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদি শেষ করিলাম। মহালক্ষ্মীর সেবক এক ব্রাহ্মণকে ঐ দেবীর ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন "মহালক্ষ্মী অতিপুরাকালের দেবী। বম্বে-নগরীর সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে এই দেবী বম্বেনগরীতে বিরাজিত আছেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্দির অধিক পুরাতন নহে। কিছুকাল পূর্ব্বে এই মন্দির বম্বের কোন ধনী বণিকের অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছে।" শঙ্করবিজয় পাঠে অবগত হওয়া যায়, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যখন অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন, তখন দক্ষিণাপথে মহালক্ষ্মীর উপাসক এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ছিল। বোধহয় বম্বের পুরাতন দেবী মহালক্ষ্মী ঐ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত।

শৈশবেই মনোমধ্যে সমুদ্র-দর্শনের স্পৃহা জন্মে, এপর্য্যন্ত উহা পূর্ণ হয় নাই। কালিদাসের কবিতা পাঠ করিয়া সমুদ্রের যে ছবি মনোমধ্যে অঙ্কিত হইয়াছিল। কাল্‌কাদেবী রোডের সমীপবর্ত্তী সমুদ্রে তাহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাই নাই। মহালক্ষ্মীতে আসিয়া সমুদ্র-দর্শনের বাসনা পূর্ণ হইল। মহার্ণবের প্রকৃত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। মহালক্ষ্মীর মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে উর্ম্মি-প্রহত শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া উভয়দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই উপলখণ্ডব্যাপ্ত বেলাভূমি যেন একটি কৃষ্ণবর্ণ রেখার ন্যায়, প্রতীয়মান হইল (১)। বামভাগে, তাল ও খর্জ্জুর-বন-বিশোভিত শৈলশ্রেণী ও

(১) "দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা" ॥

দক্ষিণে নারিকেল-তরুরাজি-বিরাজিত উপকূল, সম্মুখে ফেনিল অনন্তনীলাম্বুরাশির উত্তালতরঙ্গমালার উদ্দাম নৃত্য। যত দূর দৃষ্টি যায়, কেবল অনন্তজলরাশি। এক এক বার সেই বিক্ষুব্ধ মহার্ণবের বীচিমালা যখন গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন মনে হইল বুঝি বা এইবার সমস্ত বম্বেদ্বীপ অর্ণবসাৎ হইবে কিন্তু প্রকৃতির কার্য্য কেমন সীমাবদ্ধ! ঐ সকল তরঙ্গমালা ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া আমাদের পাদলগ্ন পাষাণ-খণ্ডে প্রহত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। দূর হইতে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযানসকল ক্ষুদ্রকায় পারাবতসমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কোথাও শিশুমার শিরোরন্ধ্র দ্বারা জল উৎক্ষিপ্ত করিয়া সলিলে বিলীন হইতেছে। কোথাও বা নক্রমকরাদি জলচরগণ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় তরঙ্গের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অনেকক্ষণ অর্ণবতীরে বসিয়া সমুদ্রের শোভা নিরীক্ষণ করিলাম। এক একবার মনে হইতে লাগিল দৃষ্টি স্থির করিয়া মহার্ণবের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দেখিয়া লই কিন্তু যেই নয়ন প্রসারিত করি, অমনি চক্রবালরেখা (Horizon) সম্মুখে আসিয়া দৃষ্টির বিষয় আচ্ছন্ন করিয়া দিতে লাগিল। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন;—দেশ-ভ্রমণে চাতুর্য্য-শিক্ষা হয় (১)। কিন্তু শুধু চাতুর্য্য শিক্ষা নহে, অনন্তশোভাময়ী প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দও অনুভব করা যায়।

(১) দেশাটনং পণ্ডিত-মিত্রতা চ,
ধূর্ত্তাঙ্গনা-রাজ-সভাপ্রবেশো।
অনেকশাস্ত্রাণি বিলোকিতানি,
চাতুর্য্য-মূলানি ভবন্তি পঞ্চ॥

আমরা কেবল সমুদ্রতীর হইতে উঠিয়াছি, এমন সময় এক অশীতিপর বৃদ্ধ সমুদ্র জলে অবগাহন করিয়া উত্থিত হইলেন। পরিধেয় কৌপীন। দেহ গৌর এবং ঈষৎ স্থূল। মুণ্ডিত মস্তকে অঙ্কুরিত শুভ্র কেশগুলি প্রস্ফুটিত কদম্ব-কুসুমের আকার ধারণ করিয়াছে। তিনি যখন কমণ্ডলু হস্তে কবিয়া প্রসন্ন-বদনে যাইতেছিলেন, তখন সকলেই তাঁহাকে পরমহংসজী বলিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। আমিও প্রণিপাত করিলাম এবং অন্যান্য কথার পর, একান্ত শিষ্টাচারবিরুদ্ধ হইলেও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সংস্কৃতভাষায় পরমহংসের জন্মভূমি ও নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। যোগিবর হাঁসিতে হাঁসিতে সংস্কৃতে বলিলেন "যে, নাম রূপ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার আর সে বিষয়ে প্রশ্ন কেন ? আমাকে একটী বিশেষণ-বিহীন পদার্থ বলিয়া জান।" মহালক্ষ্মীর মন্দিরের পশ্চাৎভাগদিয়া রাজপথ। পথি-পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড পতিত আছে। সঙ্গী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণটির সহিত আমি উহার এক শিলাখণ্ডে উপবেশন করিব মনে করিতেছি, এমন সময়ে একটি প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা দুই তিনটি নারিকেল হস্তে সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তাঁহার স্বর্ণোজ্জ্বলবর্ণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন-সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হইল, তিনি কোন রাজবংশের কন্যা অথবা বধূ হইবেন। তাঁহার পশ্চাতে মস্তকে কেশ ভার, লম্বমান-শ্মশ্রু, ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, যজ্ঞসূত্র গলে, কাষ্ঠপাদুকা পায়ে এক শ্যামতনু দীর্ঘকায় পুরুষ সেখানে আগমন করিলেন। ঐ বৃদ্ধই রমণীর স্বামী। তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় অবগত হওয়া গেল না। কথা-প্রসঙ্গে এইমাত্র জানিলাম—বৃদ্ধ পঞ্জাবী ক্ষত্রিয়, গৃহিণী সহ প্রায় তিনমাস হইল তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। দ্বারকা ও সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শন হইয়াছে। সংপ্রতি পঞ্চবটী অবন্তী ও ওঙ্কারেশ্বর দর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। বৃদ্ধ, দুইটি ভৃত্য সহ সমুদ্রে

অবতরণ করিলেন। গৃহিণী আমাদের সন্নিহিত এক পাষাণখণ্ডে উপবেশন পূর্ব্বক নারিকেল ভাঙ্গিয়া মিষ্টান্ন সহ আমাদের হস্তে প্রদান করিলেন। আমরা বিস্মিত হইলাম। জলযোগের প্রকৃত অবসর অথবা উপযুক্তস্থান না হইলেও উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। তাঁহার "ভাইয়া" সম্বোধনটি—বড়ই মধুর বোধ হইল। ঐ রমণীও স্বয়ং আমাদের সঙ্গে নারিকেল ও মিষ্টান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে সঙ্গিনী পরিচারিকা আমাদের নিমিত্ত উত্তম পানীয় জল আনয়ন করিলেন। পঞ্জাববাসিনী ভদ্রমহিলা অনেক ক্ষণ পূর্ব্বোক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের ও আমার সহিত হিন্দীভাষায় ধর্ম্মকথার আলোচনা করিলেন। তাঁহার বিমল প্রকৃতি, প্রসন্ন বদন ও মৃদুমধুর বাক্য বিশেষ প্রীতিদায়ক। আমরা তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সদয় ব্যবহারে অত্যন্ত মোহিত হইলাম। এই শ্রেণীর ধর্ম্মপরায়ণা মহিলারাই নারী-কুলের গৌরব। ইঁহারা স্বকীয় পবিত্র ব্যবহার দ্বারা পৃথিবীতে স্বর্গীয় আদর্শ প্রদর্শন করেন। আমরা গাত্রোত্থান করিলাম। ঐ রমণী কিছুদুর আমাদের সহিত আসিয়া অভিবাদনান্তে সঙ্গিনীও পরিচারিকা সহ একটি বড় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বাসায় আসিতে প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল। আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় দুইটার সময় নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। রৌদ্রের প্রখরতা তখনও পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। রাজপথের উভয়পার্শ্বে নানাদ্রব্যে সজ্জিত মনোহর বিপণি-সকল দেখিতে দেখিতে ভিক্টোরিয়া উদ্যানের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। ঐ উদ্যানের মধ্যে একটি কৌতুকাগার (Museum) আছে। প্রথমেই প্রাসাদমধ্যস্থ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মর্ম্মর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বড়োদার ভূতপূর্ব্ব নৃপতি খণ্ডেরাও গায়কবাড়ের প্রযত্নে ও অর্থে ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; নির্ম্মাণব্যয় ১৮০০০০ টাকা। কলিকাতার চিত্রশালিকায়

(মিউজিয়মে) যে সকল মৃতজন্তু ও সামুদ্রিকপ্রাণীর কঙ্কাল দৃষ্ট হয়, এখানেও সে সমুদায় বিদ্যমান আছে। বিশেষত্বের মধ্যে এখানকার তিমিমৎস্যের কঙ্কাল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ঐ কৌতুকাগারের এক দিকে নানাবিধ মৃন্ময় ও ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য সুসজ্জিত আছে। অপর পার্শ্বে নীল-পীত-লোহিত-প্রভৃতি নানাবর্ণের উপলখণ্ড শোভা পাইতেছে। দেশীয়শিল্পিগণের নির্ম্মিত বালক বালিকার প্রতিকৃতিগুলি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। ছবিগুলি যেন জীবন্ত হাস্য করিতেছে। হস্তী বৃষ মূষিক-প্রভৃতি জন্তুর মূর্ত্তিগুলিও বিশেষ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। উদ্যানের পূর্ব্বাংশে প্রাণিবাটিকা। ঐ বিভাগে বানর-ব্যাঘ্র-ভল্লুক সর্প-প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ স্বভাবসিদ্ধ বলবিক্রম বিসর্জ্জন দিয়া উদ্যানরক্ষীদের প্রাসাদাকাঙ্ক্ষায় দিন যাপন করিতেছে। শকুন্তনিকেতনে নানা বর্ণের বিহগকুল অশ্রুতপূর্ব্ব স্বর শুনাইয়া দর্শকগণের কৌতূহল উৎপাদনে ব্যগ্র। বানরের অপূর্ব্ব চাতুর্য্য সন্দর্শনপূর্ব্বক পুষ্পোদ্যান ঘুরিয়া অতি শ্রান্ত-দেহে একটি উৎসের (ফোয়ারার) নিকট উপস্থিত হইলাম। বহুসংখ্যক নরনারী উহার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া দারুণ নিদাঘে শৈত্যসুখ অনুভব করিতেছে। কিছুক্ষণ ঐ স্থানে বিশ্রাম করিয়া উদ্যান হইতে বাহির হইলাম। বম্বের "প্রাণিরক্ষালয় (পিঁজরাপোল) একটি পবিত্র স্থান। রুগ্ন জরাগ্রস্ত এবং আততায়ীদিগের করাল কবল হইতে নির্মুক্ত প্রাণিগণের রক্ষার নিমিত্ত জীবদুঃখকাতর জৈনও হিন্দুগণ বহুযত্নে এই প্রাণি-রক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পিজরাপোলে সত্ত্বগুণকে মূর্ত্তিমান্ প্রত্যক্ষ করা যায়। যাঁহারা দয়াগুণের প্রেরণায় এই মহৎ কার্য্যে অর্থদান করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। ঐ সকল দেবোপম মহাত্মার শ্রমার্জ্জিত অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইতেছে।

অপরাহ্ণ চারিটার সময় সঙ্গী সহ বালুকেশ্বর পর্ব্বতের উপরিভাগে ভ্রমণার্থ চলিলাম। প্রফুল্ল-গোলাপকুসুমের ন্যায় পারসীক বালক

বালিকাগণ হাস্যমুখে আমাদের আগে আগে সোপান-পথে উপরে উঠিতে লাগিল। তাহাদের অভিভাবকবর্গ ঐ সকল শিশুর উৎসাহ দিতে দিতে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অর্ণবতীরস্থ পর্ব্বতের উপরিভাগে ইংরেজগণের বাঙ্গলোগুলি অত্যন্ত মনোহর। ঐ পর্ব্বতের শীর্ষদেশে বম্বের গবর্ণরের উদ্যানমধ্যস্থ মনোজ্ঞ প্রাসাদ অবস্থিত। বালুকেশ্বর পর্ব্বতে এত উদ্যান ও রাজপথ যে, ভ্রমণ করিতে করিতে দিশেহারা হইয়া যাইতে হয়। বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণদিগ্গামী প্রশস্ত রাজপথের বামপার্শ্বস্থ এক উপবনে প্রবেশ করিলাম। ঐ বিজন কাননে গ্রীষ্মকালজাত নানাবিধ কুসুম বিকসিত হইয়া সৌরভে বন আমোদিত করিয়াছে। স্থানে স্থানে নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে দুই একটি নর নারীর অনতিপরিস্ফুট আলাপ শ্রুত হইতে লাগিল। আমরা শিষ্টতার অনুরোধে ঐ অংশ ত্যাগ করিয়া কোন প্রস্রবণ-সন্নিহিত শিলাখণ্ডে গিয়া উপবেশন করিলাম। স্থানটি বিজন ছায়াময় ও শীতল। সমীপস্থ তরুশাখায় কোকিল কুহুরব করিতেছে। সঙ্গী বন্ধুটি বলিলেন "কোকিল এই বনের নিত্য-সহচর। সকল ঋতুতেই এখানে ঐ বনপ্রিয় বিহঙ্গের সুমিষ্ট সংগীত শুনিতে পাওয়া যায়"। প্রকৃত কথা বম্বে-দ্বীপ নাতিশীতোষ্ণ সুতরাং বসন্তের চিরলীলাস্থল। যেখানে বসন্ত সেখানেই বসন্তসহচর পিক মধুর গান করিবে উহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর উৎস হইতে সুশীতল পানীয় পান করিয়া প্রস্রবণটি কিরূপভাবে পর্ব্বতগাত্র দিয়া বহিতেছে উহা দেখিতে দেখিতে উত্তরাভিমুখে চলিলাম। পর্ব্বতের একদেশে প্রাচীন পর্ত্তুগিজ্ দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। উহার উপরে নানাজাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া উক্ত ঐতিহাসিক দুর্গকে শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। শৈলোপরিস্থ তুলসীহ্রদও একটি মনোরম দৃশ্য। আমরা ঐস্থানে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিলাম! বালুকেশ্বর পর্ব্বতে যে, ইংরেজপল্লী ব্যতীত অন্য

জাতীয় লোকের বাস নাই, তাহা নহে। ধনী পারসীক ও হিন্দুগণের মনোজ্ঞ বৃক্ষবাটিকা এবং নয়নপ্রীতিকর প্রাসাদমালাও যথেষ্ট রহিয়াছে। এখানকার দৃশ্যসমূহের মধ্যে পারসীকগণের দোখ্‌মা অথবা প্রেত ভবন (Towers of silence) একটী নির্ব্বেদজনক স্থান। প্রাচীর-বেষ্টিত প্রায় এক মাইল ভূমিতে পাঁচটী কূপ আছে। প্রত্যেক কূপের চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান। ঐ কূপগুলি দেড়তলা উচ্চ বৃত্তাকার প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। উহার উপরে কোনরূপ ছাদ নাই। কূপের চতুর্দ্দিকে প্রাচীরের মধ্যে তিনটি লোক শয়ন করিতে পারে এরূপ স্থান তিন ভাগে বিভক্ত করা আছে। দোখ্‌মার বাহিরে পারসীকগণের উপাসনালয় ও অগ্নিমন্দির বিদ্যমান। মৃতের আত্মীয়গণ বাহকের সাহায্যে মৃতদেহ ঐ উপাসনালয়ে লইয়া গিয়া শেষ উপাসনা পরিসমাপ্ত করেন। তাহার পর, বাহকেরা উহা দোখ্‌মার মধ্যে লইয়া গিয়া তিন ভাগে বিভক্ত স্থানের প্রথম বিভাগে পুরুষের, দ্বিতীয় বিভাগে রমণীর ও তৃতীয় বিভাগে শিশুর দেহ বিবসন করিয়া রাখিয়া আসে। তাহারা দ্বাররুদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিবার পূর্ব্বেই প্রাচীরের উপরিস্থিত গৃধ্র-শকুনি-প্রভৃতি পিশিতাশী বিহঙ্গগণ দ্রুতবেগে আপতিত হইয়া দুই এক ঘণ্টার মধ্যে উহা কঙ্কালাবশেষ করিয়া ফেলে। বাহক ব্যতীত মৃতের আত্মীয় কিংবা অন্য কোন দর্শকের দোখ্‌মায় প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। উপাসনালয়ের কর্ম্মচারিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসুকে বুঝাইয়া দেন। পারসীকেরা বলেন "মৃতদেহ' সমাহিত করিলে ভূমি দূষিত হয়, দগ্ধ করিলে ভূতল কলুষিত হয় না বটে কিন্তু উহাতে কাহারও কোন উপকার হয় না। ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিলে একশ্রেণীর জীবের আহারের সংস্থান করিয়া দেওয়া হয়।" 'আমরা দূর হইতে দোখ্‌মা সন্দর্শন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তাহার পর, বেড়াইতে

বেড়াইতে একটি রাজপথ অবলম্বনপূর্ব্বক নীচে নামিতে নামিতে সমুদ্র-সলিলের সন্নিহিত একটি হস্তিশুণ্ডাকার স্থানে উপনীত হইলাম। ঐ স্থানে দর্শকগণের বিশ্রামের নিমিত্ত কয়েকখানি লৌহাসন সংস্থাপিত রহিয়াছে। আমরা সেখানে বসিয়া মহার্ণবের নীলজলে তরঙ্গমালার মোহন নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তীরস্থ কাননের প্রতিবিম্ব সাগর-জলে পতিত হওয়ায় বড়ই মনোরম শোভা হইয়াছে। উহা দেখিয়া শিশুপালবধের তৃতীয় সর্গের বর্ণনা মনে পড়িল (১)। শিশুপালবধ মহাকাব্যের রচয়িতা মাঘ কবি গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন। সুতরাং সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই প্রকার কোন স্থানের দৃশ্য দেখিয়াই বোধ হয়, তাঁহার মনে ঐরূপ কল্পনার আবির্ভাব হইয়াছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঐ স্থান হইতে উঠিলাম। পর্ব্বত হইতে অবতরণ কালেও আবার সেই পারসীকসঙ্গীদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এক একটি পারসীক ললনা যেন এক একটী দেবকন্যা। সঙ্গী বন্ধু বলিলেন "পূর্ব্বে পারসীরা প্রায়ই সমুদ্রতীরে বাস করিতেন। পল্লীবাসী অশিক্ষিত লোকেরা তাঁহাদের সহিত বড় পরিচিত ছিল না, সুতরাং অপরাহ্ণে পারসীকসীমন্তিনীগণের সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া স্বর্গ হইতে অবতীর্ণা অপ্সরা মনে করিত। বহুদিন তাহাদের ঐরূপ সংস্কার ছিল। শেষে কার্য্যক্ষেত্রে পারসীকগণকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের ঐ সংস্কার দূরীভূত হয়। আমরা যখন সমুদ্রতীরে উপনীত হইলাম, তখন সূর্য্য প্রায় অস্তগমনোন্মুখ, একে একে নক্ষত্রগুলি আকাশের গায়ে

(১) "পারে জলং নীরনিধেরপশ্যন্
মুরারিরানীলপলাশরাশীঃ।
বনাবলিরুৎকলিকা-সহস্র-
প্রতিক্ষণোৎকূলিতশৈবলাভাঃ।"

ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আমরা উপলখণ্ডে বসিয়া সায়ং-সন্ধ্যা শেষ করিলাম। সমস্ত দিনের ভ্রমণে শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল, সুতরাং অধিকক্ষণ সমুদ্রতীরে বিলম্ব না করিয়া বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।



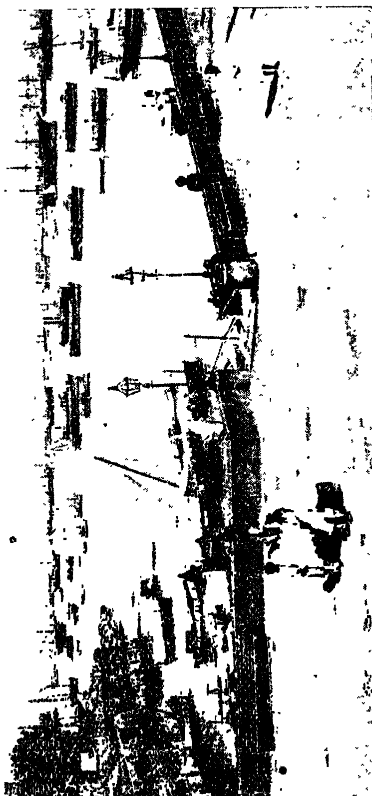
বাম্বাই-নগরীস্থ ক্রফোর্ড মার্কেট্ এবং দেশীয় মহাজন-পল্লী।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক দেশীয় বণিকগণের অত্যুচ্চপ্রাসাদমালা দেখিতে দেখিতে ক্রফোর্ডমার্কেটে (মিউনি-

সিপালিটীর বাজারে) উপস্থিত হইলাম। বম্বের কৃত্রিম দৃশ্যের মধ্যে উহাও একটি নয়নাভিরাম স্থান। ত্রিতল পঞ্চতল সপ্ততল সৌধরাজি শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত। প্রশস্ত রাজপথ, অসংখ্য বিপণি, অশ্বশকটের ঘর্ঘর শব্দ, নানাজাতীয় মানুষের ভিড়। বাজারের দক্ষিণাংশের পণ্যশালাগুলি নানাবিধ পুষ্পস্তবক ও বহুপ্রকার সুপক্ক ফলে সুসজ্জিত। ক্রফোর্ডমার্কেটের সমুদয় বস্তুই বম্বেনগরীর মহাসমৃদ্ধির পরিচায়ক। ঐ স্থান হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে নগরীর ঘনবসতি অতিক্রম করিয়া প্রথমেই এলফিন্‌ষ্টোন্-চক্রে (Elffinston Square) উপনীত হইলাম। হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাদলমণ্ডিত চক্রাকার ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে পাষাণময়ী প্রাসাদমালা উন্নতশিরে বিদ্যমান। ঐ স্থানেই প্রসিদ্ধ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন-কলেজ্ ও অন্যান্য বিদ্যালয় অবস্থিত।

তাহার পর, ক্রমে সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজপথ অবলম্বনপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে যাইতে যাইতে অনেকক্ষণের পর এপোলোবন্দর পাওয়া গেল। বন্দরটি বিলক্ষণ দৃষ্টিরম্য। সমুদ্রের ঘাট পাষাণময়। উহার সিঁড়ীগুলি সুবৃহৎ-প্রস্তর-খণ্ডে দৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত। তটের উপরিভাগে দর্শকগণের জন্য প্রস্তরাসন ও কাষ্ঠাসন রহিয়াছে। উহার এক খানিতে গিয়া বসিলাম। য়ুরোপযাত্রীরা ঐ স্থান হইতে অর্ণবযানে আরোহণ করেন। তজ্জন্য প্রত্যেক কোম্পানির একটি করিয়া অফিষ ও টিকিট বিক্রয়ের স্থান রহিয়াছে। রাজপথের উভয়পার্শ্বে নানাজাতীয় পান্থনিবাস (Hotel) বিজ্ঞাপন বক্ষে করিয়া বিদ্যমান। দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেবল সাগরবক্ষে তাল-খর্জ্জুর-গুবাক ও নারিকেল-তরুরাজি-শোভিত অসংখ্য দ্বীপশ্রেণী নয়নগোচর হয়। উহারই একটিতে হস্তিগুহা (Elephant Cave) বিরাজিত। পর্ব্বতগাত্রে প্রকাণ্ড হস্তিমূর্ত্তি খোদিত আছে বলিয়া উহার নামান্তর "হস্তিগিরি। উক্ত শৈলের নিতম্ব-দেশে গহ্বর-মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অর্দ্ধনারীশ্বর,

হরপার্ব্বতী, শিবের বিবাহ, গণেশজননী, রাবণের কৈলাস উত্তোলন, দক্ষযজ্ঞনাশ, মহাদেবের তপস্যাপ্রভৃতি অনেক পৌরাণিক মূর্ত্তি ও



বোম্বাইনগর সমুদ্রতীরে এপোলো-বন্দর

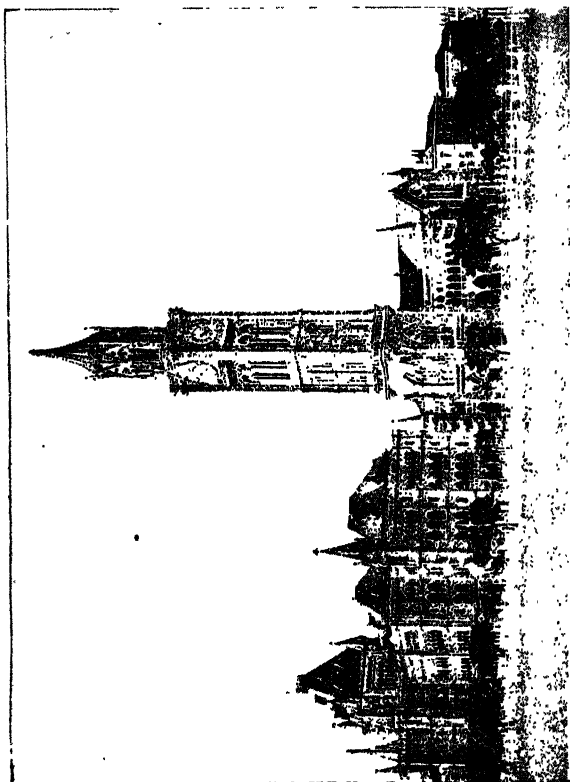
বৌদ্ধ দেব দেবীর ছবি আছে। উহার শিল্পকার্য্য নাকি অত্যন্ত মনোহর। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন, প্রায় সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ঐ সকল মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু অর্ণব-মধ্যস্থ বিজন গিরিগুহায় কোন্ রাজার অধিকার-কালে কাহার

প্রযত্নে ঐ সকল দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত তাহা নির্ণীত হয় নাই। সময়াভাবে হস্তি-গুহায় যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। বাল্মীকি-রামায়ণে পাঠ করিয়াছি—মহার্ণব দেবরাজের ভয়ে ভীত হিমালয়ের পুত্র মৈনাকপর্ব্বতকেই স্বীয় অঙ্কে আশ্রয় দিয়াছিলেন কিন্তু বম্বের এপোলোবন্দরে আসিলে দেখা যায়, মৈনাকের ন্যায় সহস্র সহস্র শৈল প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে জলধি-বক্ষঃ আশ্রয় করিয়া দিন যাপন করিতেছে। অনেক সময় বারিধি-গর্ভস্থ ঐ সকল শৈলমালায় আহত হইয়া শত শত অর্ণবযান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য অর্ণবপোতের কর্ণধারগণের পথপ্রদর্শনের নিমিত্ত এপোলোবন্দর হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর সমুদ্র-বক্ষে আলোকস্তম্ভ (Light post) প্রোথিত হইয়াছে। ঐ স্তম্ভসমূহ নীলাম্বুধির অঙ্কে হীরক-মালার ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ সূর্য্যাতপ তীক্ষ্ণ হইতে লাগিল। আমি সেখান হইতে উঠিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে পূর্ব্বাভিমুখে চলিলাম। কিছুক্ষণ পরেই গবর্মেণ্ট-ডক্‌ইয়ার্ডে (Dockyard) গিয়া পৌঁছিলাম। অসংখ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ণবযান দরিদ্র ভারতবর্ষের শস্যরাশি অপহরণের নিমিত্ত মুখব্যাদান করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। অপর দিকে শত শত অর্ণবতরী দেশান্তরের বিলাস-দ্রব্য সহ আসিয়া পৌঁছিতেছে। বম্বের ডক্‌ইয়ার্ডে বাণিজ্য-ব্যাপারে মানুষের সজীবতা লক্ষ্য করিয়া পুলকিত হইতে হয়। ঐ প্রকার উদ্যমের প্রবর্ত্তক বৈদেশিকগণ। তাঁহাদেরই কার্য্যকলাপের, যৎকিঞ্চিৎ অনুকরণ করিয়া ভারতবাসীও বাণিজ্য-ব্যাপারে প্রভূত বিত্ত সঞ্চয় করিতেছে। বাঙ্গালাদেশের ন্যায় দক্ষিণাপথে মধ্যসত্ত্বাধিকারী জমিদার নাই। বাণিজ্যবৃত্তিই ঐ দেশের লোকের সৌভাগ্যের একমাত্র প্রসূতি।

বম্বের অন্যতম প্রধান দৃশ্য রাজাবাইস্তম্ভ (Rajaby Clock

tower)। সাধারণতঃ লোকে উহাকে "রাজাবাই-টাওয়ার্" বলিয়া থাকে। অনুমতিপত্র (Pass) ব্যতীত ঐ টাওয়ারে আরোহণ



বোম্বাই-নগরীস্থ রাজাবাইস্তম্ভ ও অন্যান্য কার্য্যালয়।

করিতে দেওয়া হয় না। আমি রাজবাই-টাওয়ার্ দেখিতে সঙ্কল্প করিয়াছি শুনিয়া বোম্বাই-প্রবাসী আরও তিনটি বাঙ্গালী আমার সঙ্গী হইলেন। তাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে বম্বেনগরীতে থাকেন কিন্তু কখনও ঐ স্তম্ভে আরোহণ করেন নাই। টাওয়ারের পার্শ্বস্থ

সৌধমালায় বম্বে-বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদকের (Registrar) কার্য্যালয়। আমরা অপরাহ্ণ দুইটার সময় উক্ত কার্য্যালয় হইতে অনুমতিপত্র লইয়া সেই গগনস্পর্শী স্তম্ভে আরোহণ করিলাম। ঐ স্তম্ভের দৃশ্য দূর হইতে কেমন মনোহর দেখায়। স্তম্ভটি চারিতল-বিশিষ্ট। উহার মধ্য দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সিঁড়ী প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমরা ক্রমে তিন তলা অতিক্রম করিয়া চতুর্থ তলে উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থানে একটি সুবৃহৎ ঘড়ী ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। উহার বৃহত্ত্বের কথা অধিক কি বলিব ? কাঁটা নির্ম্মাণের কৌশল দেখিবার জন্য ক্রমে ক্রমে তিনটি বাঙ্গালী ঐ ঘড়ীতে আরোহণ করিলেন কিন্তু উহা একটুও নড়িল না। ঐ অদ্ভুত ঘড়ী প্রতিকোয়াটারে (১৫ মিনিট অন্তর) আপনা আপনি মনোহর রবে বাজিয়া সমস্ত বোম্বাইবাসীকে সময় বিজ্ঞাপন করে। ঘটিকাস্তম্ভ হইতে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিলে নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শনে অন্তঃকরণ মোহিত হয়। পশ্চিমে অনন্ত নীলাম্বুরাশি হীরকমালার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ আলোকস্তম্ভ বক্ষে ধারণ করিয়া দীপ্তি পাইতেছে। উত্তরে উপবন-বিমণ্ডিত বালুকেশ্বর শৈলবর ও দক্ষিণে এপোলোবন্দরে অভ্রস্পর্শী গুণবৃক্ষসকল বহু দূর হইতে দৃষ্ট হইতেছে (১)। পূর্ব্বভাগে বম্বেনগরী ত্রিতল পঞ্চতল সৌধমালা, প্রফুল্ল-পুষ্পোদ্যান, আলোকস্তম্ভশোভিত ব্যায়ামক্ষেত্র, জনতাপূর্ণ রাজপথ ও বিবিধপণ্যবীথিকা বক্ষে করিয়া যেন অমরাবতীকে উপহাস করিতেছে। ঐ স্তম্ভটি "রাজবাইস্তম্ভ" নামে খ্যাত হইবার কারণ, বোম্বাইবাসী যে ধনী বদান্য-প্রবরের প্রদত্ত অর্থের সুদ হইতে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের .এম্, এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার্থিগণ বিশেষ পরীক্ষা প্রদান করিয়া বার্ষিক দশ সহস্র (১০,০০০) টাকার একটি বৃত্তি (Premchand Roychand scholarship) প্রাপ্ত

(১) গুণবৃক্ষ—জাহাজের মাস্তুল।

হন, তাঁহারই অর্থে ঐ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রেমচাঁদ বাণিজ্য দ্বারা বহু অর্থ সঞ্চয় করেন এবং অনেক মহৎ কার্য্যে উহা বিনিয়োগ করিয়া যান। তন্মধ্যে তিনি বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাইশ লক্ষ (২২,০০০০০) টাকা দান করেন, তাহারই কিয়দংশ দ্বারা তাঁহার পত্নী রাজাবাইর স্মরণার্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই মহাস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রেমচাঁদের পুত্র রায়চাঁদ। বোম্বাইপ্রদেশের লোক আপন নামের শেষে পিতৃনাম যোগ করেন, তজ্জন্য তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ নামে প্রসিদ্ধ। এখন আর ঐ ধনিবংশের পূর্ব্বের অবস্থা নাই। তবে পূর্ব্ব-পুরুষগণের বদান্যতার গুণে সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে।

প্রায় দুই ঘণ্টার পর, রাজাবাইস্তম্ভ হইতে অবতরণ করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। বিশ্রামান্তে পুনরায় বাহির হইতেছি, এমন সময় গুজরাটী বণিক্‌দিগের একটি বিবাহের বরযাত্রি-সম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎকার হইল। অগ্রে ও পশ্চাতে লালপাগড়ি ওয়ালা প্রহরিগণের সহিত অশ্বারোহী য়ুরোপীয় শান্তিরক্ষকগণ শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত। মধ্যভাগে নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিতা বণিক্-মহিলা ও পুরুষগণ বরের অনুগমন করিতেছেন। গুজ্‌রাটী বণিক্-বধূরা বড়ই অলঙ্কার-প্রিয়া। তাঁহাদের মধ্যে এমন রমণীও অনেক আছেন, যাঁহাদের এক এক জনের গায়ে সাত আট লক্ষ টাকার হীরকালঙ্কার শোভা পাইয়া থাকে। আমরা বরযাত্রি-সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীরে গিয়া পৌঁছিলাম। কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর, সেই জলধি-বক্ষঃস্থ প্রধান আলোকগৃহ (Light-house) আমাদের নয়ন গোচর হইল। ঐ গৃহ প্রায় ১৫০ ফিট্ উচ্চ এবং উহার পরিধি ১২ ফিটের ন্যূন নহে। আমরা উপস্থিত হইলে কিছুক্ষণের পরই উহা সহসা জ্বলিয়া উঠিল এবং আলোক-স্তম্ভের শিরোভাগস্থ আলোকাধার ঘুরিয়া ঘুরিয়া রশ্মি বিকীর্ণ করিতে লাগিল। তখন ঐ স্থানের যে কি এক অপূর্ব্ব শোভা হইল, তাহা

লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। আমাদের একটি সঙ্গী, ক্ষুদ্রনৌকায় আরোহণ করিয়া ঐ স্তম্ভের উপরিভাগে উঠিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু আমি উহাতে আরোহণের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলাম না। বোম্বাই-নগরীতে ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের অনেক যুদ্ধ জাহাজ বিদ্যমান। সমুদ্রতীর হইতে আগ্নেয়াস্ত্র-পরিপূর্ণ ঐ সকল রণতরী দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিয়া প্রায় রাত্রি আটটার সময় বাসায় ফিরিলাম। বম্বেনগরীতে আসিলে প্রথমে দুইটি জাতির আচার ব্যবহার ও সভ্যতার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। প্রথম পার্সী, দ্বিতীয় ভাটিয়া-বণিক্। পার্সীর বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, এখন ভাটিয়াদের সভ্যতার বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বম্বের ভ্রমণকথা শেষ করিব। পূর্ব্বের গণনা অনুসারে বোম্বাই নগরীতে ৭,৭৩,১৯৬ লোকের বাস। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ৩৫,৪২৮ ধর্ম্মচ্যুতহিন্দু ৪,০৭,৭১৭ অন্যজাতীয় হিন্দু ৪৯,১২২ পার্সী ৪৮,৫৯৭ বৌদ্ধ ও জৈন ১৭,২১৮ ভাটিয়া ৯,৪১৭ ইহুদি ৩,৩২১ মুসলমান ১,৫৮,০২৪ য়ুরোপীয় ১০,৫৫১ ইউরেসায় ১,১৬৮ চীনদেশীয় ১৬৯ দেশীয়খ্রীষ্টান ৩০,৭০৮ আফ্রিকাবাসী ৬৮৯ জন। এখন বোম্বাই নগরে লোকসংখ্যা উল্লিখিত সংখ্যা অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

বোম্বাইবাসী হিন্দুসমাজে যদিও ভাটিয়া বেণের সংখ্যা মুষ্টিমেয় কিন্তু উহাদের সকলেই ধনকুবের। কতিপয় য়ুরোপীয় ও দেশীয় পরিব্রাজক বলেন ঃ—"এই ভাটিয়া বণিক্-জাতির ন্যায় মিতব্যয়ী সম্প্রদায় পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। জগতের সর্ব্ববিধ বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তিকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কেবল ধন-সঞ্চয় করাই ঐ সম্প্রদায়ের জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য"। কিন্তু ঐ মন্তব্যটি সম্পূর্ণ সত্য নহে, ভাটিয়া-বণিক্‌সমাজেও বহু বদান্য ব্যক্তির নাম শ্রুত হওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ত্রৈলিঙ্গদেশীয়, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী

বল্লভাচার্য্য একটি অভিনব বৈষ্ণব-মতের প্রচার করেন। ভাটিয়া-বণিক্‌গণ ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত। গোস্বামিগণ বলেন;—"পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসাদির প্রয়োজন নাই। বিষয়-সুখ ভোগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা কর, তাহা হইলেই অভীষ্ট-লাভ হইবে।" ভাটিয়াবণিক্‌ ও বণিক্‌-পত্নীরা দীক্ষাদাতা গোস্বামিগণকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার মনে করিয়া বৃন্দাবনবিলাসিনী গোপবালাদের অনুকরণে তাঁহাদের সেবায় তনু মন অর্পণ করিয়া থাকে। বল্লভাচারী গোস্বামিসম্প্রদায় "মহারাজ" নামে কথিত। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ভূম্যধিকারী মহারাজগণের অপেক্ষাও অধিকতর ভোগসুখে কালাতিপাত করেন। বম্বেনগরীতে বল্লভাচারী গোস্বামিগণের দেবমন্দির-সংলগ্ন কয়েকটি বাসভবন আছে। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য এবং ভোগসুখ দেখিলে রাজভোগও তুচ্ছ মনে হয়। গোস্বামিগণ অবশ্য তাঁহাদের বিলাস-সামগ্রী শিষ্যদের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য নানা উপায়ে অর্থসঞ্চয় করা হইয়া থাকে। বম্বের প্রধান প্রধান দৃশ্যগুলির বিষয়মাত্র বর্ণিত হইল। উহা ব্যতীত এই নগরের স্কুল্‌, কলেজ্‌, দেবমন্দির, মঠ, মস্‌জিদ্‌, গির্জ্জা, রাজনৈতিকসভা, সাহিত্যসমাজ এবং বৃহৎ বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্র যে কত আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? রয়াল্‌এসিয়াটীক-সোসাইটীর বোম্বাইশাখা প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান দ্বারা জগতে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। নির্ণয়সাগর এবং বেঙ্কটাচলেশ-প্রভৃতি মুদ্রাযন্ত্র-সমূহ সহস্র সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থের উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়া নিয়ত জগতে বিদ্যাচর্চ্চার সহায়তা করিতেছে।

বোম্বাই-মহানগর দর্শন শেষ হইল। ঐ দিবস আহারান্তে রাত্রি বারোটার ট্রেনে নাসিক্‌ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভ্রাতৃকল্প শ্রীমান্‌ নীলমণিমুখোপাধ্যায়, বুড়ীবন্দর ষ্টেসনে আসিয়া আমাকে

গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। ঐ ষ্টেসনেরই নামান্তর ভিক্টোরিয়া-টার্মিনাস্ (Victoria Terminus)। উহার ন্যায় বৃহৎ রেলষ্টেসন ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। বহুদূর হইতে ষ্টেসন-গৃহের অভ্রস্পর্শী চূড়া-সকল দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিদিন ষ্টেসনের সম্মুখে অসংখ্য ভাড়াটিয়া গাড়ী প্রতীক্ষা করে। বম্বের ভাড়াটিয়া গাড়ীগুলিও কলিকাতার ধনী লোকদের গাড়ীর ন্যায় উৎকৃষ্ট। নিকটেই নানা-জাতীয় হোটেল। কিঞ্চিদ্দূরে একটী প্রদর্শনী-গৃহ। ষ্টেসনের অভ্যন্তর-ভাগে অনেকগুলি টিকিটবিক্রয়ের স্থান। দিবারাত্রি অসংখ্য লোক-সমাগম হইতেছে কিন্তু বন্দোবস্তের গুণে কিছুমাত্র ভিড় নাই। ভদ্রমহিলাদের বিশ্রামগৃহ একদিকে, পুরুষদিগের অন্যদিকে। ঘরগুলি যেমন সুন্দর তেমনই সুসজ্জিত। গাড়ী ছাড়িবার একটু পূর্ব্বে প্রথম ঘণ্টা (First bell) বাজিলে সেই হিতৈষী বন্ধু নীলমণিবাবুকে সাশ্রুনেত্রে বিদায় দিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া ঠিক হইয়া বসিলাম। যথাসময়ে সুদূরব্যাপিনী শকট-রাজি আমাদিগকে লইয়া হুস্ হুস্ শব্দে ষ্টেসন ত্যাগ করিল। যাইবার কালে বরোদা হইয়া ঘুরিয়া গিয়াছিলাম। এই বার অপেক্ষাকৃত সরল পথ অবলম্বন করিলাম। বম্বে হইতে নাসিক যাওয়ার রেলপথটিও নিতান্ত সুগম নহে। শত শত শৈলমালা অসংখ্য অরণ্যানী ও নদ নদী অতিক্রম করিয়া পরদিন ১৬ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ণ দশঘটিকার সময় নাসিক-রোড্ ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। উক্ত ষ্টেসন হইতে নাসিকতীর্থ ও নাসিকনগরী প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত; আরোহীদের গমনাগমনের জন্য ট্রাম ও ঘোড়ার গাড়ী উভয়ই আছে। আমরা বহুসংখ্যক তীর্থ-যাত্রীর সহিত ট্রামে উঠিয়া প্রায় এগারটার সময় নগরীর দক্ষিণপ্রান্তে উপনীত হইলাম। নাসিকেও পাণ্ডার ভিড় অল্প নহে। নির্দ্দিষ্ট পাণ্ডার ভৃত্য দ্রব্যাদি বহিয়া লইয়া যথাসময়ে পাণ্ডার গৃহে উপস্থিত

হইল। বাটীর মধ্যে দোতলার একটি গৃহে আমার বাসস্থান নির্ণীত হইল।

বাল্মীকি-রামায়ণে বর্ণিত পঞ্চবটীই নাসিক নামে প্রসিদ্ধ। সূর্য্য-বংশাবতংস রাম যখন পিতৃসত্য পালনার্থ সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন করেন, তখন কিছুকাল ঐ স্থানে বাস করিয়াছিলেন। রাবণভগিনী সূর্পণখা রামকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করে কিন্তু রাম উহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় উক্ত রাক্ষসী কুপিত হইয়া সীতাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। শেষে রামের ইঙ্গিত-ক্রমে মহাবীর সৌমিত্রি উহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া বিরূপ করিয়া দেন। স্থানীয় লোকেরা বলেন ;—"যে সময়ে সূর্পণখার নাসা কর্ণ ছিন্ন হয়, তাহার পর হইতে ঐ স্থান নাসিকনামে প্রখ্যাত হইয়াছে।" নাসিক দক্ষিণাপথের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। দাক্ষিণাত্য হিন্দুগণ নাসিককে দক্ষিণকাশী বলিয়া থাকেন। উহা পুণ্য-সলিলা গোদাবরীর তীরে অবস্থিত। গোদাবরী সেই বৈদিক কালের পুণ্যনদী। দক্ষিণাপথের লোকেরা জাহ্নবী অপেক্ষাও গোদাবরীর প্রতি অধিকতর ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। ঐ নদীর অপরনাম গৌতমী-গঙ্গা। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত গৌতমী-মাহাত্ম্যে গোদাবরীর উৎপত্তি কথা এই রূপ বর্ণিত আছে।

যখন মহর্ষি গৌতম ব্রহ্মগিরিস্থ আশ্রমে অবস্থান করিতেন, সেই সময় দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া অনাবৃষ্টি হওয়ায় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ গৌতমের শরণাপন্ন হন। গৌতম্ অন্ন দিয়া ঋষিগণকে রক্ষা করেন। দ্বাদশবর্ষ পরে সুবৃষ্টি হইল এবং বসুমতী শস্য-শালিনা হইলেন। এদিকে কৈলাসপর্ব্বতে এক মহাবিভ্রাট উপস্থিত। মহাদেব গঙ্গাকে মাথায় করিয়া জটামধ্যে রাখিয়াছেন বলিয়া অভিমানিনী হৈমবতীর বড়ই ঈর্ষ্যা হইয়াছে। তিনি কাতরভাবে

মহাদেবকে বলিলেন "দেখ নাথ! তুমি গঙ্গাকে মাথায়, আর আমাকে অঙ্কে স্থান দিয়াছ। উহাতে আমার অপমান করা হইতেছে। তুমি শীঘ্র গঙ্গাকে নামাইয়া রাখ।" মহাদেব তখন ধূস্তুর সেবায় আসক্ত ছিলেন, সুতরাং সুখাবেশে হৈমবতীর কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। গিরিরাজনন্দিনীর আরও দুঃখ হইল। তিনি আপন পুত্র গণেশকে মনের ব্যথা জানাইলেন। গণেশ মাতার দুঃখ দূর করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি কার্ত্তিকের সঙ্গে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণবেশে গৌতমের আশ্রমের বাহিরে আসিয়া ঋষিগণকে দেখিয়া বলিলেন "ব্রাহ্মণগণ! এখন সর্ব্বত্রই শস্য জন্মিয়াছে, আর আপনাদের পরান্নে নির্ভর করা উচিত নহে, অতএব নিজ নিজ স্থানে গমন করুন"। ঋষিগণ গৌতমের নিকটে আসিয়া বিদায় চাহিলেন। গৌতম বলিলেন "মহর্ষিগণ! আমি দুর্দ্দিনে আপনা-দিগকে অন্ন দিয়াছি, এখন ভাল সময় বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া আপনাদের উচিত নহে। আমার ইচ্ছা আপনারা এ খানেই চিরকাল থাকুন।" ঋষিগণ গৌতমের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, সুতরাং সেখানেই রহিলেন। গণেশ ঐ স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কার্ত্তিককে বলিলেন "ভাই তুমি গাভীরূপে গৌতমের ক্ষেত্রে গিয়া শস্য নষ্ট কর, গৌতম তোমাকে তাড়না করিলে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবে"। কার্ত্তিক তাহাই করিলেন। তিনি গাভী হইয়া গৌতমের শস্য নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। গৌতম যেই গাভীকে তাড়াইতে যাইবেন, গাভী তৎক্ষণাৎ মড়ার মত পড়িয়া রহিল। আশ্রমে গোহত্যা হইয়াছে শুনিয়া ঋষিরা সকলেই প্রস্থানের উদ্‌যোগ করিলেন। এ বারও গৌতম তাঁহাদিগকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন "যদি তুমি ভগীরথের ন্যায় গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া গাভীকে পুনর্জীবিত করিতে পার, তাহা হইলে আমরা

থাকিতে পারি।” গৌতম তাহাতেই সম্মত হইলেন। তিনি ত্র্যম্বক-পর্ব্বতে গিয়া মহাদেবের উদ্দেশে তপস্যা করিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে গৌতম বলিলেন “প্রভো! আপনি জটাস্থিত গঙ্গাকে আমায় প্রদান করুন। তিনি মৃতগাভীর জীবন দান করিয়া সাগর-সঙ্গমে গমন করুন।” এই বার হৈমবতীর অভীষ্ট-সিদ্ধি হইল। মহাদেব গঙ্গাকে জটা হইতে নামাইয়া দিলেন। তিনিই ভূমণ্ডলে গোদাবরী বা গৌতমী-গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষেও নাসিক-জেলার ত্র্যম্বক-নামক গ্রামের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী পর্ব্বত হইতেই গোদাবরীর উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ স্থানে একটী কূপ আছে। উহার নিম্নদেশে নামিবার জন্য ৬৯০টী সিঁড়ী আছে। ঐ স্থানে অবস্থিত একটি খোদিত পাষাণ-মূর্ত্তির ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া ফোঁটা ফোটা জল পড়িতেছে। ঐ সকল বারিবিন্দুর সমষ্টিতেই গোদাবরী-প্রবাহ উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ নদী পূর্ব্ব-ঘাট হইতে পশ্চিমঘাট পর্ব্বত পর্য্যন্ত ৮৯৬ মাইল বিস্তৃত। উহার জলের পবিত্রতা ও উপকারিতা এবং উভয়কূলের সৌন্দর্য্য অতিমনোহর। গোদাবরীর তীরবর্ত্তী বহু স্থানে বহুতীর্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে নাসিকনগর অতি বিখ্যাত। ঐ গোদবরী সপ্তশাখায় বিভক্ত যথা—তুল্যা, আত্রেয়ী, ভারদ্বাজী, গৌতমী বৃদ্ধগৌতমী, কৌশিকী ও বশিষ্ঠা। যেখানে ঐ সপ্তশাখা মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম সপ্তগোদাবরী-সাগরসঙ্গম। ঐ স্থানটী মান্দ্রাজের অন্তর্গত।

আমি পাণ্ডার সহিত গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইলাম। ঐ স্বল্পায়তা স্রোতস্বতীর উভয়তীর অসংখ্য পাষাণময় ঘাট ও মঠ মন্দিরাদিতে এমন শোভান্বিত যে, দেখিলে নয়নের অত্যন্ত প্রীতি জন্মে। কাশীর জাহ্নবীতীর ব্যতীত এরূপ মনোরম দৃশ্য আর কোথায়ও নাই। যেমন পুণায় কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, সেই

রূপ নাসিকে দেশস্থ-ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। প্রত্যেক ঘাটেই ব্রাহ্মণ-ললনারা ঘাট আলো করিয়া স্নান পূজা করিতেছেন। নাসিকে সকল ঋতুতেই যাত্রি-সমাগম হয়। ঐ দিবস অনেক তীর্থযাত্রী দেখিলাম; পাণ্ডা, পুরোহিতের সহিত আমাকে গোদাবরী-তীরে বসাইয়া রাখিয়া তীর্থশ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিল। নাসিকেও শ্রীফল (নারিকেল) সহ গোদাবরীর ভেট করিতে হয়। গোদাবরীর অর্ঘ্যদান শেষ হইলে একটি বিশেষ সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ করিয়া অবগাহন করিলাম। সন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া তীর্থশ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পুরোহিতটি সাধারণ তীর্থ-পুরোহিতের ন্যায় নহেন, তাঁহার শাস্ত্রে অধিকার আছে। বেশ ধীরভাবে যথাসম্ভব বিশুদ্ধ প্রণালীতে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ক্রিয়া সমাপন করিলেন. বঙ্গদেশের রুচি-স্তোত্রের ন্যায় একটি স্তোত্র পাঠ করাইলেন. স্তোত্রটী যেমন সুমধুর-সংস্কৃতে নিবদ্ধ, তেমনই ভক্তিভাবের উত্তেজক। উপরে উঠিয়া গণপতি মহাদেব-প্রভৃতির অর্চ্চনান্তে বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। পাণ্ডারা তিন ভাই, আহারের সময় বাটীর তিনটি বধূই অনাবৃতমস্তকে আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। তাঁহারা শুনিয়াছেন, 'আমি পণ্ডিত' সুতরাং আহারের পর, আমাকে তাঁহাদের হাত দেখিয়া ফলাফল বলিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম "আমি শাস্ত্রব্যবসায়ী বটে কিন্তু করকোষ্ঠী গণনা করি না"। বড়বধূ প্রৌঢ়া এবং সন্তানবতী কিন্তু তাঁহার অপর দুইটি যাতার সন্তানাদি হয় নাই। তজ্জন্য বারংবার তাঁহাদের হাত দেখিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি কোনও রূপে সম্মত না হওয়ায় অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখুন দেখি ইহাদের সন্তান হইবে কিনা?" আমি "বচনে কিং দরিদ্রতা" এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করিয়া বলিলাম "হাঁ হইবে"। উহা শুনিয়া মধ্যবয়স্কা কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া রহিলেন। ষোড়শী ছোট-

বধূটী খুসী হইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে উঠিয়া গেলেন। আহারান্তে পাণ্ডার সহিত নাসিকতীর্থ-সংক্রান্ত অনেক কথা হইল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর দেবালয় সন্দর্শনার্থ বহির্গত হইলাম।

গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম রামমন্দিরে রামসীতা, লক্ষ্মণমন্দিরে লক্ষ্মণমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সীতাগুহায় উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের স্বামী দর্শককে সীতামূর্ত্তি দর্শন করাইতে আদেশ করিলেন। প্রদর্শক একটি দ্বার অতিক্রম করিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ কোন স্বাভাবিক পার্ব্বত্য-গুহার মধ্যে লইয়া গেল। উহার অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারময় কেবল একটি প্রদীপ টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতেছে। ঐ সামান্য আলোকের সাহায্যে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত সীতামূর্ত্তি দর্শন করিলাম। ক্ষুদ্র একটি দ্বার ব্যতীত কোন দিক্ হইতে বায়ু-সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। একে দারুণ গ্রীষ্ম, তাহাতে বায়ুর অভাবে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। আমরা কেবল গুহার মধ্য হইতে বাহিরে আসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় প্রায় ত্রিশ জন যাত্রী উহার মধ্যে প্রবেশ করিল। আমার তখন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সূচ্যগ্র-পরিমিত স্থান নাই যে, নির্গত হইব। দর্শককে বারংবার বাহিরে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলাম, সে আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া যাত্রিগণের নিকট, সীতার ইতিহাস-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইল। শেষে সেই যাত্রীর ভিড় কমিলে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সেই পাষাণ গাত্রে উৎকীর্ণ সীতামূর্ত্তিতে এমন কিছুই দেখিলাম না, যাহাতে হৃদয় আকৃষ্ট হইতে পারে কিন্তু হয়ত আর একটু বিলম্ব হইলে প্রাণবায়ু বাহির্গত হইয়া যাইত। সীতা-গুহা হইতে নির্গত হইয়া প্রধান প্রধান প্রায় ত্রিশটি মন্দিরে নানাবিধ দেবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম। পুস্তকের কলেবর অত্যধিক বিস্তৃত হইয়া পড়ে বলিয়া সে সমুদায়ের সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না।

দেবালয় দর্শনে অপরাহ্ন সাড়ে চারিঘটিকা বাজিয়া গেল। তাহার পর, পঞ্চবটীর যে অংশে রাম পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কাল যাপন করিয়াছিলেন, পাণ্ডার সহিত সেই দিকে চলিলাম। ঐ অংশের প্রাকৃতিক দৃশ্য যিনি একবার নয়নগোচর করিবেন, তিনি জীবনে উহা বিস্মৃত হইবেন না। আমরা গোদাবরীতীর ছাড়িয়া সরল পথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রান্তরের মধ্যদিয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে চলিলাম। অনতিদূরে পর্ব্বতশ্রেণী মেঘমালার ন্যায় দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ময়ূরগুলি আমাদিগকে দেখিয়া বিশ্বস্তচিত্তে পথের একপার্শে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। পীত ওশুভ্রবর্ণে চিত্রিত শৃঙ্গহীন হরিণসমূহ লাফাইয়া লাফাইয়া একবার দূরে আবার নিকটে আসিতে লাগিল। প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পুনরায় গোদাবরী-তীরে উপনীত হইলাম। পথের উভয় পার্শ্বে উদাসীনগণের আশ্রম। আমরা তীরবর্ত্তী পথ ধরিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিলাম। বাল্মীকি-রামায়ণের আরণ্যকাণ্ড পাঠে অবগত হওয়া যায়, 'রাম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথম মহর্ষি-গণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহার পর, বিরাধনামক রাক্ষসকে বধ করিয়া শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। ঐ ঋষি রামের যথাবিধি অভ্যর্থনা ও উপদেশ প্রদান করিয়া হুতাশনে দেহ সমর্পণ করিলে রাম সুতীক্ষ্ণমুনির নিকেতনে গমন করেন। সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হন এবং তাঁহারই উপদেশে গোদাবরী-তীরে মনোরম পঞ্চবটীকাননে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন'। আমরা যেখানে ভ্রমণ করিতেছিলাম, হয়ত উহারই কোন স্থলে শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্ণঋষির আশ্রম ছিল। মহর্ষি অগস্ত্য ও উহারই কোন অংশে পর্ণকুটীরে উপবেশন করিয়া বেদ অধ্যাপনা করিতেন। ঋষিকন্যা আত্রেয়ী অলৌকিক-প্রতিভা-সম্পন্ন কুশলবের সহিত অধ্যয়নে অসমর্থা হইয়া বাল্মীকির

আশ্রম (১) হইতে দক্ষিণাপথে অগস্ত্যের আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন (২)।

উদাসীনগণের আশ্রম অতিক্রম করিলেই গোদাবরী-তীরে বৃহৎ-বৃহৎ-তরুরাজি-বিরাজিত দীর্ঘকানন দৃষ্ট হইল। ঐ কাননের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অরুণা ও গোদাবরীর সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলাম। ক্ষুদ্রস্রোতস্বিনী অরুণা পার্ব্বত্যপথে অবতরণ করিয়া পুণ্যসলিলা গোদাবরীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। ঐ সঙ্গমস্থলের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলে মনে হয় যেন অরুণা ও গোদাবরী উভয়সখী উপত্যকা-পথে অবতরণ করিয়া সলিলচ্ছলে আপন আপন মনের পবিত্র ভাবরাশি বিনিময় করিতেছেন। সূর্য্যদেব অস্তগমনোন্মুখ, ধীরে ধীরে মলয় সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, বিজন গোদাবরীতীর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, কেবল বৃক্ষের শাখায় পক্ষিসকল কলরব করিতে ছিল। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কত কি মনে হইতে লাগিল। বনদেবতা বাসন্তী যেন রামকে বলিতেছেন "মহারাজ! যাহাকে তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমিই আমার নয়নের আনন্দ-দায়িনী জ্যোৎস্না এবং তুমিই আমার অঙ্গের অমৃত ইত্যাদি শত শত চাটু বাক্যে বশীকৃত করিয়াছিলে, এখন তাহাকেই......(বাষ্পরুদ্ধ

(১) কাণপুরের অনতিদূরবর্ত্তী বিঠুর নামক স্থানে বাল্মীকির আশ্রম ছিল

(২) আত্রেয়ী।

"অস্মিন্নগস্ত্য-প্রমুখাঃ প্রদেশে
ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং
বাল্মীকি-পার্শ্বাদিহ পর্য্যটামি ॥*

(ভবভূতিঃ।)

কণ্ঠে) অথবা এই পর্য্যন্তই থাকুক, আর কথায় প্রয়োজন নাই (১) আবার যেন তমসা সীতাকে বলিতেছেন "রামকে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত এই বিশ্ব-সংসার যথাবিধি পরিপালন করিতে হয়, তাহাতে আবার নিদারুণ প্রিয়া-শোক, নিদাঘ কাল যেমন পুষ্পকে ম্লান করে, সেই রূপ জীবন-কুসুমকে অতিশয় শুষ্ক করিয়া তুলিতেছে। আবার আপনিই সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং বিলাপ দ্বারা যে মনের ক্লেশ দূর করিবেন, তাহারও উপায় নাই। আর যদিও রোদন দ্বারা কিছুমাত্র চিত্তবিনোদন হয় না, তথাপি যখন উহা দ্বারাই আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছেন, তখন রোদনই পরম লাভ মনে করিতে হইবে" (২)।

কিছুকাল পরে গোদাবরী-সঙ্গমে স্নানের পরিবর্ত্তে সঙ্কল্প পাঠপূর্ব্বক সলিল স্পর্শ করিয়া সায়ং-সন্ধ্যা এবং তীর্থোচিত কার্য্য শেষ করিলাম। ঐ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় মহাকবি বাল্মীকি ও ভবভূতি অত্যন্ত সফলকাম হইয়াছেন। দর্শক এখানে আসিলে তাঁহাদের বর্ণিত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামের পঞ্চবটী-বাস, বনদেবতা বাসন্তী

(১) ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং,
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং,
তামেব শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ।'

(ভবভূতিঃ)

(২) "ইদং বিশ্বং পাল্যং বিধিবদভিযুক্তেন মনসা,
প্রিয়াশোকো জীবং কুসুমমিব ঘর্ম্মঃ ক্লময়তি।
স্বয়ং কৃত্বা ত্যাগং বিলপনবিনোদোঽপ্যসুলভ
স্তদদ্যাপ্যুচ্ছ্বাসো ভবতি নমু লাভো হি রুদিতম্॥

(ভবভূতিঃ)

এবং সীতার সহিত তমসা মুরলার কথোপকথন প্রভৃতি প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিতে পারেন। পাণ্ডা গৃহগমনের জন্য ব্যগ্র, সে পুনঃ পুনঃ আমাকে বলিতে লাগিল, "মহাশয়! শীঘ্র চলুন, এখানে বিলম্ব করিবেন না, হিংস্র জন্তুর ভয় আছে।" আমি অগত্যা অনিচ্ছা-সত্ত্বে সেই মনোরম ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিলাম। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি গোদাবরী-কূলে বহুসংখ্যক উদাসীনের আশ্রম বিদ্যমান। তীর্থযাত্রীদের দানেই উক্ত উদাসীনগণের পঞ্চবটী-বাস সম্পন্ন হয়। পাণ্ডার উপদেশে তাঁহাদের আশ্রম ও দেবমন্দির দেখিবার উদ্দেশ্যে অন্যপথে চলিলাম। গোদাবরী-সঙ্গম হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত কোন লোকালয় নাই। তীর-ভূমি কেবল আম্র জম্বু-কদম্ব-বিল্ব ও অন্যান্য তরু-গুল্মে পরিব্যাপ্ত। চতুর্দ্দিকে সান্ধ্য আলোক বিকীর্ণ হওয়ায় বনশ্রেণী যেন স্বর্ণের কান্তিতে শোভিত হইল। তরুতলে পতিত পক্ক-জম্বু-সকল পদাঘাতে বিদলিত হইয়া এক প্রকার গন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল। এক স্থানে ময়ূরদম্পতি বিচরণ করিতেছিল, আমাদের পায়ের শব্দ পাইয়া কদম্বের শাখায় উঠিয়া বসিল। তীরভূমি হইতে গোদাবরীর জলপ্রবাহ অনেক নিম্নে প্রবাহিত। যে স্থানে নদীর গতি বক্র, সেখানে তীরস্থ লতাগুলি নুইয়া জলে পড়িয়াছে। কোন স্থানে নদীর কূলে গভীরগর্ত্ত ও নিবিড় অরণ্য। উহা হইতে অনবরত ঝিল্লীরব উত্থিত হইতেছে। ঐ বিজন কাননের উচ্চ উচ্চ বৃক্ষের চূড়ায় কোকিল ও অন্যান্য বনবিহঙ্গ আনন্দে রব করিতেছে। উহা বড়ই শ্রুতিমধুর বোধ হইল। আমাদের বঙ্গীয় কবি মধুসূদন বোধ হয়, ঐ স্থান স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াই লিখিয়া-ছিলেন ;—

"ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরীতীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে।"

কিছুক্ষণ পরেই আমরা পুনরায় উদাসীনগণের আশ্রমের সন্নিহিত হইলাম। ঐ স্থানে ভারতবর্ষের সকলসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীই অবস্থান করেন। অনেক দণ্ডী পরমহংস দেখিলাম। কোন স্থানে রামানুজ-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব, কোথায় বা মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

নাসিক ইতিহাসাতীতকাল হইতে বিশ্রুত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন "যিশুখ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অন্ধ্রভৃত্য-বংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন।" অদ্যাপি উহার অনতিদূরবর্ত্তিনী একটি পর্ব্বতমালার উপরিভাগে অসংখ্য বৌদ্ধ-কীর্ত্তি বিদ্যমান। তাহার পর, যথাক্রমে চালুক্য, রাঠোর এবং যাদববংশীয় নৃপতিগণ এই প্রদেশ শাসন করেন। খ্রীষ্টীয় ১২৯৫—১৭৬০ অব্দ পর্য্যন্ত ইহা মুসলমানগণের অধিকারে থাকে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। পেশওএগণের অধিকারকালে এখানে বহুসংখ্যক দেবালয় ও মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও উহার অনেক বিদ্যমান আছে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে এই প্রদেশ ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছে। নাসিক অতিস্বাস্থ্যকর স্থান। উহা নাসিক-জেলার হেড্ কোয়ার্টার্। ঐস্থানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোর্ট ও মিউনিসিপালিটি আছে। বহুকাল হইতে নাসিক সংস্কৃতচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বগৌরবের নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি ঐ নগরে কয়েকটি সংস্কৃত-চতুষ্পাঠী দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় পুনরায় গোদাবরী অতিক্রম করিয়া সহরে উপস্থিত হইলাম। নাসিকের তাম্র ও পিত্তলের দ্রব্য বড়ই সুন্দর। এক কাংস্যকারের বিপণি হইতে কয়েকটি পিত্তলের ও কাঁশার দ্রব্য ক্রয় করিয়া বাসায় ফিরিলাম। নাসিক যে এত সুন্দর ও শান্তিপ্রদ স্থান তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। কিছু দিন এখানে অবস্থান করিতে

পারিলাম না বলিয়া মনে অত্যন্ত ক্ষোভ হইল। গ্রীষ্মাবকাশ প্রায় শেষ হইয়া আসিল, আর বিলম্ব করা চলিবে না। অগত্যা পাণ্ডার প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া রাত্রি ১১টার ট্রেন্ ধরিবার জন্য ট্রামে আরোহণ করিলাম। সমস্ত নিশাও পর দিবস বাষ্প-শকটে অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্ন ছয় ঘটিকার সময় নাগপুর পৌঁছিলাম। ঐ রাত্রি নাগপুরে যাপন করিয়া পরদিন ১৭ই জ্যৈষ্ঠ আটঘটিকার মধ্যে আহার শেষ করিয়া পুনরায় বাষ্পশকটে উঠিলাম। পরদিন (১৮ই জ্যৈষ্ঠ) ১২টার পর উক্ত শকট আসান্‌সোল্-ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে আধ ঘণ্টা গাড়ী অপেক্ষা করে। তাহার পর, পুনরায় ট্রেনে উঠিয়া অপরাহ্ন পাঁচটার সময় হাওড়া ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। এক্খানি ঘোঁড়ার গাড়ীতে আরোহণ করিয়া বাসায় পৌঁছিয়া দেখি আমার ছাত্রগণ আমার অভ্যর্থনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহার কৃপায় নিরাপদে ভ্রমণ শেষ হইল, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া বিশ্রামার্থে গমন করিলাম।

সমাপ্ত।

Some Opinions

ON

DAKSHINAPATH-BHRAMAN.

কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ৺নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার এম্, এ, বি, এল্, মহোদয় লিখিয়াছেন ;—

The travels of Pandit Sarat chandra Sastri in the Deccan entitled "দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ" is a book written in a racy, chaste and attractive style. It is interesting as a novel and contains a good deal of antiquarian information, collected and arranged with discrimination. The book delineates topographical peculiarities of many noted places in Central and Southern India, and incidentally depicts various local customs and manners in vivid colours, so as to make a pleasing impression on the reader. The author evinces great powers of observation and scholarly acumen throughout. His book, I doubt not, will enlist sympathy and attract the attention of a large class of the reading public.

The 31st. March. (Sd.) Nilmony Mukerji.
1898, Calcutta. Principal, Sanskrit College.

কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের ভূতপূর্ব্ব দর্শন অলঙ্কার ও স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার মহোদয় লিখিয়াছেন ;—

দক্ষিণাপথ-ভ্রমণের কতিপয় স্থান পাঠ করিয়াছি, ইহা কেবল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নহে। ইহাতে নানাস্থানের ঐতিহাসিক বিবরণ ও প্রদত্ত হইয়াছে ও তদ্দ্বারা গ্রন্থকার যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। ঐ

বৃত্তান্তগুলি সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থ-খানি সুন্দর ও কৌতুহলোদ্দীপক হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, রচনা কৌশলময়, ছাপা ও কাগজ ভাল। ইহা বলা আবশ্যক যে, গ্রন্থকারের কতিপয় সিদ্ধান্তে আমি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

(স্বাঃ) শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা।

বেঙ্গল গবর্মেণ্টের ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালা-অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ লেখক ৺চন্দ্রনাথবসু এম্, এ, মহোদয় লিখিয়াছেন ;--

"Dakshinapath Bhraman" by Pandit Sarat chandra Sastri contains an interesting account of his travels in Southern India, interspersed with historical or legendary notices of the places which he visited. The subject-matter of the book is interesting and instructive and its style plain, practical and sober. By its matter and manner, it is a book which will not only do no harm to young or old, man or woman, but prove very healthy reading for all without distinction.

The 7th. June, 1898. (Sd.) Chandra Nath Bose.

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বহুদর্শী লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় লিখিয়াছেন ;—

প্রিয় শাস্ত্রী মহাশয় !

আমি আপনার প্রদত্ত উপহার খানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। সংপ্রতি কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি আর আর দেশের পথপ্রদর্শকতা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের প্রিয়তম ভারতবর্ষের পথপ্রদর্শকতায় আপনি এইবার প্রথম পথপ্রদর্শক হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি যেরূপ ভারতবর্ষের নানা রীতি নীতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন

নগর, গ্রাম সকলের সেকালের কাহিনী যথাযথ স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। বঙ্গবাসীরা বঙ্গদেশকেই ভারতবর্ষের আদর্শ মনে করেন, আপনার পুস্তক পাঠে তাঁহাদের সে ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে, বিশেষতঃ এ দেশের পুরাতন প্রথানুযায়ী শোভন স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে অনেকের চক্ষু ফুটিবে।

অনুরক্ত শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি (প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি-প্রাপ্ত) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্, মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

সপ্রণাম নিবেদন—

বড়দিনের অবকাশে এখানে আসিয়া আপনার "দক্ষিণাপথভ্রমণ" আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। বাল্যকাল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন দেশের কথা শুনিতে ভালবাসি। ভূগোল, ইতিহাস, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও জীবনবৃত্তান্ত, আমি বাল্যাবধি আগ্রহের সহিত পাঠ করি। কাপ্তেন কুকের সমুদ্রভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও যত্নের সহিত পড়িয়াছি। এখনও সে প্রবৃত্তির হ্রাস হয় নাই। সুতরাং অবকাশ পাইবামাত্রই আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে অনেক পাঠ্য কথা পড়িলাম। প্রত্নতত্ত্ব, ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত, উপকথা, স্বভাব-বর্ণন, মানব-প্রকৃতির বর্ণন, সবই ভাল লাগিল। আপনি "উত্তরাপথভ্রমণ" কবে লিখিবেন ?

পানিশেহোলা,
হরিপাল পোঃ, জেলা হুগলী,
১০ই পৌষ, ১৩১২।

(স্বাঃ) শ্রীসারদাচরণমিত্র।

বেঙ্গল গবর্মেণ্টের ভূতপূর্ব্ব পুস্তকালয়াধ্যক্ষ ও বর্ত্তমান বাঙ্গালা অনুবাদক (রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি-প্রাপ্ত) শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্, এ, মহোদয় লিখিয়াছেন ;—

I have carefully read Pandit Sarat Chandra Sastri's book entitled "Dakshinapath-Bhraman" (travels in the Deccan) and found it extremely interesting and entertaining. The Pandit is a good Sanskrit Scholar and the book teems with reminiscences, both historical and traditional which have lent additional charm to it. It also throws much intersting side light on the state of Sanskrit learning at Poona and elswhere and the condition of the people of the places visited by the author. The book will repay perusal.

14—7—98. (Sd.) Rajendra Chandra Sastri.

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, হাইকোর্টের এটর্ণি (রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-বৃত্তি-প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথদত্ত এম্, এ, বি, এল্. মহোদয় লিখিয়াছেন ;—

আপনার "দক্ষিণাপথভ্রমণ" পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। আপনার ভাষা প্রাঞ্জল, সরল অথচ বিশুদ্ধ। ভ্রমণকারীর যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক—অনুসন্ধিৎসা, পুরাতত্ত্বজ্ঞান, সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি, বর্ণনার ক্ষমতা, আপনি সে সকল গুণের অধিকারী। আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দক্ষিণাপথ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি। চতুর্থ পরিচ্ছেদে নবরত্নের পরিচয় কিছু দীর্ঘায়ত বোধ হইল।

ভবদীয় শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুর লিখিয়াছেন ;—

আপনার "দক্ষিণাপথভ্রমণ" পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এরূপ পুস্তক আমার বিবেচনায় সহৃদয় ব্যক্তির নিকট আদর ও সম্মান পাইবার বস্তু। আপনি সংস্কৃতজ্ঞ অতএব ভাষাবিষয়ে আপনার পুস্তকের গৌরব হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। আপনি আমাকে এই পুস্তক উপহার প্রদান করিয়া বিশেষ বাধিত করিয়াছেন।

শোভাবাজার-রাজবাটী,
১৩০৫।৬ই আষাঢ়।

প্রণত শ্রীবিনয়কৃষ্ণদেব।

সংবাদপত্রের অভিমত

দক্ষিণাপথ ভ্রমণ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী প্রণীত। শাস্ত্রী মহাশয় একজন পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ব্যক্তি। বহু বিষয়ে তাঁহার বহু অভিজ্ঞতা আছে। তিনি পরিশ্রমী, চিন্তাশীল ও সাহিত্যনিষ্ঠ। সাহিত্যধর্ম্মে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ আছে। সংপ্রতি তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া সুললিত সরল বাঙ্গালায় এই ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠযোগ্য। লেখকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সুদূরগামিনী। উপন্যাসের ন্যায় এই গ্রন্থ কৌতূহলোদ্দীপক। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে গ্রন্থকার অনেক অবান্তর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। সে গুলিও সুখপাঠ্য ও ভূয়োদর্শনের ফল। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

বঙ্গবাসী, ৩০শে আশ্বিন, ১৩০৫।

দক্ষিণাপথ ভ্রমণ। শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বিরচিত। এই শ্রেণীর ভ্রমণ বিষয়ক পুস্তক ও প্রবন্ধাদির সমাদর দেখিলে আমরা সুখী হই। সমালোচ্য গ্রন্থে কালিদাসাদি সম্বন্ধে যে সকল প্রচলিত উপাখ্যান সংগৃহীত হইয়াছে, সে গুলিতেও পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন হইবে। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

হিতবাদী, ১৮ই চৈত্র ১৩০৫।

দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ। শ্রীশরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী প্রণীত। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। সাধারণতঃ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর বাঙ্গালা লেখা বড়ই দুর্ব্বোধ ও জটিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষা প্রাঞ্জল, সরল এবং মধুর। বর্ণনাগুণে তাঁহার ভ্রমণ

বৃত্তান্ত সরস উপন্যাসের ন্যায় মধুর হইয়াছে। স্থানে স্থানে বর্ণনা এত মধুর হইয়াছে যে, মনে হয় যেন শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমরা দেশ ভ্রমণ করিতেছি। ঐতিহাসিক বিবরণ সহ ভারতের প্রাচীন এবং আধুনিক অবস্থা যাঁহারা জানিতে চাহেন, আশা করি তাঁহারা এই পুস্তক খানি পাঠ করিলে বিশেষ তৃপ্তি পাইবেন। এই পুস্তকে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহৃদয়তা, স্বদেশানুরাগ, নীতি এবং সত্যানুরাগের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিধাতা গ্রন্থকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

নব্যভারত, ১৩০৫ ভাদ্র।

দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ। শ্রীশরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী প্রণীত। গ্রন্থখানি অতিশয় কৌতুকাবহ। লেখক একজন নব্যভাবাপন্ন কলেজের যুবক নহেন। তিনি এক জন টিকি ও চটিজুতাধারী সংস্কৃত-চতুষ্পাঠীর ছাত্র। শাস্ত্রী মহাশয় একবার গ্রীষ্মকালে নাগপুর-রেলপথ দিয়া মধ্যভারতবর্ষের কতিপয় প্রসিদ্ধ স্থান এবং পুণা ও বোম্বাই-প্রদেশে ভ্রমণার্থ নিষ্ক্রান্ত হন, অনেক বাঙ্গালী পুরুষই ত এ পথে অনেকবার ভ্রমণে বহির্গত হন, কিন্তু কেহ এরূপ সংস্কৃত কাব্য অলঙ্কার পুরাণ ও দর্শনশাস্ত্রের পাণ্ডিত্যকে পাথেয় করিয়া এবং সেই রসে নিমজ্জিত থাকিয়া বাহির হন না। সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া অতীতের স্মৃতি, অতীতের ইতিহাস পড়িয়া রহিয়াছে। ভ্রমণবৃত্তান্তে স্থান বিশেষের প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনার সহিত তাহার যথাসাধ্য সরল ইতিহাস বর্ণনেই লেখকের গুণপনা। রাইপুর যে কোশল-রাজ্য, নাগপুর যে দণ্ডকারণ্য, মৎস্যদেশ যে হোলকার রাজ্য ইত্যাদি অনুভব করিতে পাঠকের অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক রস বড় তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু আলোচ্য দেশসমূহের বর্ত্তমান কালের আচার ব্যবহারের ও অতিসরস বর্ণনায় গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। লেখক উজ্জয়িনীতে দুইজন বিক্রমাদিত্য ও দুইজন

কালিদাসের অবতারণা করিয়াছেন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভা সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য ও উহার নয়টি মনীষীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

ভারতী, ১৩০৬ মাঘ

দক্ষিণাপথভ্রমণ। শ্রীশরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী প্রণীত। নামেই গ্রন্থের পরিচয়। শাস্ত্রী মহাশয় পরিদৃষ্ট স্থানসমূহের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি নৈপুণ্যের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ব্যতীত ইহাতে অন্যান্য অনেক প্রীতিপ্রদ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। আমরা পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীত হইয়াছি।

প্রতিবাসী, ১৩০৫।২১শে চৈত্র।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী-প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক-সকল কলিকাতা ২৫ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ বি, ব্যানার্জ্জী কোং-দোকানে এবং ২৭।৩ রামকান্তমিস্ত্রীর লেন্, বাণী-লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

পুস্তকের নাম	মূল্য।
রচনাসোপান,—(দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত, মেট্রিকুলেসন ও ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার্থীদের বাঙ্গালা রচনা, প্রবন্ধ-প্রণয়ন ও অনুবাদ শিক্ষার পুস্তক।)	៸০
নীতিসন্দর্ভঃ—(তৃতীয় শ্রেণীর সংস্কৃত পাঠ্য, সেণ্ট্রাল্ টেক্স্ট বুক্ কমিটির অনুমোদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
সংস্কৃতপরিচয়ঃ—(চতুর্থ শ্রেণীর সংস্কৃত পাঠ্য, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-ভাষার অধ্যাপক ডাক্তার এ, এ, ম্যাক্ডোনাল্ এম্, এ, পি, এইচ্, ডি কর্ত্তৃক প্রশংসিত)	৵১০
চারুসন্দর্ভ,—(তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বাঙ্গালাপাঠ্য, সেণ্ট্রাল্ টেক্স্ট বুক কমিটির অনুমোদিত)	।৵০
দক্ষিণাপথভ্রমণ,—(সচিত্র ৩য় সংস্করণ)	১।০
শঙ্করাচার্য্যচরিত,—(সচিত্র ২য় সংস্করণ)	১
রামানুজচরিত,—(সচিত্র)	১॥০
উত্তরাপথভ্রমণ,—(সচিত্র—যন্ত্রস্থ)	১।০